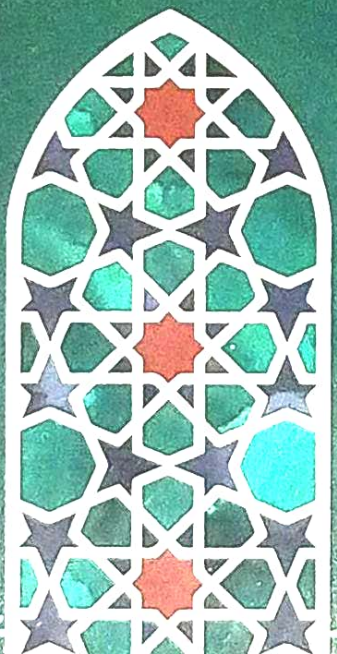
# মুক্তি কোন পথে

মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম



শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম এদেশের বিদগ্ধ আলেমকুলের একজন। আদর্শ ছাত্র গড়ার কারিগর হিসেবে যেমন তিনি সুপরিচিত, তেমনি গবেষক লেখক ও সফল অনুবাদক হিসেবে তিনি মুহাক্কিক উলামা মহলে স্বীকৃত। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ মাদ্রাসায় সুদীর্ঘ বিশ বছর হাদীছে নববীর পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের লেখক ও সম্পাদক হিসেবেও দীর্ঘ সময় অবদান রেখেছেন। বর্তমানে ঢাকার অন্যতম শীর্ষ মাদ্রাসা জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া মোহাম্মদপুরে শায়খুল হাদীছ এবং ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। সৃষ্টিশীল রচনা ও আত্মোন্নয়নমূলক লেখনীর জন্য দেশের অগুনতি পাঠক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রায় তিনযুগ ধরে তিনি লিখে চলেছেন। সমকালীন বিভিন্ন বিষয় এবং সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের নানাদিক নিয়ে তাঁর একেকটি লেখা জীবন বদলের চেতনায় ভরপুর। মুগ্ধ পাঠক পরম আবেগে তাঁর লেখা পাঠ করে দৃষ্টিভঙ্গি শোধরাতে উদ্বুদ্ধ হন।

আলোকধারা প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত সম্মানিত লেখকের অনবদ্য আরও কিছু রচনা :

* মিশরবিজয়ী 'আম্র ইবনুল 'আস রাযি.
* কাদিয়ানী সম্প্রদায় যে কারণে মুসলমান না
* উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ ও সাধারণের করণীয়

# মুক্তি কোন পথে

* তাকওয়া ও তাওবা
* শুক্‌র ও সবর

রচনা
মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শাইখুল হাদীছ : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা, মুহাম্মাদপুর
খতীব : ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা

https://t.me/islaMic_fdf

আলোকধারা
আস্থা ও বিশুদ্ধতার অঙ্গীকার

বই : মুক্তি কোন পথে

লেখক : মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

প্রকাশকাল : রমাযান ১৪৪৪ হিজরী ॥ এপ্রিল ২০২৩ ঈসায়ী

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : উসামা আদনান

ISBN : 978-984-95973-3-9

প্রকাশনায় : আলোকধারা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৬৮৯-৮৭৬১৪৮, ০১৬০৩-৫১৯০১৯

অনলাইন পরিবেশক
www. rokomari.com, www.wafilife.com, www.thanovi.com

মুদ্রিত মূল্য : ৮৩০ টাকা মাত্র

**MUKTI KON POTHE**

By : Maulana Abul Bashar Muhammad Saiful Islam

Published By : Alokdhara Prokashon

Phone : 01689-876148, 01977-060141

Price: 830.00 Taka only

# প্রকাশকের কথা

আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য– মুক্তি কোন পথে তা খুঁজে বের করা। এটি জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাও বটে। যারা এ পথটি খুঁজে পাবে এবং চলবে এ পথে অবিরাম, একমাত্র তারাই পাবে তাদের কাঙ্ক্ষিত সেই মুক্তি, সুখ-শান্তি, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে নাজাত।

বলাবাহুল্য– সরল সঠিক পথই হচ্ছে মুক্তির পথ। যে পথের দিশা চেয়ে আমরা প্রতিদিন প্রতি নামাযে প্রতি রাকাতে সুরা ফাতেহার প্রতিবারের তিলাওয়াতে আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ

"(হে আল্লাহ) আমাদের বাতলিয়ে দিন সরল সঠিক পথ, তাঁদের পথ– যাঁদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথ নয়– যাদের উপর আপনার ক্রোধ পতিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট।"

অর্থাৎ জীবন চলার দুটি পথ রয়েছে। একটি হলো– নবী-রাসূলগণ, আল্লাহর অলি ও তাঁর প্রিয় বান্দাগণের পথ –মুক্তির পথ।

অপরটি হলো ইহুদী-খৃষ্টান, তথা আল্লাহর কোপগ্রস্ত, তাঁর অপসন্দনীয় নিকৃষ্ট লোকদের পথ –ধ্বংসের পথ।

সুখ-শান্তি, জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তগণের পথই অনুসরণ করতে হবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সকল কাজে তাদের আদর্শ বাস্তবায়ন

করতে হবে। বক্ষমাণ গ্রন্থে সে পথেরই বাস্তবচিত্র সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করেছেন সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক, গবেষক, শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দা. বা.।

আল্লাহ তা'আলা হযরতকে হায়াতে তায়্যিবা তাবিলা দান করুন।

'আলোকধারা প্রকাশন' থেকে এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের জন্য মুক্তির পথ সুগম করে দিন।

'আলোকধারা প্রকাশন'-এর পক্ষে
মাওলানা এনামুল হক নূর

নিচের লিংকে ক্লিক করে
আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে
যুক্ত হোন
👇
https://t.me/islaMic_fdf

# ভেতরের পাতায়

## মুক্তি যদি পেতে চাও–১

চাই ভলো কথা বলা, নয়তো চুপ থাকা ..... ১৪
বাকশক্তি কত বড় নিআমত ..... ১৬
বাকশক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে ..... ১৭
চাই জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ..... ১৮
নীরব থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা ..... ২০
ভাবিয়া কথা বলিয়ো ..... ২১
হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাযি.-এর ঘটনা ..... ২২
অতিকথনের ক্ষতি ..... ২৩
অহেতুক কথার যত ক্ষতি ..... ২৪

## মুক্তি যদি পেতে চাও–২

পরিবারে সময় না দেওয়ার ক্ষতি ..... ২৮
বাইরে বেশি ঘোরার কুফল ..... ৩০
সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত ..... ৩১
শেখ সাদীর কবিতা ..... ৩২
ঘরকে বানিয়ে নাও নিজ ভুবন ..... ৩৪
বাইরে যাওয়ায় নারীর ক্ষতি ..... ৩৫
তরুণ-তরুণীদের বাইরে বেশি যাওয়া বিপদ ..... ৩৭

## মুক্তি যদি পেতে চাও–৩

দরকার নিজের দোষ ও অন্যের গুণ দেখা ..... ৪২
চাই একে অন্যের কাজের মূল্যায়ন ..... ৪৪
অন্যের হক জানা ও আদায়ে অবহেলা ..... ৪৫
আত্মসমালোচনার জরুরত ..... ৪৭
অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর ক্ষতি ..... ৪৯
এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না ..... ৪৯
পারস্পরিক কলহ-বিবাদের এক বড় কারণ ..... ৫১

## তাওবার মধ্যেই সফলতা

## ইখলাসের সঙ্গে আমল করার আবশ্যিকতা

আখিরাতে ইখলাসবিহীন তিনজন আমলওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ ..... ৭২
অনুষ্ঠানাদিতে উপহার দেওয়ার লক্ষ্য ..... ৭৪
মৃত ব্যক্তির নামে ডাল-ভাত খাওয়ানোর উদ্দেশ্য ..... ৭৫
ইখলাসের সঙ্গে আমলের সুফল ও তার দৃষ্টান্ত ..... ৭৬
রিয়া বা গুপ্ত শিরক ..... ৭৯
ভাই ভাইয়ের বা বোনের উপকার করে কী উদ্দেশ্যে? ..... ৮০
চাচা-ভাতিজা সম্পর্ক ..... ৮১
নিয়তের জন্য ছোট আমলও বড় হয়ে যায় ..... ৮৩
একবার যদি সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলা হয় ..... ৮৫
চাই ইখলাসের সঙ্গে বেশি বেশি নেক আমল ..... ৮৭

## ঈমানী জীবনের চালিকাশক্তি সবর ও শুক্‌র

## ধৈর্যধারণের প্রয়োজনীয়তা ও তার সুফল

হযরত খাব্বাব রাযি.-এর সবর ..... ১০৪
হযরত আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আর-রমলী রহ.-এর ঘটনা ..... ১০৫
সবরে ছাওয়াব ও কষ্ট লাঘব ..... ১০৭
সব আশা পূরণের জায়গা কেবলই জান্নাত ..... ১০৮
দুনিয়া সব ইচ্ছা পূরণের জায়গা নয় ..... ১১০
সুখী হওয়ার দুটি উপায় ..... ১১২
সবরে উচ্চ মর্যাদা লাভ ..... ১১৩
বালা-মুসীবতে দুআ করা ও তার সুফল ..... ১১৬

## সুখের সংসার গড়তে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের উচিত অন্যজনের চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়ন করা ..... ১১৯
প্রত্যেকের উচিত অন্যজনের কাজের মূল্যায়ন করা ..... ১২১
একটি চমৎকার বিচার ..... ১২২

স্ত্রীর গর্ভকালীন সময়ে স্বামীর করণীয় ..... ১২৩
স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে সাহস দেওয়া ..... ১২৪
কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে নারীকে মুক্ত রাখা উচিত ..... ১২৭
একটি অসাধারণ ত্যাগের ঘটনা ..... ১২৮
স্বামীর অর্থাভাবে স্ত্রীর করণীয় ..... ১৩১
স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে আমাদের অবহেলা ..... ১৩২
প্রত্যেকের উচিত আপন দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া ..... ১৩৩
উচিত শতভাগ ধৈর্যধারণে সচেষ্ট থাকা ..... ১৩৩

## ধৈর্য না ধরার বহুবিধ ক্ষতি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা ..... ১৩৭
স্বামী-স্ত্রীর কলহ ও তার পরিণাম ..... ১৪০
বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা ..... ১৪১
বউ-শাশুড়ির মধ্যে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা ..... ১৪৩
চলার পথে ধৈর্যধারণ ..... ১৪৪
গৃহকর্মীর সঙ্গে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা ..... ১৪৫
অধৈর্যের অজস্র ক্ষতি ..... ১৪৬
কথার পিঠে কথা না বলার ধৈর্য ..... ১৪৭

## ঈমান ও ইসলামের জন্য সত্যিকারের শুক্‌র

সবচে' দামি নিআমত মুফতে পাওয়া ..... ১৫১
উহুদের যুদ্ধে নবী কারীম সা.-এর জখম হওয়া ..... ১৫২
তায়েফে তাঁকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল ..... ১৫৩
উতবা ও শায়বার গোলাম আদ্দাসের ঘটনা ..... ১৫৫
জিনদের ইসলাম গ্রহণ ..... ১৫৮
ঈমান ও ইসলামের জন্য মন-মস্তিষ্কের শুক্‌র ..... ১৬১
মুখের ও আমলের শুক্‌র ..... ১৬২
হযরত সা'দ ইবন মুআয রাযি.-এর ঘটনা ..... ১৬৩
দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান অবস্থা ..... ১৬৬
উলামা-বিদ্বেষের ভয়াবহ ক্ষতি ..... ১৬৭

## মানুষের মার্যাদা তাকওয়ার মধ্যে

সমস্ত মানুষ একই পিতামাতার সন্তান ..... ১৭১
কে শ্রেষ্ঠ মানুষ ..... ১৭২
তাকওয়া কাকে বলে ..... ১৭৪
জনৈক কামারের ঘটনা ..... ১৭৬
এক কাথায় তাকওয়া হল আল্লাহর হুকুম পালনের নাম ..... ১৭৮

## আল্লাহর স্মরণেই সুখ ও সফলতা

আল্লাহকে স্মরণ কীভাবে করা যায় ..... ১৮০
একটি মূল্যবান যিক্‌র ..... ১৮২
সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ ..... ১৮৩
সুখী না হওয়ার মূল কারণ ..... ১৮৪
গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না ..... ১৮৬
টাকা-পয়সা দিয়ে দামী হওয়া যায় না ..... ১৮৭
হযরত বিলাল হাবশী রাযি.-এর এত মর্যাদা কেন ..... ১৯০
কুকুরকে পানি পান করিয়ে মুক্তি লাভ ..... ১৯১
স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা ..... ১৯২
স্বামীর হক আদায় অবশ্যকর্তব্য ..... ১৯৩

## কবর-হাশর ও জান্নাতের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা

কবরের কঠিন কাল ..... ১৯৭
হাশরের বিভীষিকা ..... ১৯৮
দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত সময় আখিরাতের প্রস্তুতিকাল ..... ২০০
চলে যাওয়া সময়ে কার কী অর্জন ..... ২০৩
প্রয়োজন নিজের হিসাব নেওয়া ..... ২০৪
জাহান্নামের খাসলত ..... ২০৭
জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলবেন ..... ২০৭
অবিরাম যাত্রা কবরের দিকে ..... ২০৯

## আল্লাহর পথে দান-খয়রাত

হযরত উলবা ইবন যায়দ আনসারী রাযি.-এর ঘটনা ..... ২১৪
আবূ যামযাম এর ঘটনা ..... ২১৬
হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর ঘটনা ..... ২১৮
তাহলে জান্নাতে যাবে কিসের দ্বারা? ..... ২২০
আখিরাতের ব্যাংকে কার কী পরিমাণ জমা হয়েছে? ..... ২২১
একজনের খাবারে দু'জনের চলে ..... ২২৩
কে বড় দানবীর? ..... ২২৪
কারো কাছে কিছু চাওয়া প্রকারান্তরে তাকে মর্যাদা দেওয়া ..... ২২৬
মেহমান আসলে মন খারাপ করো না ..... ২২৭

## সহজে নেকী অর্জনের উপায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর বাজারে যাওয়া ..... ২৩২
কত কত কীরাত নেকীই না হারালাম! ..... ২৩৩
ঘরে বসে যত নেকী ..... ২৩৫
পানাহারে নেকী লাভ ..... ২৩৭
পোশাক পরায় যত নেকী ..... ২৩৭
ঘুমানোতে যত নেকী ..... ২৩৮
ছেলে-মেয়েকে জীবনাচারের আদাব শেখাবে কে? ..... ২৪১
দুনিয়ার কাজ দ্বারাও আখিরাত কামাই ..... ২৪২
মা-বোনদের জন্য সহজে নেকী অর্জন ..... ২৪৪

## পবিত্র রমাযান : চাই গুনাহ থেকে বাঁচা ও বেশি বেশি তাওবা

গুনাহ থেকে বাঁচার ঢাল ..... ২৪৭
শয়তানের হামলা থেকে আত্মরক্ষার উপায় ..... ২৪৮
রোযার হাকীকত সম্পর্কে ধ্যান ..... ২৪৯
গীবত কত কঠিন গুনাহ ..... ২৫০
তাওবা করতে বিলম্ব করা উচিত নয় ..... ২৫৩
গুনাহ হচ্ছে আত্মার ময়লা ও জঙ ..... ২৫৪
হযরত উমর রাযি.-এর ইসতিগফার ..... ২৫৬
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসতিগফার ..... ২৫৭

## কুরবানীর মাসাইল ও শিক্ষা

যুল-হিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত ..... ২৬০
কুরবানী করার ফযীলত ..... ২৬১
কার উপর কুরবানী ওয়াজিব ..... ২৬২
বাবা-মায়ের নামে কুরবানী ..... ২৬৪
গরুতে বেজোড় সংখ্যক শরীক হওয়া জরুরি নয় ..... ২৬৫
কুরবানীর সঙ্গে আকীকা ..... ২৬৬
কুরবানীর গোশত গরীবদেরকে দেওয়ার সঠিক নিয়ম ..... ২৬৭
কুরবানীর পশুর চর্বি বিক্রি করা ..... ২৬৮
চামড়ার টাকা বিতরণের সঠিক নিয়ম ..... ২৬৮
কুরবানীর চামড়া মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দেওয়া ..... ২৬৯
জবাইয়ের বিনিময়ে চামড়া দেওয়া ..... ২৬৯
কুরবানীর নিয়ত কী হবে? ..... ২৭০

## কুরবানীর শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবনে তার প্রয়োগ

দুনিয়ার অশান্তির বড় কারণ ..... ২৭৬
ত্যাগ স্বীকার করবে কে? ..... ২৭৯
প্রয়োজন নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবা ..... ২৮০
দুনিয়ার তুচ্ছতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া চাই ..... ২৮১
ছাড় দেওয়া সাহাবায়ে কেরামের বিশেষত্ব ..... ২৮৩
মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসায়ন রহ.-এর ঘটনা ..... ২৮৪

## আশুরার শিক্ষা

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের এক উদ্দেশ্য ..... ২৮৮
প্রাণ আছে সব কিছুর ..... ২৯০
হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধ ফল কেন খেলেন? ..... ২৯২
হযরত আদম আলাইহিস সালামের বিনয় ..... ২৯৩
ইবলীসের অহংকার ..... ২৯৫
আদম আলাইহিস সালামের বিনয়ের পুরস্কার ..... ২৯৬
ইবলীসের অহংকারের পরিণাম ..... ২৯৭
এক পাপ আরো অনেক পাপের দিকে টানে ..... ২৯৮
হিজরী মাস ও বছর বলতে না পারা লজ্জাজনক ..... ২৯৯
আশুরার ফযীলত আবহমান কাল থেকে ..... ৩০০

মুমিন ব্যক্তির কবীরা গুনাহ থাকার কথা নয়.....৩০৩
বিধর্মীদের অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব.....৩০৪
শেষ কথা.....৩০৬

## মায়েদের চাই আপন দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা

মায়েদের দায়িত্ব.....৩১১
নিজ সন্তানের খাতিরেও হালাল খাওয়া জরুরি.....৩১১
ইমামুল হারামায়নের ঘটনা.....৩১২
ইসলামী আদাব-কায়দা শেখানো.....৩১৩
ইমাম আবূ দাঊদ রহ.-এর ঘটনা.....৩১৫
বাংলা উচ্চারণে কুরআন ছাপানো ও পড়া.....৩১৭
হাঁচির আদাব-কায়দা.....৩১৮
হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে কাপড় বা হাত রাখা.....৩২১
ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণতা.....৩২২

## কুধারণার ক্ষতি ও এর সংশোধন

কুধারণা করা কবীরা গুনাহ.....৩২৬
কুধারণা আরো বহু গুনাহের কারণ হয়.....৩২৭
শাহ আহলুল্লাহ রহ.-এর ঘটনা.....৩৩০
কুধারণা করা মুনাফিকদের আলামত.....৩৩২
মুমিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা চাই.....৩৩৫
হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা.....৩৩৬
কুধারণার সংশোধন.....৩৩৯

## নব্য এক ফিতনার মুখোমুখি মুসলিম সমাজ

হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর ঘটনা.....৩৪৩
দজলা নদী পার হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা.....৩৪৪
কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে যেভাবে বরখাস্ত হলেন.....৩৪৬
হযরত উমর রাযি.-এর দূরদর্শিতা.....৩৪৮
হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর নমনীয়তা.....৩৫০
নব্য ফিতনার কারিগর.....৩৫২
বাদশাহ আলমগীরের ঘটনা.....৩৫৪

বাদশাহ মামুনুর রশীদের ঘটনা ..... ৩৫৫
বাদশাহ শাহজাহানের ঘটনা ..... ৩৫৬

## মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্য

আপন জায়গা থেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য ..... ৩৬২
মায়ের মর্যাদা ..... ৩৬৪
মাতৃত্বের মর্যাদার দাবি ..... ৩৬৬
মায়ের কাছ থেকে সন্তান কী শিখছে ..... ৩৬৭
সন্তানের সামনে অন্যের প্রতি আচরণে সতর্কতা ..... ৩৬৮
মায়ের নিজের আদর্শ মুসলিম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ..... ৩৭০

## ক্ষমাশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

কষ্টের রকমফের ..... ৩৭৬
ক্ষমা করার ভেতর মনের সুখ ..... ৩৭৫
কা'বা শরীফের চাবি ও উছমান ইবন আবী তালহার ঘটনা ..... ৩৭৭
আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘটনা ..... ৩৭৮
ঠকানোর রকমফের ..... ৩৮১
দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির মূলমন্ত্র ..... ৩৮৩

## আত্মমুগ্ধতা ও তার ক্ষতি

## মিথ্যা বলা আর নয়

হাশরের ময়দানে তিনজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ ..... ৪০১
ইখলাসের জরুরত ..... ৪০২
মিথ্যা বলা পরিহার করার জরুরত ..... ৪০৩
নিজের পাপ চোখে না পড়ার কারণ ..... ৪০৫
এক মায়ের ঘটনা ..... ৪০৬
শোনা কথা বলে বেড়ানো ..... ৪০৭
মুরুব্বীর কাছে শুনলেই বলা যাবে না ..... ৪০৮
দাওয়াতের যিম্মাদারী সব উম্মতেরই ছিল ..... ৪১০
মিথ্যা বলার নির্লজ্জতা ..... ৪১২
জাহিলী যুগেও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ..... ৪১৩
মিথ্যাচারের বহুবিধ ক্ষতি ..... ৪১৩



# মুক্তি যদি পেতে চাও—১

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟ قَالَ : امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

মুহতারাম ভাই–বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

বিখ্যাত সাহাবী হযরত উকবা ইবন আমের রাযি. একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟

মুক্তির উপায় কী?[১]

দুনিয়ার ফিতনা ও আখিরাতের আযাব থেকে নাজাত কীভাবে পাব? সাহাবায়ে কেরাম তো অহেতুক প্রশ্ন করতেন না। তারা দরকারি বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। এটা একটা দরকারি কথাই যে, দুনিয়ার ফিতনা থেকে কীভাবে বাঁচতে পারি, আখিরাতের আযাব থেকে কীভাবে মুক্তি লাভ করতে পারি। এটা তো জানা দরকার। তাই প্রশ্ন করলেন–

يَا رَسُولَ اللهِ مَا النَّجَاةُ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তির উপায় কী?

১. জামে' তিরমিযী : ২৪০৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটা কথা বললেন–

এক– امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

দুই– وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

তিন– وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

এই তিনটা কথা বললেন। এই তিনটা কাজ যদি তুমি কর, তাহলে দুনিয়ার ফিতনা থেকেও বাঁচবে আর আখিরাতে বাঁচবে জাহান্নামের আযাব থেকে। এই তিনটার প্রথম কথা–

امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

নিজের জিহ্বাকে নিজের ক্ষমতায় রাখো।

তার মানে মুখ থেকে যেন বেফাঁস কথা, ফালতু কথা, নাজায়েয কথা, শরীয়তবিরোধী কথা বের না হয়। মুখ থেকে যেন এমন কথাই বের হয়, যা কাজের কথা। গুনাহের কথা না; শরীয়তসম্মত কথা। নাজাত পাওয়ার জন্য এই হলো এক নম্বর বিষয়। নিজের জিহ্বার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। অপর এক হাদীছে বলা হয়েছে–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

যে আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন হয় ভালো কথা বলে নয়তো চুপ থাকে।[২]

## চাই ভালো কথা বলা, নয়তো চুপ থাকা

কথা বলতে হলে ভালো কথা বলতে হবে। উপকারী কথা। যে কথা দুনিয়ায় কাজে আসে আর আখিরাতেও কাজে আসে। যে কথায় দুনিয়ায় ক্ষতি হয় আর আখিরাতেও ক্ষতি হয়, এমন কথা আমরা যেন না বলি। এটা ঈমানের দাবি। এ হাদীছে ঈমানদারকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে–

২. সহীহ বুখারী : ৬০১৮; সহীহ মুসলিম : ৪৭; জামে' তিরমিযী : ১৯৬৭; সুনানে আবু দাউদ : ৫১৫৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৬৭২; মুসনাদে আহমাদ : ৭৬২৬

সে যেন ভালো কথা বলে, নয়তো চুপ থাকে। অর্থাৎ প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হল ভালো কথা বলা, নয়তো চুপ থাকা।

ভালো কথা হল– কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিক্‌র, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ, মানুষের মধ্যে মীমাংসা করা ইত্যাদি। মুমিনের কর্তব্য বাকশক্তি এসব কাজেই ব্যবহার করা। বেঈমান ও ফাসেক লোক বাকশক্তি ব্যবহার করে অন্যায় কাজে। মুমিনদের তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কুরআন মাজীদ বাকশক্তি কোন কাজে ব্যবহার করতে হবে তার হিদায়াত দিয়েছে–

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

তাদের বহু কথা এমন, যাতে কোনও কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি দান-সদাকা বা সৎ কাজের আদেশ করে অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তার কথা ভিন্ন।[৩]

আমরা প্রত্যেকেই চিন্তা করে দেখি, মুখ থেকে কেমন কথা বের হয়। মুখ তো আল্লাহর নিআমত। আর কথা বলতে পারাও আল্লাহর নিআমত। যেমন দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তাআলার নিআমত। ইরশাদ হয়েছে–

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ

আমি কি তাকে দেইনি দু'টি চোখ? এবং একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট? আমি তাকে দু'টো পথই দেখিয়েছি।[৪]

আল্লাহ তাআলা ভালো ও মন্দ পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কোন পথে চললে আল্লাহ খুশি হন ও কোন পথে চললে নারাজ হন, কী কথা বলা তিনি পছন্দ করেন এবং কিসব কথা অপছন্দ করেন, সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীছ দ্বারা। তাছাড়া অনেক কিছু নিজ আমল-বুদ্ধি দ্বারাও বোঝা যায়। প্রত্যেকের কর্তব্য

৩. সূরা নিসা : ১১৪

৪. সূরা বালাদ : ৮-১০

কুরআন ও হাদীছের আলোকে ও নিজ আকল-বুদ্ধি খাটিয়ে বাকশক্তির ব্যবহার করা এবং এ নিআমতের মূল্য বোঝা।

## বাকশক্তি কত বড় নিআমত

যে ব্যক্তি কথা বলতে পারে না তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। একজন বোবা মানুষকে দেখুন। তার মনের ভাব প্রকাশ করতে কত কষ্ট। যে কথা বলতে জানে, সে তার মনের ভাব অতি সহজেই প্রকাশ করতে পারে। মনের সুখ-দুঃখের কথা মুখ দিয়ে বলি আর আরেকজন বুঝে ফেলে। কত সহজে বলা যায়। কথা বলতে হলে বোতাম টিপতে হয় না। ইচ্ছেমতো বলি। কোনও খরচ নেই। রোজ কত কথা বলি। ঘুম থেকে ওঠে আবার ঘুমানো পর্যন্ত এই পুরো সময় আমরা কত কথা বলি। এই কথাগুলো যদি লিখে বলতে হতো তাহলে কত কাগজ লাগত এবং এর পিছনে কত সময় ব্যয় করতে হত! কত খরচ হতো। কিছুই লাগে না। ফ্রি, একদম মুফতে আল্লাহ তাআলার এতো বড় একটা নিআমত ভোগ করছি! হাজারো কথা রোজ বলি। কত উপকৃত হই কথা বলার দ্বারা! কথা বলতে না পারলে কত ক্ষতি হতো! এই মুখ দিয়ে একবার সুবহানাল্লাহ বললে কত ছাওয়াব পাওয়া যায়! একবার আল্লাহু আকবার বললে কত ছাওয়াব পাওয়া যায়! একটা ভালো কথা বলি, আরেকজনের মনটা শান্ত হয়ে যায়। একজন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটে ওঠে এ মুখের কথায়।

আবু উমায়র নামে এক শিশু সাহাবীর একটা পাখি মারা গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখতে গেলেন। বললেন–

يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

ওহে আবু উমায়র! কি হলো তোমার নুগায়রের?[৫]

পাখিটার নাম নুগায়র। 'হে আবু উমায়র! তোমার পাখি নুগায়রের খবর কী' এ ছন্দ বললেন। বাচ্চাটার মন তখন খারাপ ছিল। এ ছন্দ ছড়া

৫. সহীহ বুখারী : ৪৯৭১; সহীহ মুসলিম : ২১৫০

শুনে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। কথা বলে একজন কান্নারত লোককে হাসিয়ে দেওয়া যায়। মনের দুঃখ মুছে ফেলা যায় একটা কথার মাধ্যমে। কত বড় নিআমত বলাটা।

## বাকশক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে

এত বড় নিআমতকে আমরা কী কাজে ব্যবহার করি? আল্লাহ তায়ালা বলেন–

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

তোমাকে যত নিআমত দেয়া হয়েছে, এসব নিআমত সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে।[৬]

তোমাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছিলাম। এই শক্তিটাকে তুমি কী কাজে ব্যবহার করেছ? জিজ্ঞেস করা হবে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লেখার জন্য তার কাছে আছে এক তৎপর সংরক্ষক।[৭]

যে যা বলে, সঙ্গে সঙ্গে তা লেখা হয়ে যায়। একজন সদা তৎপর লেখক তা লেখায় নিযুক্ত আছে। যা বলে, সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ড হয়ে যায়। হাশরের ময়দানে রেজিস্টার খুলে দেয়া হবে।
ইরশাদ হয়েছে–

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

(বলা হবে) তুমি নিজ আমলনামা পড়ো। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।[৮]

---

৬. সূরা তাকাছুর : ৮
৭. সূরা ক্বাফ : ১৮
৮. সূরা বনী ইসরাঈল : ১৪

وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰىهَا

তারা বলবে– এ কী আমলনামা! সবকিছু লেখা আছে। ছোট বড় কোন কথা বাদ নেই।[৯]

কোনও কাজ, কোনও আমল বাদ নেই। লেখা হয়ে গেছে। লেখা হয়ে যাচ্ছে। সেদিন হাশরের ময়দানে খুলে দেওয়া হবে। বলা হবে– 'পড়ো' 'দেখো'। এখন তো বলে ফেলি। মিথ্যা কথা বলছি। মনে করি যে, কেউ বুঝতে পারবে না। কিন্তু মিথ্যা কথা বললে মানুষ বুঝে ফেলে। যাকে বলা হয় সতর্ক হলে সে বুঝে ফেলে। আর ভিতরে ভিতরে সে আমাকে ঘৃণা করে। ভাবে– এই লোকটা একটা মিথ্যুক। সব রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। হাশরের ময়দানে খুলে দেখানো হবে আর বলা হবে– আমলনামা পড়ো। তখন দেখা যাবে কোন দিন কার সামনে মিথ্যা বলেছিলে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন কী অবস্থা হবে? মুখ দিয়ে কত অশ্লীল কথা বলি। কাউকে একটা গালি দিয়ে দিলাম 'অমুকের বাচ্চা,' ওটা লেখা হয়ে যাবে। অমুক দিন, অমুক সময় এই গালিটা আমি অমুককে দিয়েছিলাম।

## চাই জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

সবকিছুই লেখা হয়ে যায়। কোনও কিছুই এমনি এমনি চলে যায় না। কাজেই–

اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

তুমি তোমার জিহ্বার উপরে নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখো।

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করো। মুখ থেকে যেন ফালতু কথা, অহেতুক কথা বের না হয়। কাজের কথা যেন বের হয়। এই মুখ তোমাকে অহেতুক কথা, ফালতু কথা বলার জন্য দেওয়া হয়নি। এই মুখ তোমাকে দেওয়া হয়েছে তোমার প্রয়োজন সারার জন্যে, তোমার জরুরী কথা বলার

৯. সূরা কাহফ : ৪৯

জন্যে। আল্লাহর যিক্‌র করার জন্যে, কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত করার জন্যে। তুমি রোজ তিলাওয়াত করবে–

يس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

তোমার জবান দেওয়া হয়েছে সূরা ইয়াসীন পড়ার জন্যে। আয়াতুল কুরসী পড়ার জন্যে। আল্লাহর যিক্‌র করার জন্যে। এমনি এমনি এই মুখ দেওয়া হয়নি। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللهِ

> আদম সন্তানের সব কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, তার পক্ষে উপকারী নয়। তবে সৎ কাজের আদেশ করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা সম্পর্কিত কথা এবং আল্লাহ তাআলার যিক্‌রের বিষয়টা ভিন্ন (অর্থাৎ কেবল এগুলোই উপকারী)।[১০]

অর্থাৎ বাকশক্তির ব্যবহার কেবল এসব কাজেই হওয়া উচিত। এরই জন্য তাকে এ শক্তি দেওয়া হয়েছে। তোমাকে এ মুখ এই জন্য দেওয়া হয়নি যে, আরেকজনকে গালি দেবে। মিথ্যা কথা বলবে। অন্যের মনে কষ্ট দিবে কিংবা অশ্লীল কথা বলবে। এই মুখ এজন্য দেওয়া হয়নি যে, গান গেয়ে বেড়াবে। এই মুখ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর যিক্‌র করার জন্য। তুমি এই নিআমতকে কোন কাজে ব্যবহার করছ লক্ষ করে দেখো। তোমার কথা যদি আল্লাহর যিক্‌র সম্পর্কিত না হয়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কিত না হয়, দীনের দাওয়াত ও মানুষকে নসীহত করা সম্পর্কিত না হয় কিংবা দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কথা না হয়, তবে তা সম্পূর্ণ বেদরকারি কথা। তা না বলে চুপ থাকাই শ্রেয়। সে ক্ষেত্রে হাদীছে চুপ থাকতেই বলেছে।

---

১০. জামে' তিরমিযী : ২৪১২; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯৭৪

# নীরব থাকার মধ্যেই নিরাপত্তা

এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মুআয ইবন জাবাল রাযি.-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন –

إِنَّكَ مَا كُنْتَ سَاكِتًا فَأَنْتَ سَالِمٌ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ فَلَكَ أَوْ عَلَيْكَ

তুমি সর্বদা নিরাপদ থাকবে– যাবৎ নীরব থাকবে। যখন কথা বলবে, তখন হয়তো তা তোমার অনুকূলে লেখা হবে অথবা তোমার প্রতিকূলে (অর্থাৎ হয়ত ছাওয়াব লেখা হবে, নয়তো গুনাহ)।[১১]

সুতরাং জিহ্বার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা অতীব জরুরি। যদি নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে না কর তাহলে বাঁচবে না। এই দুনিয়ায় ফিতনায় পড়ে যাবে আর আখিরাতেও আযাবের সম্মুখীন হতে হবে। যদি দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচতে চাও তাহলে মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীছে ইরশাদ করেন–

مَنْ صَمَتَ نَجَا

যে নীরব থাকে সেই মুক্তি পায়।[১২]

কত লোক আছে অহেতুক কথা বলার কারণেই আটকে যায়। ঘরে অশান্তি দেখা দেয়। আত্মীয়ে-আত্মীয়ে কলহ দেখা দেয় এ অহেতুক কথার কারণে, ফালতু কথার কারণে। কিছু লোক আছে চোগলখোর। একজনের কাছে গিয়ে তার পছন্দের কথা বলে আবার আরেকজনের কাছে গিয়ে তার পছন্দের কথা বলে, এরপরে দু'জনকে লাগিয়ে দেয়। এরা হলো দুমুখো সাপ। দু'জনকে লাগিয়ে দেয়। চোগলখোরী করে বেড়ায়। এই মুখ তো এই জন্য দেওয়া হয়নি যে, তুমি চোগলখোরী করবে আর সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করবে। দু'জনের মধ্যে লাগিয়ে দেবে।

---

১১. মুসনাদে আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী : ৫৬২

১২. জামে' তিরমিযী : ২৫০১; মুসনাদে আহমাদ : ৬৪৮১

# অবিয়া কথা বলিয়ো

কথা বলার আগে চিন্তা করো– আমি যে কথাটা বলছি সে কথাটা বলার দরকার আছে নাকি অহেতুক বলছি? দরকার কীভাবে মাপবে? এই কথার দরকার আছে কি নেই কীভাবে বুঝবে? বিচার করবে কীভাবে? বিচার করতে হয় এভাবে যে, কথাটা যদি না বলি তাহলে ক্ষতি কী? যদি কথা না বললে কোনও ক্ষতি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এ কথার কোনও দরকার নেই। দেখতে হবে কথা বললে লাভ আছে কি না? যদি লাভ থাকে তখন আবার চিন্তা করতে হবে সেই লাভটা বৈধ লাভ নাকি অবৈধ লাভ? শরীয়তসম্মত লাভ না শরীয়তবিরোধী লাভ? যদি শরীয়তসম্মত লাভ হয় তাহলে বুঝতে হবে এ কথাটার দরকার আছে। যদি শরীয়তসম্মত লাভ না হয় তাহলে এই কথার দরকার নেই। সেটা বেদরকারি কথা। অহেতুক কথা। সে কথা বলব না। তাহলে কথা বলার আগে চিন্তা করতে হবে দরকার আছে কি না। যদি এই চিন্তা করি, আমাদের চার ভাগের তিন ভাগ কথা বন্ধ হয়ে যাবে।

বিখ্যাত তাবে-তাবিঈ মুহাম্মাদ ইবন আজলান রহ. বলেন, কথা চার প্রকার–

১. আল্লাহর যিক্‌র করা।

২. কুরআন তিলাওয়াত করা।

৩. ইলমী আলোচনা করা।

৪. দুনিয়ার প্রয়োজনীয় কথা বলা।[১৩]

এর বাইরে যে কথাই বলা হবে তা হয়তো গুনাহের কথা হবে, নয়তো অহেতুক কথা। আর অহেতুক কথার পরিণাম গুনাহই বটে।

আমরা যত কথা বলি এর মধ্যে অধিকাংশই হলো বেদরকারি কথা। যেমন– কারো নিন্দা করা। বসে আছি, ব্যস, একজন সম্পর্কে আলোচনা করে দিলাম– ওই লোকটা এই কাজ করছে। আর এই নিয়ে এক ঘন্টা চলে গেল। এই এক ঘন্টা যে কথা বলা হলো এ সবগুলোই ছিল ফালতু

১৩. ইবনু আবিদ্দুনয়া, আসসমতু ওয়া আদাবুল লিসান : ১/২৬৩

কথা। অমুক তার মেয়ে বিয়ে দিয়েছে আমাকে দাওয়াত দেয়নি। কেন দাওয়াত দিল না? ব্যস, এই নিয়ে এক ঘন্টা পার করে দিলাম। শেষপর্যন্ত এই নিয়ে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়ে যায়। পরিবারে পরিবারে কলহ। আমাকে কেন দাওয়াত দিল না এটা ভাবার কোনও দরকার আছে? এর পিছনে পড়ার কী প্রয়োজন? বিয়ে ঠিক হয়েছে এরপর বলেছে, এ নিয়েও গোস্বা। ঠিকঠাক করে আমাকে জানাচ্ছ? কেন, তার মেয়ের বিয়েতে আমাকে জানানো তার কর্তব্য নাকি? ফরয নাকি? সে কী অপরাধটা করল? এটা কোনও ফরয কাজ তো ছিল না। সে না জানালে তাতে অপরাধ কী হলো? তার কাছে এটা তো আমার শরঈ কোনও পাওনা ছিল না! আমার হক ছিল না!

## হযরত আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাযি.-এর ঘটনা

দেখুন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কত ভালোবাসতেন। এতো ভালো জগতে কেউ কাউকে বাসে? সেই সাহাবীর মধ্যে একজন আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাযি.। একজন বিশিষ্ট সাহাবী। যেই দশজনকে একসঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে বলে "আশারায়ে মুবাশ্‌শারা"। সেই দশজনের একজন হলেন আব্দুর রহমান ইবন আওফ রাযি.। তাহলে কত উপরের স্তরের সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কত প্রিয় সাহাবী! কত ঘনিষ্ঠ সাহাবী! একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন যে, আব্দুর রহমানের পোশাক-আশাক একটু কেমন দেখা যায়। গায়ে একটু রং লেগেছে যেন। আতর মাখিয়েছে তাই। কোনও কোনও আতর আছে যার রং আছে। যেমন– মিশক আম্বর, এ সমস্ত আতরে রং থাকে। এগুলো শরীরে লাগালে রং লেগে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডেকে বললেন– আব্দুর রহমান! রং দেখছি যে! ব্যাপার কী? আব্দুর রহমান রাযি. বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিয়ে করলাম। তিনি বললেন– তাই? খুব ভালো। ওলিমা করো।[১৪] একথা জিজ্ঞেস করলেন না যে, আব্দুর রহমান! বিয়ে

১৪. সহীহ বুখারী : ২০৪৮; সহীহ মুসলিম : ১৪২৭

করলে আমাকে জানালে না তো? বিয়ে করে ফেললে? আমাকে একবারও বললে না? একথা তো বললেন না। কিংবা আব্দুর রহমান রাযি.-ও এই গরজবোধ করেননি যে, আমি বিয়ে করব আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাতেই হবে। তিনিও জানাননি।

এতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিয়ে করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাননি। আবার না জানানোর কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও গোস্বা করেননি।

আপনার আমার নাকে কেন এতো গোস্বা? ভাই তার মেয়েকে বিয়ে দিল আর আমাকে জানাল না, ব্যস, এখন আর ভাইয়ের মুখ দেখতে রাজি না। আর এই নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট। অহেতুক ফালতু কথা বলে আমরা এরকম অনেক সময় নষ্ট করি। প্রত্যেকেই যদি চিন্তা করেন পাবেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর আবার ঘুমানো পর্যন্ত এ পুরো সময় যে কথা বলা হয় এর মধ্যে অধিকাংশই ফালতু কথা। কিন্তু এ ফালতু কথা তো এমনি এমনিই যাবে না। আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন–

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.

> মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত আছে, যে (লেখার জন্য) সদা প্রস্তুত।[১৫]

## অতিকথনের ক্ষতি

যে যা বলে, সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে যায়। আমলনামার গুনাহের দিক তো ভারী হচ্ছে। ফালতু কথার দিক তো ভারী হয়ে যাচ্ছে। একটা কথা বলি আর পাপের দিক ভারী হয়। রোজ ভারী হচ্ছে। আমল তো ওজন করা হবে। সমস্ত কথা ওজন করা হবে। যার নেকীর দিক ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে, আর যার পাপের দিক ভারী হবে সে জাহান্নামে যাবে।

---

১৫. সূরা কাফ : ১৮

একেকটা কথা বলি আর পাপের ওজন বাড়াই। এজন্য কর্তব্য হচ্ছে বেশি কথা বলা থেকে বেঁচে থাকা। বেশি কথা বললে ফালতু কথা বা গুনাহের কথা হবেই। হযরত উমর রাযি. বলেন– যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে তার ভুল বেশি হয়। যার ভুল বেশি হয় তার গুনাহও বেশি হয়। আর যার গুনাহ বেশি হয়, সে জাহান্নামেরই বেশি উপযুক্ত।

বেশি কথা বলার সবচে' বড় ক্ষতি হল মন শক্ত হয়ে যাওয়া। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي

আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বেশি কথা বলার দ্বারা অন্তর শক্ত হয়ে যায়। আর আল্লাহর থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে ওই ব্যক্তি, যার অন্তর শক্ত।[১৬]

## অহেতুক কথার যত ক্ষতি

প্রশ্ন ছিল, মুক্তি কিসে? দুনিয়ায় মুক্তি ও আখিরাতে মুক্তি! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানান– মুক্তি পেতে হলে তিনটা কাজ করতে হবে। দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে হলে, আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচতে হলে তিনটা কাজ করতে হবে। এর এক নম্বরের কাজ হলো মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। মুখ থেকে অহেতুক কথা, ফালতু কথা, গুনাহের কথা যেন বের না হতে পারে। যদি তা হয় তাহলে দুনিয়ায়ও ফাসাদ হবে। আত্মীয়ে আত্মীয়ে ঝগড়া হবে। ভাই-বোনে বিরোধ হবে। স্বামী-স্ত্রীতে লেগে যাবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে হানাহানি হবে। এমনকি এমনও হতে পারে যে, ফালতু অহেতুক একটা কথা বলেছ আর পুলিশের কানে চলে গেছে। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। হয়তো মশকারা করে একটা কথা বলেছে, আসলে কিছুই না। সে জঙ্গি না, সে জঙ্গিবাদীকে ঘৃণা করে। কিন্তু বলে ফেলল যে, ওকে

১৬. জামে' তিরমিযী : ২৪১১

বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া দরকার। আর যেখানে বলেছে সেখানে এক গুপ্তচর আছে, গোয়েন্দা আছে। সে ফালতু কথা বলে ধরা খেয়ে গেল। তো দুনিয়ায়ও ফাসাদ।

কথা বলার আগে যদি চিন্তা করত তাহলে এই ফালতু কথা বলত না, আর ক্ষতি থেকে বেঁচে যেত। চিন্তা করলে তিন ভাগের এক ভাগ কথাই বন্ধ হয়ে যাবে। আর তিন ভাগের এক ভাগ কথা বলা বন্ধ হওয়ার মানেই হল দুনিয়ার ফাসাদ থেকে বাঁচা, আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচা। এতে সময়ও বাঁচবে। প্রচুর সময় বাঁচবে।

কোনও দীনী কাজের প্রশ্ন আসলে আমাদের আজকে একটাই কথা, এতো সময় কই? সময় নেই। আরে ভাই কিতাব পড়েন। দীনী বই পড়েন। বলে, সময় কই? সময় নেই কেন? সময় নেই এজন্য যে, ফালতু কথা বলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে। অহেতুক কথা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে। বিস্তর পড়াশোনা করা যাবে। তখন দেখা যাবে যে, একজন লোক ঘরে বসে বসে অনেকটা মৌলভী সাব হয়ে গেছে। এখন সময় পাই না কেবল এই জন্য যে, সময় অহেতুক নষ্ট করছি। মানুষের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসকে আমরা সবচেয়ে ফালতু কাজে নষ্ট করি। কেবল এই কারণে যে, আমরা হিসাব করে কথা বলি না। কথা বলার আগে চিন্তা করি না। অবলীলায় নাজায়েয কথা বলে যাচ্ছি। বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছি এবং পাপের বোঝাও বাড়াচ্ছি। তাই উচিত যবানে লাগাম পরানো। মুখের কপাট বন্ধ করে রাখা। আল্লাহ তাআলা তো কপাট দিয়েই দিয়েছেন। দুই ঠোঁট হল কপাট। আল্লাহ বলেন–

وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ

আর দিয়েছি জিহ্বা ও দুই ঠোঁট।[১৭]

ঠোঁট হল মুখের কপাট। জায়েয ও দরকারি কথা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে এ কপাট বন্ধ করে রাখা চাই। এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

১৭. সূরা বালাদ : ৯

হে মানুষ! তোমার জিহ্বা যদি তোমার অবাধ্য হতে চায়, আর আমি যা তোমার জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছি তা বলতে চায়, তবে তো আমি দুটি কপাট দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছি। তুমি সে ক্ষেত্রে এ কপাট বন্ধ করে দিয়ো।

আমার কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যে এবং আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচার জন্যে তিনটা পরামর্শ দিয়েছেন। সেই তিনটা পরামর্শের এক নাম্বারটা হলো- নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করো। কথা বলার আগে বিবেচনা করে কথা বলো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে বিবেচনা করে কথা বলার তাওফীক দান করুন।

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

https://t.me/islaMic_fdf



# মুক্তি যদি পেতে চাও-২

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى: وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!
গত মঙ্গলবারে এক হাদীছ উল্লেখ করেছিলাম। সে হাদীছে সাহাবী উকবা ইবন আমের রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি লাভের উপায় কী?

مَا النَّجَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুক্তি লাভের উপায় কী?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তিনটি কথা বলেছিলেন। এই তিনটি কাজ যদি করতে পার, দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পেয়ে যাবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় কোনও ফিতনার সম্মুখীন হবে না। দুনিয়ায় কেউ তোমাকে দীন থেকে সরাতে পারবে না। আর আখিরাতেও জাহান্নাম

থেকে বেঁচে যাবে, যদি এই তিনটি কাজ করতে পার। সে তিনটার একটা ছিল–

امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

তুমি তোমার জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখো

নিজের মুখ ও নিজ কথাবার্তা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখো। এই সম্পর্কে গত মঙ্গলবার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দ্বিতীয় কথা বলেন–

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

নিজের ঘরই যেন তোমার বিচরণের জন্য যথেষ্ট হয়।

মুক্তি যদি পেতে চাও দুনিয়া ও আখিরাতে, তাহলে তোমার বিচরণের জন্যে, তোমার ঘোরাফেরার জন্যে তোমার নিজ ঘরটাই যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। অর্থাৎ অহেতুক ঘোরাফেরা করো না। ঘরের বাইরে অহেতুক যাবে না। জরুরি কাজ সমাধার জন্যে বাইরে যতটুকু সময়ের দরকার ততটুকু সময়ই থাকবে। এর অতিরিক্ত সময় বাইরে কাটাবে না। এর অতিরিক্ত সময়টা নিজ ঘরে কাটাবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। আজ দুনিয়ায় এতো ফিতনা। সমস্ত ফিতনার মূলে মানুষের বহির্মুখিতা। মনটা থাকে ঘরের বাইরে। ঘরে সময় কম দেওয়া হয়। ঘরের অভিভাবক পুরুষ। চাকরি-বাকরির পরে যে সময়টা, সে সময়টাও বাইরে কাটায়। ঘরের ছেলে-মেয়েকে, স্ত্রীকে সময় কম দেয়।

## পরিবারে সময় না দেওয়ার ক্ষতি

সময় কম দেওয়ার কারণে স্বামী-স্ত্রীতে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে না। আর সন্তানদের সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক হয় না। একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। স্ত্রী যখন স্বামীকে দেখে বাইরে বাইরে চলে, বাইরে ঘোরাফেরা করে, তখন মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, বাইরে কোথায় যায়? অনেক স্ত্রীর অভিযোগ– আমি আমার স্বামীকে ঠিকভাবে পাই না। আর স্ত্রীও তো সঙ্গ চায়। যখন স্বামীর সঙ্গ পায় না তখন অন্যের সঙ্গ খোঁজে।

ফলে ফিতনা দেখা দেয়। এরকমের ফিতনায় বহু পরিবার ভেঙ্গে যায়। অনেক বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটে স্বামীর বহির্মুখিতার কারণে।

এমনিভাবে ছেলেমেয়েও বখে যায়। ঘরে ফিতনা থাকার কারণে মাকেও এতো ভয় পায় না। অধিকাংশের অবস্থা তো এই, বাবাকে যতটা ভয় পায় মাকে ততটা ভয় পায় না। না পাওয়ার কারণ মা বেশি আদর করে। মা শাসন কম করে। এটা মায়ের চরিত্র। মা সহজে সন্তানকে শাসন করতে পারে না। ফলে মাকে ততটা ভয় পায় না। শাসন-সোহাগ দুটোই দরকার। এখন মা তো সোহাগ করছে, বাবার শাসন নাই, বাবা থাকে বাইরে। ফলে এই ছেলেমেয়ে বখে যায়, নষ্ট হয়ে যায়।

বাবার হুঁশ হয় যখন ছেলে কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়, মেয়ে কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়। ওই সময়ের হুঁশে কোনও কাজ হয় না। যখন তাকে গড়ে তোলার দরকার ছিল, যখন সঙ্গদান দরকার ছিল, ওই সময় সঙ্গ দেয়নি। এখন সঙ্গ দিতে গেলেও ছেলেমেয়ে এটাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে। যখন ছেলেমেয়ে বড় হয়ে যায় আর আগে তাকে সঙ্গ দেওয়া না হয়, তখন সময় দিতে চাইলে ছেলেমেয়ে তাকে বাড়তি ঝামেলা মনে করে। উচিত ছিল আগেই ছেলেটাকে সময় দিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা। তার সঙ্গে ফ্রি হয়ে যাওয়া। যাতে করে সন্তান তার সুখ-দুঃখের সমস্ত কথা বাবাকে বলতে পারে। সেই সুযোগ না দেওয়ার কারণে ছেলেমেয়ে বখে গেছে। এখন বাবার সঙ্গে লুকোচুরি করে। এখন বাবা শুনতে চাইলেও বাবাকে বলবে না। গোপনে গোপনে অপরাধ করে বেড়ায়। এখন আর এ ছেলেমেয়েকে পথে আনা বাবার পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্যেই বাইরে কাজ করার পর যে সময়টা হাতে থাকে, সে সময়টা বাইরে ঘোরাফেরা না করে ঘরে দেওয়া চাই।

কথা আরো আছে। বাইরে ঘোরাফেরা করলে মন-মানসিকতা নষ্ট হয়। বাইরের জগৎ নানান রকম প্রলোভন-উস্কানিতে ভরা। বাইরে বের হলেই চোখে পড়ে মানুষের দামী গাড়ি, আলিশান বাড়ি। দেখা যায়

কত দামী দামী জুতা পরে মানুষ ঘুরছে। কত দামী দামী পোশাক পরে চলাফেরা করছে। আমারটার চেয়ে ওর পোশাকটা দামী। তার জুতাটা দামী আমার চেয়ে। টাকা-পয়সা অনেক বেশি। এগুলো বেশি বেশি চোখে পড়ে। আর অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যত বেশি চোখে পড়বে, ভেতরে তত বেশি লোভ জন্মাবে। তখন মনে চাবে আমারও তার মতো গাড়ি হোক, তার মতো বাড়ি আমারও হোক। আমার জামা-জুতা তার মতো হোক। কিন্তু বৈধ পথে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তখন অবৈধ পথ খোঁজে। তখন হালাল ছেড়ে হারাম পথে পয়সা উপার্জনের চেষ্টা করে।

## বাইরে বেশি ঘোরার কুফল

বাইরে যত ঘুরবে ততই দুনিয়ার প্রলোভন তাকে বিপথগামী করবে। দুনিয়ার লোভে তত বেশি সে পড়ে যাবে। এমনিভাবে বাইরে যত ঘুরবে তত দেখবে অধিকাংশ মানুষই দীনের বাইরে চলছে। দীনের পথে নেই; বেদীনী পথে চলছে। ওটা দেখে দেখে তার ভেতরেও ওদের মতো হয়ে যাওয়ার আগ্রহ জন্মাবে।

আধিকাংশ লোক যে পথে চলে, মানুষের নফস সে দিকেই ঝোঁকে। তো বাইরে যত ঘুরবে ততই দেখবে বেদীনী মানুষ দীনের বাইরের পথে চলছে। অধিকাংশ মানুষ বেনামাযী। অধিকাংশ মানুষ ফাসেক ফুজ্জার। অধিকাংশ মানুষ ইহুদী-নাসারার পথে চলছে। আর তাদের কত সুখ! এটা বাহ্যিক সুখ। বাস্তব সুখ হোক আর না হোক, একটা বাহ্যিক সুখ দেখা যায়। কী সুন্দর! সবাই মদের আসরে সুর তোলে, আমি পারছি না। সবাই ইচ্ছেমতো স্ফূর্তি করছে, আমি পারছি না। ওই সমস্ত দেখে দেখে নিজের ভেতরেও ভুল পথে চলার একটা আগ্রহ তৈরি হয়। ওইটা এক রকম সাহচর্য। বাইরে চলাফেরাটাও এক রকম সাহচর্য। অর্থাৎ বদদীন লোকের সঙ্গ। আর এরূপ সাহচর্য খুব খারাপ জিনিস মানে বদলোকের সাহচর্য। কথায় আছে, 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।' বাইরে যত চলবে ততই অসৎ লোকের সঙ্গে থাকা হবে। আর অসৎ লোকের সঙ্গে চলে চলে সে নষ্ট হয়ে যাবে।

## সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎসঙ্গ ও অসৎসঙ্গের উদাহরণ দান করেছেন আতরওয়ালা ও কামারের দ্বারা। এক হাদীছে তিনি ইরশাদ করেন–

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

অর্থাৎ সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, আতরওয়ালা ও চুল্লি ফুঁ দাতা অর্থাৎ কামারের মতো (তুমি বঞ্চিত হবে না) হয়তো সে তোমাকে আতর লাগিয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে আতর কিনবে কিংবা তার কাছ থেকে ভালো ঘ্রাণ পাবে। আর কামারের কাছে বসলে হয় তোমার কাপড় পুঁড়ে ফেলবে নয়তো তার থেকে বদবু পাবে।[১৮]

সৎ লোকের সঙ্গ হলো আতরওয়ালার দোকানে বসার মতো। কেউ যদি কোনও আতরের দোকানে বসে তাহলে ওই আতরওয়ালা তার গায়ে একটু আতর লাগিয়ে দেবে। আতরের ঘ্রাণ যখন তাকে মুগ্ধ করবে তখন মন চাবে একটু আতর কিনি। ফলে অল্প হোক আর বেশি হোক, একটু আতর সে কিনবে। আর যদি তা নাও হয়, আতর নাও কেনে, সেই লোক আতর নাও লাগিয়ে দেয়, তারপরও যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তো আতরের সুরভির মধ্যে থাকবে। এরপর বের হওয়ার পরও দেখা যাবে, কিছুক্ষণ তার গায়ে আতরের ঘ্রাণ থাকে। যেই তার পাশ দিয়ে হাঁটবে সেই তার গা থেকে একটু আতরের ঘ্রাণ পাবে।

---

১৮. সহীহ বুখারী : ৫৫৩৪; সহীহ মুসলিম : ২৬২৮; মুসনাদে আহমাদ : ১৬৯২৪

সৎ লোকের সঙ্গে চললে এরকম হয়। সৎ লোকের সঙ্গে চললে নিজেরও তার দেখাদেখি সৎ হতে মনে চাবে। তার কাছ থেকে সততা শিখবে। ভালো আমল, ভালো আখলাক তার কাছ থেকে শিখবে। আর তা যদি নাও শেখে, তবুও বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই সৎ লোকের সঙ্গত্যাগের সাথে সাথেই সে কোনও খারাপ কাজ করতে পারবে না। একটু সময় লাগবে। এইমাত্র একটা ভালো লোকের সঙ্গে থাকলাম। কিছুক্ষণ ভালো লোকের সঙ্গে কাটালাম, এখনই কীভাবে খারাপ কাজটা করি! খারাপ কাজ করতে তার একটু সময় লাগবে।

এমনিভাবে অসৎসঙ্গ হলো কামারের দোকানে বসার মতো। কেউ যদি কামারের দোকানে বসে তাহলে দেখা যাবে কামার যখনা হাপর চালায়, হাপর চালিয়ে চালিয়ে চুলার আগুন বাড়ায়, তখন স্ফুলিঙ্গ তার দিকে ছোটে। বসে থাকলে অগুনের স্ফুলিঙ্গ গায়ে এসে পড়বে। দেখা যাবে জামায় ফুটো হয়ে গেল। এক জায়গাতে পুড়ে ছিদ্র হয়ে গেল। তা না হোক কালি তো লাগবে। কালিও না লাগুক ধোঁয়ার গন্ধ তার গায়ে আসবে। যখন বের হয়ে যাবে দেখা যাবে তার গায়ে কালি লেগে আছে। আর তা না হলেও তার শরীর থেকে ধোঁয়ার গন্ধ ছুটছে।

ঠিক ওইরকম বদ লোকের সঙ্গে চললে তার বদ খাসলত নিজের মধ্যে আসবে। মিথ্যুকের সঙ্গে চললে নিজের ভেতরও মিথ্যা বলার আগ্রহ জন্মাবে। সিগারেটখোরের সঙ্গে চললে নিজেরও একটু খেতে মন চাবে। আর তা না হলেও অন্ততপক্ষে তার কাছ থেকে সরার পরেও দেখা যাবে তার গা থেকে সিগারেটের গন্ধ আসছে। তার চরিত্র থেকেও বদবু আসছে। তার কাছ থেকে সরার পরেও তার ভেতর বদ খাসলতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, করতে মন চাবে। খারাপ কাজ করতে মন চাবে তার মতো।

## শেখ সাদীর কবিতা

এ বিষয়টাকে শেখ সাদী রহ. তার এক কবিতায় সুন্দর করে বলেছেন। শেখ সাদী রহ. বিখ্যাত কবি। বিখ্যাত ফার্সী কবি। তার চমৎকার কিতাব আছে 'গুলিস্তা' নামে। সুন্দর সুন্দর আখলাক চরিত্র তাতে

শেখানো হয়েছে। এ 'গুলিস্তা'-কে বংলায় বলে পুষ্পদ্যান। চমৎকার চমৎকার কথা এ বইয়ের মধ্যে আছে। তাতে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন। তারই একটা অংশ বাংলা ভাষায় এক কবি কাব্যানুবাদ করেছেন। খুব সুন্দর।

"একদা স্নানের আগারে পসিয়া
হেরিণু মাটির ঢেলা,
হাতে নিয়ে তারে শুঁকিয়া দেখিনু
রয়েছে সুবাস মেলা।"

একদিন গোসলখানায় ঢুকলাম। ঢুকে একটা মাটির ঢেলা পেলাম। হাতে নিয়ে দেখি কী চমৎকার ঘ্রাণ! মাটির ঢেলায় ফুলের ঘ্রাণ।

"কহিনু তাহারে কস্তুরী তুমি
তুমি কি আতরদান"

আমি বললাম, তুমি কি কস্তুরী? মৃগনাভি? তুমি কি মাটির ঢেলা না মৃগনাভি? নাকি তোমাতে আতর রাখা হয়েছিল?

"তোমার গায়ে যে সুবাস মেলা
তুমি কি গুলিস্তান?"

তোমার গায়ে যে খুব সুরভি। তুমি কি গুলিস্তান? তুমি কি ফুল বাগানের অংশ?

"কহিল, ওসব কিছু আমি নাহি
আমি অতি হীন মাটি"

সে বলল, আমি ওসব কিছু নই, আমি তুচ্ছ মাটি ।

"ফুলের সহিত থাকিয়া তাহার
সুবাসে হইনু খাঁটি।"

আমি তো কেবল ফুলের সঙ্গে থেকেছিলাম। সেই ফুলের সাহচর্যে আমার মাটির গন্ধ দূর হয়ে ফুলের সুরভি আমার ভেতরে এসে গেছে। তাই আমার ভেতর এখন কেবল ফুলের সুরভি পাচ্ছ। এটা মূলত ওই হাদিছেরই সারমর্ম।

যত ভালো লোকের সাথে থাকা হবে তত তাদের সুরভি ভেতরে আসবে। আর মন্দ লোকের সঙ্গে থাকলে মন্দ খাসলত ভেতরে আসবে। বাইরে ঘোরাফেরা করলে মন্দ লোকের সাহচর্যে বেশি থাকা হয়। অধিকাংশ লোকই তো বিপথগামী। বাইরে যারা ঘোরাফেরা করছে, অফিস-আদালতে, কাজে-কর্মে বিভিন্ন জায়গাতে যাদের সঙ্গে চলাফেরা করা হয়, যাদের সাঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, এদের মধ্যে দীনদার চরিত্রবান লোক কজন? অধিকাংশই তো নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষ। কাজেই যত বাইরে যাওয়া হবে ততই ওদের সঙ্গ লাভ হবে। ফলে ওদের যা কিছু খারাবী সব আমার ভেতরে চলে আসবে।

## ঘরকে বানিয়ে নাও নিজ ভুবন

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

নিজের ঘরই যেন তোমার বিচরণের জন্য যথেষ্ট হয়।

তুমি ঘরটাকেই নিজের ভুবন বানিয়ে ফেলো, মানসিকভাবে। তোমার ঘর ছোট্ট, কিন্তু মানসিকভাবে এ ঘর হোক বিশাল জগৎ, যেখানে তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, বাবা-মা আছে, ভাই-বোন আছে। এদের নিয়ে তোমার জগৎ গড়ে উঠুক। এদের সঙ্গেই তুমি বেশি সময় কাটানোর চেষ্টা করো। বিশেষত মহিলাগণ। তাদের জন্য তো বাইরে যাওয়াটা ধ্বংসাত্মক।আল্লাহ তাআলা আদেশ করেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

নিজ গৃহে অবস্থান করো, (পর-পুরুষকে) সাজসজ্জা প্রদর্শন করে বেড়িও না, যেমন প্রাচীন জাহেলী যুগে প্রদর্শন করা হত।[১৯]

আল্লাহ তাআলার হুকুম, তোমরা নিজ ঘরে অবস্থান করো। আল্লাহ তাআলা তাকে ঘরের রানী বানিয়েছেন। তাকে সুখে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার উপরে আল্লাহ তাআলা বাইরের কোনও দায়-দায়িত্ব

১৯. সূরা আহযাব : ৩৩

চাপাননি। ইসলাম এত চমৎকার ধর্ম, নারীর আয়-রোজগারের কোনও দায়িত্বই নাই! তার যা-কিছু দরকার সে সব-কিছুর ব্যবস্থা শৈশবে করবে তার বাবা, বাবা না থাকলে ভাই বা চাচা। আর যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন করবে স্বামী। স্বামীর দায়িত্ব তাকে খাবার দেওয়া, পোশাক দেওয়া, তাকে থাকার জায়গা দেওয়া। এসব স্বামীর দায়িত্ব। তার কোনও দায়িত্ব নেই। তাহলে শুধু শুধু টাকা-পয়সা কামাই করার জন্য বাইরে ঘুরবে কেন? টাকা-পয়সা কামাইয়ের জগৎ অত্যন্ত সংগ্রামী জগৎ, হিংসার জগৎ, রেষারেষির জগৎ। ওখানে কে কাকে টপকে যাবে সেই প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতায় নারী তুমি কোমল মনের মানুষ, তুমি কেন অবতীর্ণ হবে? তুমি ঘরে শান্তির নীড়ে অবস্থান করতে থাকো।

## বাইরে যাওয়ায় নারীর ক্ষতি

বাইরে বের হলে চারদিক থেকে লোভের চোখ তোমাকে আক্রান্ত করবে। শয়তান মানুষের ভেতরে উস্কানি সৃষ্টি করবে। যত দরবেশই হোক না কেন, তুমি যদি বাইরে বের হও এক নজর তোমার দিকে তাকাবেই। এই আকর্ষণ আল্লাহ তোমার ভেতর রেখেছেন। এটা তোমার দোষ না। নারীর ভেতর যে আকর্ষণ এটা তার দোষ নয়, গুণ। যাতে করে স্বামী কেবল তার মুখীই হয়ে থাকে, অন্য দিকে না তাকায়। কিন্তু যখনই সে বাইরে চলে যায় তখন তার এই গুণটা দোষে পরিণত হয়ে যায়। তখন অন্য মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, অন্য মানুষ তাকে দেখে লোভ করে। তখন সে শয়তানের তীরের পাত্রে পরিণত হয়। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

> নারী যখনই বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে উঁকি দিয়ে তাকায়[২০]

এ শয়তান মানুষও হতে পারে। কুরআন মাজীদে জিন শয়তানের পাশাপাশি মানুষ শয়তানের কথাও বলা হয়েছে। নারী যখন বাইরে বের

---

২০. মুসনাদে বায্যার : ২০৬১; সহীহ ইবনে খুযায়মা : ১৬৮৫

হয় তখন কেবল জিন শয়তানই নয়; মানুষ শয়তানও তার দিকে চোখ মেলে তাকায়।

মানুষের চোখ তীর। এই তীর তাকে বিদ্ধ করে। নারী যখন ঘরের বাইরে বের হয় তখন সে শয়তানের তীরের শিকার হয়ে যায়। এই তীর তাকে বিদ্ধ করে, তার শরীরকে বিদ্ধ করে, তার মনকে বিদ্ধ করে। তীরের খোঁচায় তাকে জর্জরিত করে ফেলে। সত্যিকারের নারী হলে তার আত্মমর্যাদাবোধ জাগার কথা। আমি কোনও মানুষের চোখের শিকারে পরিণত হব না। যখন বের হয় তখন চারদিক থেকে চোখগুলো তীর হয়ে তাকে গ্রাস করতে থাকে। তখন সে লোভাতুর মানুষের গ্রাসে পরিণত হয়। কোনও আদর্শ নারী কেন এরকম লোভাতুর তীরের গ্রাসে পরিণত হতে যাবে?

হাঁ, যার ঠেকা আছে এবং ঠেকা মানুষের থাকতেই পারে। হয়তো এক নারী এমন, যার উপার্জন করার মতো কোনও লোক নেই, তাকে বাইরে যেতেই হয়। এমনিভাবে চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হবে। বাবা-মাকে দেখার জন্য বাইরে যেতে হবে। বাইরে যাওয়ার ঠেকা আছে। যখন ঠেকা থাকে তখন সে বের হবে পুরোপুরি পর্দার সঙ্গে, যাতে শয়তানের তীর তাকে বিদ্ধ করতে না পারে। শয়তানের তীর বলতে আমি বুঝাচ্ছি মানুষের চোখকে। মানুষের চোখ হলো শয়তানের তীর। এ তীর যেন তাকে বিদ্ধ করতে না পারে। নিজেকে পর্দার ভেতরে, বোরকার ভেতরে ঢেকে বের করবে। তার মানে যখনই সে বের হবে, পর্দার দুর্গের মধ্যে সে থাকবে, যাতে শত্রু তাকে আক্রমণ করতে না পারে। আর সেইসঙ্গে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে এ শয়তান থেকে, পড়তে থাকবে–

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

সে আল্লাহর যিক্‌র করবে– সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। যতক্ষণ বাইরে থাকবে সে আল্লাহর যিক্‌র করবে। হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিক্‌র করে সে আল্লাহর দুর্গের মধ্যে চলে যায়। আর যে যিক্‌রে না থাকে,

সে দুর্গের বাইরে থাকে। আর যতক্ষণ যিক্‌রে থাকবে ততক্ষণ দুর্গের ভেতরে থাকবে। ফলে শয়তান তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

আর বাইরে কাজ শেষ হওয়ার পরই সে পেরেশান হয়ে যাবে নিজ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে। অতিরিক্ত সময় সে কিছুতেই বাইরে কাটাবে না।

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

যদি মুক্তি পেতে চাও, তাহলে তোমার নিজ ঘরটাই যেন তোমার বিচরণের জন্য যথেষ্ট হয়। এটাই নারীর আসল জায়গা। এখানে থাকাতেই তার ইজ্জত ও সম্মানের নিরাপত্তা। এখানে থাকলে কেবল ইজ্জতই রক্ষা হবে না; স্বামী-সন্তানও তার প্রতি খুশি থাকবে এবং আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি রাজি থাকবেন। এক হাদীছে আছে–

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

সে গৃহাভ্যন্তরে থাকা অবস্থায়ই আল্লাহ তাআলার সর্বাপেক্ষা বেশি কাছে থাকে।[২১]

প্রথম কথা ছিল তুমি তোমার নিজ যবান, নিজ মুখকে নিয়ন্ত্রণ রাখো। আর দ্বিতীয় কথা, তোমার ঘোরাফেরার জন্যে তোমার ঘরটাই যেন যথেষ্ট হয়। অহেতুক বাইরে ঘোরাফেরা করো না।

## তরুণ-তরুণীদের বাইরে বেশি যাওয়া বিপদ

এক তো বললাম, ঘরের অভিভাবকদের কথা, তারা ঘরে সময় দেবে। দ্বিতীয়ত বললাম, নারীর কথা, তারা ঘরের ভেতর থাকবে। তৃতীয়ত– আমাদের যুবকরা। তরুণ-তরুণী সকলেই বহির্মুখী। তারা বুঝতে চায় না অহেতুক বাইরে ঘোরা কত ক্ষতিকর। তারা ঘরে থাকতে চায় না। বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত তাদের ছেলেমেয়ে যেন কিছুতেই অতিরিক্ত সময় বাইরে না থাকে। বিনা প্রয়োজনে কিছুতেই যেন বাইরে না যায়। বর্তমান সময়টা নানান ফিতনার সময়। কেবল বদদীনীর ফেতনাই নয়,

২১. সহীহ ইবনে হিব্বান : ৫৫৯৮

এছাড়াও নানা রকম ঝুঁকিও আছে। শুধু শুধুই মানুষ বিপদে পড়ে যায়। কয়েক বছর আগের কথা, একদিন সকালে আমাদের এক ছাত্র বাইরে বের হল। ঠিক ওই সময় গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। ওই মারামারিতে এক পক্ষের লোক আমাদের ছাত্রকে বিপক্ষের লোক মনে করে তাকে এমন মারাই মারলো যে, মাথা ফেটে গেল। তাকে হাসপাতাল নেওয়া লাগল। মাথায় সেলাই করতে হল। শুধু শুধু। সে কোনও দলেরই ছিল না। সে তো আমাদের ছাত্র। বাইরে বের হয়েছে। ব্যস, ফিতনায় পড়ে গেছে। দুই দলের মারামারির মাঝখানে পড়ে গেছে। আজকাল মানুষ মারামারি করে কথায় কথায়। শুধু শুধুই মারামারি করে। একই দলের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। আর এখন তো দল-আদর্শের জন্য নয়; স্বার্থের কারণে করে। যখনই স্বার্থে টান পড়ে তখন নিজেদের মধ্যেই মারামারি লেগে যায়। সুতরাং বাইরে যদি বের হও তাহলে অসম্ভব নয় যে, তুমি ওই মারামারির মধ্যে পড়ে যাবে। তুমি কোনও দলের লোক নও, শুধু শুধুই তোমাকে মেরে গেল। এরকম কিছুদিন আগেও তো হয়েছে। এখানে নিরীহ মানুষ, নিরীহ ছাত্র মার খেয়েছে। কাজেই বাইরে বের হলে অসম্ভব নয় যে, তোমার ছেলে নির্দোষ, নিরীহ ছেলে বাইরে বের হয়েছে, কিন্তু পরক্ষণে সংবাদ আসল যে, পথের লোক তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আর সেখান থেকে লাশ হয়ে সে ঘরে ফিরেছে। এটা কঠিন ফিতনার সময়। এখন ঘরে থাকাই নিরাপদ। এরকম সময় সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ

অচিরেই এমন ফিতনা দেখা দেবে, যখন বসে থাকা ব্যক্তি হবে দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, দাঁড়ানো ব্যক্তি হবে হেঁটে চলা ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম, হেঁটে চলা ব্যক্তি হবে দৌড়ে চলা ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি সে ফিতনার দিকে উঁকি দিয়ে দেখবে, ফিতনা তাকে জড়িয়ে ফেলবে।

সুতরাং তখন যে ব্যক্তি কোনও আশ্রয়ের জায়গা পাবে, সেখানে যেন আশ্রয় নিয়ে নেয়।[২২]

এ হাদীছে যে রকম সময়ের কথা বলা হয়েছে, বর্তমানে তাই চলছে। কাজেই এখন যত বেশি ঘরে থাকা যায় ততই ভালো। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখাও নিরাপদ নয়। ঘরেও কীভাবে থাকতে হবে, সে সম্পর্কে এক বর্ণনায় আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত হাদীছ ইরশাদ করলে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে আপনি আমাদের কী আদেশ দেন? তিনি বললেন,

كُونُوا أَحْلَاسَ بُيُوتِكُمْ

তখন তোমরা ঘরের চাটাই হয়ে থেকো।[২৩]

অর্থাৎ চাটাই যেমন মাটিতে পড়ে থাকে, তেমনি থাকবে। বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করবে না, বাইরে যাবে না। কাজেই অভিভাবকের খুব বেশি সতর্কতা দরকার। শুধু শুধু যেন তার ছেলে মেয়ে বাইরে না যায়। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর। রাত্রিবেলা বাইরে বের হতে দেওয়াটা কোন সতর্ক বাবা-মায়ের জন্যে কিছুতেই সমীচীন নয়। বাবা-মা যদি সতর্ক হয় তাহলে কিছুতেই উচিত নয় তার ছেলে-মেয়েদেরকে সন্ধ্যার পরে বাইরে রাখা। এমনিই রাতটা বখাটে ও দুর্বৃত্তদের রাজত্বের সময়। দুষ্কৃতকারীদের অপতৎপরতার সময়। এ সময় সৎ-সাধুজনের বাইরে কাটানো কিছুতেই উচিত নয়। তাহলে ওই দুর্বৃত্তের কবলে সে পড়ে যাবে। তাই অভিভাবকদের উচিত তাদের যুবক ছেলেমেয়ে কিছুতেই যেন সন্ধ্যার পরে বাইরে সময় না কাটায় সেদিকে খেয়াল রাখা।

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

তাদের বিচরণের জন্য নিজ ঘরই যেন যথেষ্ট হয়। ঘরে বিচরণের সুযোগ করে দেওয়া চাই। ঘরকে আনন্দময় করে তোলা চাই। বাবা-মা

---

২২. সহীহ বুখারী : ৩৬০১; সহীহ মুসলিম : ২৮৮৬; সুনানে আবু দাউদ : ৪২৬২; জামে' তিরমিযী : ২১৯৪; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯৬১; মুসনাদে আহমাদ : ১৪৪৬, ১৬০৯

২৩. সুনানে আবু দাউদ : ৪২৬২; মুসনাদে আহমাদ : ১৯৬৬২

ছেলে-মেয়েকে সময় দিয়ে দিয়ে ঘরকে আনন্দময় ঘর হিসেবে গড়ে তুলবে। একসঙ্গে খানা খাবে। একসঙ্গে চা খাবে। একসঙ্গে গল্প-গুজব করবে। পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি করবে। ছেলেমেয়েদের ভেতরে পড়াশোনার আগ্রহ সৃষ্টি করবে, যাতে করে ছেলেমেয়ে পড়তে মজা পায়। বই পড়তে মজা পায়। আর এই মজা যদি ভেতরে এসে যায়, ছেলেমেয়েদের ভেতরে যদি একবার বইয়ের স্বাদ এসে যায়, তাহলে সে কখনোই আর বাইরে থাকবে না। কেননা পড়াশোনার স্বাদ এক অতুলনীয় স্বাদ। এ এক মহা আনন্দের জগৎ। এই জগতে যে একবার ঢুকে যায়, তখন এর বাইরের কোনও কিছুই তাকে আকর্ষণ করতে পারে না। তাই ছেলে-মেয়েদের ভেতর পড়াশোনার আগ্রহ সৃষ্টি করে ফেলা চাই। বইয়ের ভালোবাসা, বইয়ের মুহাব্বত তাদের অন্তরের ভেতর সৃষ্টি করা চাই। যার ভেতর বইয়ের মুহাব্বত যত বেশি সৃষ্টি হবে, সে তত বাইরে সময় কম দেবে।

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

তোমার বিচরণের জন্যে তোমার নিজের ঘরই যেন যথেষ্ট হয়। এটা হল দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি লাভের দ্বিতীয় শর্ত। ইনশাআল্লাহ তৃতীয়টা সম্পর্কে আগামী মঙ্গলবার আলোচনা হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল করার তাওফীক দিন।

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





# মুক্তি যদি পেতে চাও – ৩

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد،

মুহতারাম ভাই–বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আমরা একটা হাদীছ সামনে রেখে আলোচনা করছিলাম দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ এবং আখিরাতের আযাব থেকে নাজাত লাভের উপায় সম্পর্কে। এ সম্পর্কে এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। সাহাবীর নাম হযরত উকবা ইবন আমের রাযি.। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! নাজাত লাভ করার উপায় কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি কথা বলেছিলেন। তিনটি কাজ যদি করতে পার, নাজাত পেয়ে যাবে। তিনটি কাজের দুটি সম্পর্কে গত দুই মজলিসে আলোচনা হয়েছে। তার প্রথমটি ছিল–

امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ

বাকশক্তির উপর নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখ

লাগামহীন কথা বার্তা যেন না হয়ে যায়। কী বলছ ভেবেচিন্তে বল। নিজ মুখের উপরে নিজ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। এই ছিল প্রথম, আর দ্বিতীয় বিষয় ছিল –

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ

তোমার চলাফেরার জন্যে নিজ ঘরটাই যেন যথেষ্ট হয়।

নিজ ঘরটাকেই তুমি তোমার ভুবন বানিয়ে নাও। বাইরে থাকবে কেবলই কাজে, আড্ডা মারার জন্যে না। যখনই জরুরী কাজ বাইরে শেষ হয়ে যাবে, ঘরে চলে আসবে। ঘরে এসে ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন এদের সঙ্গে সময় কাটাবে। তাদেরকে সময় দেবে। এই দুইটা বিষয় সম্পর্কে গত দুই মজলিসে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় যে কাজ করতে বলেছেন তা হচ্ছে –

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

নিজ গুনাহের জন্যে কাঁদো।

কথা সংক্ষেপ কিন্তু এর বার্তা অনেক। নিজ গুনাহের জন্যে কাঁদো। আরেকজন কী করছে না করছে তার পেছনে পড়তে বলেননি। নিজের গুনাহের জন্যে কাঁদতে বলেছেন।

## দরকার নিজের দোষ ও অন্যের গুণ দেখা

আমার নিজের দোষের চেয়ে নিজের গুণটাই বেশি দেখি। তাই নিজেকে বড় ভালো মনে হয়। মনে হয় আমি একজন ভালো মানুষ। আমি নামায পড়ি। ব্যস, যেহেতু নামায পড়ি আমি একজন বুযুর্গ। আমি একজন ভালো মানুষ। দাড়ি আছে, টুপি আছে কিংবা বোরকা পরি, পর্দায় থাকি। সুতরাং আমি অনেক ভালো। ভালো যতটুকু আছে সেই দিকে নজর দিই আর মনে করি আমি অনেক কিছু। আর এগুলি যার মধ্যে নেই তাকে ফাসেক-কাফের মনে করি।

যদি কারো অন্তরে এই ধারণা এসে যায় আমি ভালো, তবে তার উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই রোগে আমরা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। আমরা যদি কেউ দীনের কোনও কাজ করি তখন তো আর আমাকে কে পায়! আমি যদি মাদরাসায় শিক্ষকতা করি তাহলে মনে করি মাদরাসায় শিক্ষকতা করছি, কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অন্যকে শেখাচ্ছি, কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করছি, কুরআন ও হাদীছের মাসআলা মানুষকে বয়ান করছি, আমার হাতে কত আলেম তৈরি হচ্ছে, কাজেই আমার মতো আর কে আছে? এর বাইরেও যে কত কাজ রয়ে গেছে, আমি যা করছি না, সেদিকে নজর নেই। কত বেনামাযী আছে! নামাযের দাওয়াতে কতবার তাদের কাছে গিয়েছি? হয়তো ঘরের পাশেই একজন মানুষ নামায পড়ছে না। তার জন্যে আমার মন কাঁদে না। সে কাজ আরেকজন করছে। হয়তো তাবলীগ জামাতের লোক করছে। কিন্তু তার কোনও মূল্য আমার অন্তরে নেই।

তাবলীগ জামাতের ওসিলায় লক্ষ লক্ষ বেনামাযী নামাযী হয়ে গেছে। মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে। মুসল্লী বাড়ছে। সুন্নতের উপর আমল বাড়ছে। পর্দাওয়ালা নারীর সংখ্যা বাড়ছে। লক্ষ লক্ষ লোক দীনের পথে আসছে। কিন্তু সেদিকে আমার নজর নেই। আমি মনে করছি, আমি মাদরাসায় শিক্ষকতা করি, কাজেই আমার সমকক্ষ আর কে আছে? এর বিপরীতও আছে।

যারা তাবলীগ জামাতের কাজ করে, তাদের অনেকেই মনে করে আমার মতো আর কে? আমার ওসিলায় লক্ষ লক্ষ বেনামাযী নামাযী হচ্ছে, মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে, কাজেই আমার সমকক্ষ আর কে? সে আর অন্যের কাজের মূল্য দেয় না। কেউ হয়তো মাদরাসায় পড়াচ্ছে, ইমামতি করছে, তার কোনও মূল্য সে দেয় না। অথচ তাকে ছাড়া তার চলবে না। একজন লোক যদি হাজারও চিল্লা দেয়, তার সূরা ফাতিহা সহীহ হবে? কোনও দিন হবে না। সে যদি আলাদাভাবে মশক না করে, তার সূরা ফাতিহা সহীহ হবে না। সূরা ফাতিহা সহীহ না হওয়ার মানে হল তার নামাযই হচ্ছে না। আলেম ছাড়া সে কুরআন শরীফ সহীহ করে পড়তে পারবে না। মাসআলা-মাসায়েল শিখতে পারবে না।

কাজেই যদি চিল্লা দেয়ার পরে আলেমকে অবজ্ঞা করে, ইমামকে মূল্য না দেয়, তবে তার কিছুই অর্জিত হল না।

এমনিভাবে যারা তাসাওউফের চর্চা করে, পীর-মুরীদি করে, তাদের মাধ্যমে দিলের ইসলাহ হয়। আর দিল ও অন্তরের ইসলাহ যদি না হয়, তাহলে কোনও আমলেরই কোনও মূল্য নেই। তখন নামাযও সত্যিকার নামায হবে না, তালীমও সত্যিকার তালীম হবে না। মাদরাসার কাজেরও কোন মূল্য থাকবে না। কারণ ইখলাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ইখলাস ছাড়া কোনও আমল কবুল হয় না। আর ইখলাস অন্তরে আনার জন্যে হক্কানী পীর ও মুরুব্বীর কাছে যাওয়া জরুরী। এটা যদি না হয় তাহলে অহংকার এসে যায়– আমি কিছু একটা।

## চাই একে অন্যের কাজের মূল্যায়ন

সুতরাং দীনী কাজ সবাই করছে। তাবলীগওয়ালাও দীনের কাজ করছে। মাদরাসাওয়ালাও দীনের কাজ করছে। রাজপথে যারা আন্দোলন করে তাদের দ্বারাও দীনের কাজ হয়। তসলিমা নাসরীন যখন ফালতু কথা বলে বলে মানুষকে বিপথগামী করছিল, তখন যদি রাজপথের আন্দোলন না হত তাহলে তসলিমা দেশছাড়া হয় না। এখন সে দুনিয়াতেই আযাব ভোগ করছে। দেশে দেশে এখন সে ছিন্নমূলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনও জায়গায় তার মর্যাদা নাই। ভারতও তাকে মর্যাদার সাথে রাখছে না। ইউরোপে ছিল কিছুদিন। সেখানেও সে নির্যাতিত হয়ে এসেছে। আর বাংলাদেশে নিজের ঘরে তো আসতেই পারছে না। এটাতো রাজপথে আন্দোলনের ফল।

তাহলে এই সবগুলো মিলে দীনের কাজ পূর্ণাঙ্গ হয়। তাবলীগ, তালীম (তালীম বলতে মাদরাসায় যে শিক্ষা), এমনিভাবে পীর-মুরীদি, রাজপথের আন্দোলন এই সবগুলো মিলে দীনের কাজ পরিপূর্ণ হয়। কাজেই আমি একটা করছি আর মনে করছি আমিই হক আর কেউ না, এটা যে মনে করবে সে চরম বিভ্রান্ত। সে যদি অন্যকে বরদাশত না

করে, আরেকজনকে সহ্য না করে, তাহলে বুঝতে হরে সে দীনের কিছুই শেখেনি। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। নিজের গুণের দিকে তাকিয়ে গর্ব করলে চলবে না। আমার দ্বারা কী কাজ হচ্ছে না, সেটা দেখতে হবে। অনেক কিছুই হচ্ছে না। নামায পড়ছি কিন্তু সুন্নত মোতাবেক হচ্ছে না। নামায পড়ছি কিন্তু কিরাআত সহীহ নেই, ওয়াজিব আদায় হচ্ছে না। তাই ত্রুটি দেখে দেখে কাঁদা উচিত। এজন্যেই তো নামাযের শেষে ইস্তিগফার আছে। সালাম ফিরিয়েই বলে– আস্তাগফিরুল্লাহ। কেন বলে? হায় যেমন নামায হওয়ার কথা ছিল সেরকম নামায তো অমার হলো না। ওযু ছুটে যায়। ফরয গোসল ঠিকমতো আদায় হয় না। সুন্নত-মুস্তাহাবের কোনও খবর নাই। তাহলে যে কাজটা করছি তার মধ্যেই এতো ত্রুটি, নামায পড়ছি তার মধ্যেই এতো ত্রুটি, আর যেগুলো করছি না তার কী অবস্থা?

হয়তো হজ্জ ফরয হয়ে আছে কিন্তু আমার খবর নেই, যে কারণে হজ্জ করা হচ্ছে না। আমার উপর যাকাত ফরয, কিন্তু আমার খবরও নেই। হিসাব করলে দেখা যাবে যাকাত ফরয হয়ে আছে, কিন্তু যাকাত দেওয়া হয় না। এমনিভাবে কথায় কথায় মিথ্যে বলি। নামাযও পড়ি আবার মিথ্যা কথাও বলি। নামাযও পড়ে আবার মানুষকে রূঢ় কথা বলে, মনে কষ্ট দেয়, মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে। নামায পড়ে ওয়াদা রক্ষা করে না। তাহলে কেমন হল?

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করো আর সে জন্যে কাঁদো। কেবল গুণ দেখে গর্ববোধ করো না। যদি নিজের দোষ দেখ, তাহলে নিজের গুণের দিকে তাকানোর ফুরসত হবে না। এত দোষ তোমার মধ্যে আছে।

## অন্যের হক জানা ও আদায়ে অবহেলা

বউ পেটাও? তাহলে তুমি কেমন মানুষ হলে। নামাযও পড়, হজ্জ করছ, যাকাত দাও আবার বউ পেটাও। তাহলে কিসের মানুষ তুমি? প্রতিবেশীকে কষ্ট দাও, অন্যের গীবত কর, অন্যের হক নষ্ট কর। এসব

তো আমরা করছি। অনেক কিছু তো অন্যের হক। এক হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ

এক মুমিনের অপর মুমিনের কাছে ছয়টি জিনিস প্রাপ্য (হক)। সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে; তার মৃত্যু হলে সে তার জানাযায় শরীক হবে; ডাকলে বা দাওয়াত দিলে তাতে সাড়া দেবে; সাক্ষাৎ হলে সালাম দেবে; হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে এবং সে নিজ বাড়িতে থাকুক বা বাইরে থাকুক, উভয় অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে।[২৪]

অন্যের এসব হক আমরা কতটুকু রক্ষা করি? বস্তুত আমরা অন্যের হক বুঝিই না। কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া তার হক। কিন্তু আমরা কজন এটা করি? প্রতিবেশী অসুস্থ। কজন দেখতে যাই? আত্মীয় অসুস্থ। কজন দেখতে যাই? অথচ এটা তার হক। এই হক আদায় করছি না। ছোটকে স্নেহ করা, বড়কে সম্মান করা এটা হক। এক হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

সে আমাদের একজন নয়, যে আমাদের ছোটকে স্নেহ করে না ও বড়র মর্যাদা বোঝে না।[২৫]

ছোটর হক হল– বড় তাকে স্নেহ করবে। কাজেই বড় যদি তাকে স্নেহ না করে তাহলে হক নষ্ট করল। আবার বড়র হক হল, ছোট তাকে

---

২৪. জামে তিরমিযী : ২৭৩৭

২৫. জামে তিরমিযী : ১৯২০

সম্মান করবে। এখন ছোট যদি বড়কে সম্মান না করে, তাহলে তার হক নষ্ট করল। এই হক নষ্ট তো আমরা রোজ করি। বর্তমান কালে এটা খুবই বেশি। যে ছোট সে বড়কে পাত্তাই দেয় না, তার আদব-কায়দা রক্ষা করে চলে না আবার যে বড় সেও ছোটকে স্নেহের চোখে দেখে না। কত রকম গুনাহ যে আমরা করি, সেই খবরই নাই। যদি খোঁজা হয় তাহলে দেখা যাবে প্রতিদিন নেক কাজ যা করা হয় তার চেয়ে গুনাহ অনেক অনেক বেশি করি।

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

নিজের পাপের জন্য কাঁদো। নিজ পাপ যদি খোঁজা হয় তাহলে মুখে হাসি থাকবে না। এত পাপ রোজ তুমি কর। পাপের পরিণাম জাহান্নামে যাওয়া। হাস কী করে, যখন তোমার পুণ্যের চেয়ে পাপ বেশি? ওজন তো করা হবে। পাপ ও নেকী দাঁড়িপাল্লায় তোলা হবে। যদি পাপের দিক ভারী হয়ে যায়, জাহান্নামে যেতে হবে। এত হেসেখেলে বেড়াচ্ছ কিন্তু নিজের পাপের খবর নিচ্ছ না, হিসাব নিচ্ছ না। পরিণামে জাহান্নাম অপেক্ষা করছে সেই চিন্তা তোমার নাই। আর ভালো দিক দেখে দেখে গর্ববোধ করছ যে, আমি অনেক বড়, অনেক কিছু।

## আত্মসমালোচনার জরুরত

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

নিজ পাপের জন্য কাঁদো। দোষ হিসাব করো। ঘুমের আগে চিন্তা করো। আজকে সারাদিন তোমার দ্বারা কি কি পাপ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুখ দিয়েছেন। এই মুখের ব্যবহার তুমি পাপের কাজে কতটুকু করেছ হিসেব নাও।

আল্লাহ তাআলা চোখ দিয়েছেন দেখার জন্য। এই চোখের ব্যবহার নেক কাজে কতটুকু করেছ আর পাপ কাজে কতটুকু করেছ হিসাব নাও। আল্লাহ তাআলা মস্তিষ্ক দিয়েছেন চিন্তা করার জন্য। এই মস্তিষ্ককে পাপের

কাজে কতটুকু ব্যবহার করেছ আর নেকের কাজে কতটুকু ব্যবহার করেছ হিসাব নাও।

আয়-রোজগার, উপার্জন যা করো, যা খাও এর কতটুকু হালাল? কতটুকু হালাল খাও আর কতটুকু হারাম খাও, হিসাব করো। হিসাব করলে দেখা যাবে মনে করছ তুমি হালাল খাও, কিন্তু এর ভেতর দিয়ে কত যে হারাম খাচ্ছ তার খবরই নাই। হিসাব করলে ঠিকই পাবে। বিশেষ করে উত্তরাধিকার সম্পদ।

বাবা যে সম্পদ রেখে যান, মা যে সম্পদ রেখে যান, এই সম্পদ যে ভোগ করছ এর কতটুকু হালাল ভোগ করছ আর কতটুকু হারাম ভোগ করছ খুঁজে দেখো। যদি খোঁজো, মুখে হাসি থাকবে না। কারণ দেখা যাবে তোমার বাবা-চাচা তাঁর বোনদের ঠকিয়েছে। তাদের ঠকিয়ে সেই সম্পদ তারা তোমার জন্য রেখে গেছে। তার মানে ওই সম্পদে তোমার ফুফুর হক রয়ে গেল। আর এটা খাচ্ছো। হারাম খাচ্ছো।

বাবা মারা গেল, এ সম্পদ কতটুকু শরীয়তসম্মতভাবে বণ্টন করেছ খোঁজ নিয়ে দেখো। তোমরা ওখানে ফাঁকির আশ্রয় নিয়েছ কি না চিন্তা করে দেখো। চিন্তা করলে তোমাদের মুখে হাসি থাকবে না। কারণ তার পরিণাম জাহান্নাম। যে এই পেটে হারাম খাবার দেয় তার কোনও ইবাদত কবুল হয় না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

লোকে দীর্ঘ সফরে থাকে। সে আলুথালু বেশে ধুলো-ধূসরিত অবস্থায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে দু'আ করে, 'হে আমার রব্ব,' 'হে আমার রব্ব' বলে ডাকে, কিন্তু তার খাবার, পানীয় ও পোশাক হারাম উপার্জনের এবং হারাম দ্বারা সে পরিপুষ্ট। এ অবস্থায় তার দু'আ কীভাবে কবুল হবে?[২৬]

২৬. সহীহ মুসলিম : ২৩৯৩

## অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ানোর ক্ষতি

এক তো হলো আমরা নিজের দোষ না দেখে গুণ দেখি আর গর্ববোধ করি যে, আমি তো অনেক ভালো। তারপর আবার আশপাশে যারা আছে, যাদের সঙ্গে চলাফেরা হয়, এদের দোষ খুঁজে বেড়াই। এদের গুণের দিকে তাকাই না। কথা ছিল অন্যের গুণ দেখবে আর তার দোষ এড়িয়ে যাবে। আমরা করি উল্টোটা। অন্যের গুণ দেখতেই চাই না আর কার ভেতর কী দোষ আছে তাই খুঁজে বেড়াই।

কথা হচ্ছিল, নিজের দোষের জন্য কাঁদো, নিজের পাপের জন্য কাঁদো। কিন্তু নিজের পাপের জন্যে না কেঁদে অন্যের পাপ হিসাব করি। পেছনে পেছনে তাদের বদনাম করি। এর ফলেও নিজের পাপের বোঝা বাড়ছে। অন্যের দোষ না দেখে যদি গুণ দেখ তাহলে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মাবে যে, সুবহানাল্লাহ! অমুকের মধ্যে এই এই গুণ আছে। এই গুণ তো আমার মধ্যে নেই! তখন অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মাবে। কিন্তু সেটা না করে যদি অন্যের দোষ দেখা হয় আর তার গুণ দেখা না হয়, তবে অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্ম নেয়। যখন অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মায় তখন নিজের অন্তরে অহংকার জন্ম নেয়। মনে হয় আমি তো অনেক ভালো। আর এর পরিণামে পেছনে পেছনে অন্যের গীবত করা হয়, সমালোচনা করা হয়। এর ফলে নিজের পাপের বোঝা আরো বাড়ে। কথা ছিল, অন্যের দোষ যদি দেখ, তাহলে তুমি তার আয়না হয়ে যাবে।

## এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না

হাদীছে আছে, এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না।[২৭] তার মানে কী? আয়না আমরা দেখি কেন? এজন্য যে, আয়নার ভেতরে নিজের দোষ দেখা যায়। তো দোষ দেখে দেখে কী করা হয়? সেই দোষের ইসলাহ

---

২৭. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৯১৮

করা হয়। ওই আয়না আমাকে জানায় যে, তোমার ভিতরে এই এই দোষ আছে। এর সংশোধন করো। তো কথা হলো এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না হবে। তার ভিতরে যদি কোন দোষ তোমার নজরে পড়ে তাহলে তাকেই বলবে অন্য কাউকে নয়। তাকে বলবে যে ভাই, তোমার ভিতরে এ ত্রুটি দেখা গেছে, এর তো সংশোধন হওয়া দরকার। আয়না যার দোষ তাকে জানায় অন্যকে জানায় না। অন্য জায়গায় তার দোষ বলে বেড়ায় না। তুমি যদি আরেক মুমিনের আয়না হয়ে থাক, তাহলে তাকেই বলবে, অন্য কাউকে বলবে না। পেছনে বলে বেড়াবে না।

এই হাদীছের আরো সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না। আয়নার ভেতর নিজের দোষ দেখা যায়। তার মানে তুমি যদি আরেক মুমিনের দোষ দেখ, তাহলে মনে করবে এটা তোমার মধ্যেও আছে। তোমার মধ্যে আছে বলেই তার ভেতরে তুমি দেখতে পাচ্ছো। তার গুণটা আমি দেখলে দোষটা কেন দেখতে পারব না? বোঝা গেল ওই দোষটা তোমার নিজের মধ্যেই আছে। কাজেই তুমি নিজের ইসলাহ করো। এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না। আয়নার ভেতরে নিজের দোষ দেখা যায়। কাজেই অন্য মুমিনের মধ্যে যদি কোন দোষ দেখ তাহলে বুঝবে এটা তোমার নিজের মধ্যে আছে। কাজেই নিজের ইসলাহ করো।

وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের দোষের জন্যে কাঁদো। তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নাজাত যদি পেতে চাও তাহলে ওই তিনটা কাজ করো। নিজের মুখের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করো। আর বাইরে ঘোরাফেরা না করে নিজের ঘরের লোককে সময় দাও। আর তৃতীয় কাজ হলো– নিজের পাপের জন্যে কাঁদো। যদি এটা করতে পার তাহলে দুনিয়াতেও নাজাত পাবে আর আখিরাতেও নাজাত পাবে।

## পারস্পরিক কলহ-বিবাদের এক বড় কারণ

দুনিয়ায় যত ফিতনা হয় এর একটা বড় কারণ হল এই, আমরা প্রত্যেকেই অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াই। দুনিয়ায় অশান্তির এটা একটা বড় কারণ। যে যত অন্যের দোষ খুঁজবে সে তত বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। কেননা অন্যের দোষ দেখে তার চর্চা করে, এরপর তার কানে যায়। তার কানে যাওয়ার পর সে বলে, ওঃ সে কত বড় সাধু আমার জানা আছে। তখন সেও আমার বদনাম করে। আমি তার দোষ বলি, সেও আমার দোষ বলে। এর ফলে তার এবং আমার ভেতর শত্রুতা বাড়ে। এই শত্রুতা তার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এ শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে পরিবারে-পরিবারে। ব্যস এভাবে পরিবারে পরিবারে মারামারি লেগে যায়। আজকাল ভাই-ভাই, ভাই-বোনে অশান্তি, মিল নেই। নেই তো এ কারণে যে, ভাই বোনের আর বোন ভাইয়ের দোষ খুঁজে বেড়াই। আর কিছু লোক আছে অন্যের বদনাম করে। প্রতিযোগিতায় লেগে যায় কে কার কত দোষ বলতে পারে, কে কার কত দোষ প্রচার করতে পারে। ফলে পরিবারে-পরিবারে শান্তি নষ্ট হয়। এই অশান্তি থেকে যদি বাঁচতে চাও, নিজের দোষের জন্যে কাঁদো।

যত বেশি নিজের দোষের জন্যে কাঁদবে, তত বেশি পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ভাই-ভাই, ভাই-বোনে মিল তৈরি হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীছের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





# তাওবার মধ্যেই সফলতা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى: وَتُوبُوٓا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

মুহতারাম ভাই–বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আমাদের খুব বেশি বেশি তাওবায় মনোযোগ দেওয়া দরকার, যাতে নিজের গুনাহগুলো মাফ করানো যায়। গুনাহ মানুষকে জাহান্নামে নেয়। যদি গুনাহ মাফ করানো যায় তবে জাহান্নাম থেকে রেহাই পেয়ে জান্নাত লাভ করা যায়। আর এটাই প্রকৃত সফলতা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

যাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল, সে সফল হয়ে গেল।[২৮]

---

২৮. সূরা আলে ইমরান : ১৮৫

আমাদের গুনাহের তো কোনও ইয়ত্তা নেই। আমরা একেকজন কত যে গুনাহ করেছি তা প্রত্যেকে নিজের অতীতের দিকে তাকালে বুঝতে পারি। জীবনে কত রকমের গুনাহ হয়ে গেছে! হাশরের ময়দানে মানুষের নেক কাজ আর পাপ কাজ এ দুই রকমের আমলেরই ওজন করা হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে, আর যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে যাবে জাহান্নামে। যাতে করে নেকীর পাল্লা ভারী থাকে, এর জন্য প্রথমেই দরকার পাপ কম করা; পাপ নাই করা। সর্বোচ্চ চেষ্টা করা উচিত– পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য। তারপরও শয়তানের ধোঁকায় কিংবা লোভে পড়ে বিভিন্ন পাপ হয়ে যায়। যদি কখনো কোনও পাপ হয় আর তাওবা করা না হয়, তাহলে দেখা যাবে পাপের বোঝা শুধু ভারীই হচ্ছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার– পাপের বোঝা যেভাবে ভারী হয়, সাধারণত নেকের দিকটা অত বেশি ভারী হয় না। হয় না এ কারণে যে, আমরা যা নেক কাজ করি, তার ভেতর এক তো ইখলাসের অভাব। যদি ইখলাস না থাকে তাহলে কোনও নেক আমল আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। ইখলাস থাকার মানে আল্লাহর জন্য করা। যে আমলই করব, কেবলই আল্লাহকে খুশি করার জন্য করব। যদি মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে তা কবুল হয় না। তো আমরা যত আমল করি, তাতে আমাদের ইখলাস বড় কম। নামায পড়লেও মনের মধ্যে থাকে– মানুষ আমাকে নামাযী বলবে। কিংবা থাকে প্রকাশ করার ইচ্ছা। রাত্রে নামায পড়লে সকালে বলে বেড়াই– আজকে এত রাকাত তাহাজ্জুদ পড়েছি। তাই মানুষকে দেখানোর-শোনানোর ইচ্ছা যদি থাকে তবে আল্লাহর কাছে তা কবুল হয় না। তো এক সমস্যা তো এই– আমরা আমল করি, কিন্তু ইখলাস থাকে না।

দ্বিতীয়ত নানান কারণে আমল বাতিল হয়ে যায়। মানুষের নেক আমল বিভিন্ন কারণে বাতিল হয়। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে যদি কেউ বেয়াদবি করে, তাহলে আমল বাতিল হয়। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে সাবধান করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَه بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

হে মুমিনগণ! নিজের আওয়াজকে নবীর আওয়াজ থেকে উঁচু করো না এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে এমন জোরে বলো না, যেমন তোমরা একে অন্যের সাথে জোরে বলে থাক, পাছে তোমাদের কর্ম বাতিল হয়ে যায়, তোমাদের অজ্ঞাতসারে।[২৯]

নবীর সামনে বড় গলায় কথা বলো না। কারণ তা করলে আমল বাতিল হয়ে যেতে পারে। নবীর সাথে বেয়াদবি করলে যেমন আমল বাতিল হয়, ঠিক তেমনি যারা নবীর ওয়ারিছ– আলেম উলামা, তাদের সঙ্গে বেয়াদবি করলেও আমল বাতিল হওয়ার আশঙ্কা আছে। আর যে-কোনও বেয়াদবি খারাপ জিনিস। বাবা মায়ের সঙ্গে বেয়াদবি করলে আমল বাতিল হয়। মুরুব্বীদের সঙ্গে বেয়াদবি করলে আমল বাতিল হওয়ার ভয় থাকে। তো নানা কারণেই আমল বাতিল হয়ে যায়। দান-সদাকা করার পরে যদি খোঁটা দেয়, তাহলেও আমল বাতিল হয়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারেও সাবধান করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

হে মুমিনগণ! খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের সদাকাকে নষ্ট করো না।[৩০]

দান–সদাকা করার পর তোমরা খোঁটা দিয়ো না। কারণ খোঁটা দিলে আমল বাতিল হয়। আমরা তো মাঝে মধ্যেই বলি– ওর এত উপকার করলাম, কিন্তু তার কোনও দাম নেই। 'ওর এত উপকার করলাম' এটাই তো খোঁটা হয়ে গেল। আরো খারাপ কথাও বলি– ওইটা একটা

---

২৯. সূরা হুজুরাত : ২

৩০. সূরা বাকারা : ২৬৪

নিমকহারাম। ওর উপকার করি কিন্তু সে আমার ক্ষতি করে। উপকার করে সে কথা বলা, এটা হল খোঁটা দেওয়া। আর খোঁটা দিলে উপকারের ছাওয়াব বাতিল হয়ে যায়।

এক তো হল নেক আমলে আমাদের ইখলাসের কমতি আছে, তারপরে আবার নেক আমল করার পর এমন এমন কাজ করি যে কারণে নেক আমল বাতিল হয়ে যায়। অন্যদিকে আমরা গুনাহ করি কথায় কথায়। আর গুনাহ যাতে বাতিল হয়ে যায় সে চেষ্টা করি না। গুনাহ বাতিল হয় তাওবা করলে। গুনাহ করেন যাচ্ছি কিন্তু তাওবা করি না। তাওবা করলেও মুখে মুখে তাওবা করি। তাওবার শর্ত পূরণ করি না। কাজেই গুনাহ ভারী হচ্ছে। পাপের বোঝা ভারী হচ্ছে। আর এভাবে যদি পাপের বোঝা ভারী হয়, তাহলে তো জাহান্নাম ছাড়া গতি নেই। জাহান্নাম তো কোনও তামাশার ব্যাপার নয়। জাহান্নাম কঠিন ব্যাপার। আগুনে যদি কোনও কিছু পোড়ানো হয়, তাহলে তার কী দশা হয়? জ্যান্ত কোনও একটা পোকা যদি আগুনে ছেড়ে দেয়া হয়, সে পোকার কী দশা হয়? কোনও একটা পশু যদি আগুনে পুড়ে যায়, তাহলে সে পশুর কী দশা হয়? অনেক সময় মানুষের গায়ে আগুন লেগে যায়, তখন তার কী অবস্থা হয়? জাহান্নাম তো আগুন। সে আগুনে ফেলে পোড়ানো হবে। এ তো খুব সহজ জিনিস না। এর থেকে তো বাঁচতে হবে। যে বাঁচবে সেই সফল। আর বাঁচার উপায় হল তাওবা করা। তাওবা করলেই জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে এবং জীবন সফল হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتُوبُوٓا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! তাওবা করো, যাতে সফলকাম হয়ে যাও।[৩১]

তাওবা করলেই গুনাহ মাফ হবে। যদি কোনও পাপ মহাপাপ হয়ে যায়, কবীরা গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে তাওবা ছাড়া তো মাফ হয় না। সুতরাং বেশি বেশি তাওবা করতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে তাওবা করতে হবে।

---

৩১. সূরা নূর : ৩১

তাওবা করা মানে মনে মনে অনুতপ্ত হওয়া যে, আমি এটা কী করে ফেললাম। কোনও একটা পাপ করেছি, মিথ্যা কথা বলেছি, পরে অনুতপ্ত হওয়া– হায়! আমি মিথ্যা কথা বললাম! এটা কী কাজ করলাম আমি! আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত। আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয়ে গেল। অথচ এটা এমন কাজ, যা কোনও ভদ্র লোকের সাজে না। আমি কতই না মন্দ যে, আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের হয়ে গেল! এভাবে অনুতপ্ত হওয়া চাই। চরমভাবে অনুতপ্ত হওয়া। নিজেকে ধিক্কার দেওয়া। লজ্জিত হওয়া। নিজেকে ছোট মনে করা। তো এক নম্বরের শর্ত– লজ্জা ও অনুতাপ মনের মধ্যে জাগানো।

আর দ্বিতীয় হল এ গুনাহটা ছেড়ে দেওয়া। করছি তো করছি, এমন না। গুনাহ থেকে নিজে দূরে সরে আসব। আর তৃতীয় হল ভবিষ্যতে আর গুনাহ না করার সংকল্প করা। সংকল্প করব– ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর কখনো করব না। যে গুনাহ হয়ে গেছে সে গুনাহের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া। গুনাহের কাজটাকে ছেড়ে দেওয়া। ভবিষ্যতে আর গুনাহের কাজ না করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হওয়া। এ তিনটা শর্ত পূরণ করলে তখন হয় তাওবা। আর এ তাওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ বলেন–

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

এবং তিনিই নিজ বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা-কিছু কর তা তিনি জানেন।[৩২]

বান্দা খাঁটি মনে যদি তাওবা করে, তাহলে যত কঠিন পাপ হোক, আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করেন। তবে হাঁ, খাঁটি তাওবা করতে হবে। উল্লিখিত তিন শর্তের সাথে তাওবা করতে হবে। আল্লাহ বলেন–

---

৩২. সূরা শূরা : ২৫

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মুমিনগণ! আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করো।[৩৩]

খাঁটি তাওবা করলে জগতে এমন কোনও কঠিন পাপ নেই, যে পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না। বান্দার পক্ষে এমন কোনও পাপ করাই সম্ভব নয়, যে পাপ আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন না। তবে শর্ত– খাঁটি তাওবা হতে হবে। আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ বললেই তাওবা কবুল হয় না। মনের মধ্যে অনুতাপ থাকতে হবে। গুনাহ আর করব না সে সংকল্প থাকতে হবে। এ রকমের খাঁটিমনে তাওবা যদি কেউ করে, তাহলে যত কঠিন পাপ হোক, হতাশার কোনও কারণ নেই। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। আল্লাহ হতাশ হতে নিষেধ করেছেন।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজ সত্তার উপর সীমালংঘন করেছে, তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।[৩৪]

কেন নিরাশ হব না? কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩৫]

আল্লাহ কত ক্ষমাশীল যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন। যদি খাঁটি মনে তাওবা করতে পার, তবে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমা করে খুশি হন। বান্দা যদি তাওবা করে তাহলে

---

৩৩. সূরা তাহরীম : ৮

৩৪. সূরা যুমার : ৫৩

৩৫. সূরা যুমার : ৫৩

আল্লাহ খুশি হন। তাওবা না করলে নারাজ হন। মানুষের বিপরীত। আল্লাহর কাছে যতই ক্ষমা চাওয়া হয় ততই তিনি খুশি হন, আর মানুষ হয় বিরক্ত। আল্লাহ কত খুশি হন? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম একটা উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়েছেন।

এক লোক মরুভূমির পথ দিয়ে চলছে। উটের পিঠে সফর করছে। মরুভূমি যারা দেখেনি তারা বুঝতে পারবে না মরুভূমি কী জিনিস। মাইলের পর মাইল, শত শত মাইল কেবল বালু আর বালু। কিচ্ছু নেই। কোনও মানুষ নেই। কোনও প্রাণী নেই। গাছপালা নেই। শুধু বালু আর বালু। কিচ্ছু দেখা যায় না। সাগরের মতো মনে হয়। সাগরের পানি যেমন ঢেউ খেলে, মরুভূমির বালুর উপর যখন সূর্যের আলো পড়ে, ওই বালু চিকচিক করে। আর মাঝে মাঝে বাতাস বয়। তাতে বালু ওড়ে। মনে হয় যেন মরুভূমির ভেতর পানির ঢেউ। কোনও কিছু দেখা যায় না। কোনও কিনারা নেই। ওই মরুভূমির উপর দিয়ে উটের পিঠে চলতে হয়। এখন তো মরুভূমিতে রাস্তাঘাট হয়েছে। সেকালে তো রাস্তাঘাট ছিল না। কাজেই উট ছাড়া মরুভূমি পাড়ি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। তো এক ব্যক্তি উটের পিঠে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছে। মরুভূমিতে মাঝেমধ্যে দূরে দূরে ঝোপ থাকে। হালকা কিছু গাছপালা। এটাকে বলে মরুদ্যান। কিছু গাছপালার ঝোপ। যখন বৃষ্টি হয়, সে বৃষ্টির পানিতে গাছপালা জন্মায়। মরুভূমির গাছ আবার সহজে মরেও না। শেকড় অনেক গভীরে চলে যায়। মাটির অনেক নিচ থেকে শেকড় দিয়ে রস শুষে নেয়। ফলে খুব সহজে মরে না। তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এক ব্যক্তি উটের পিঠে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিল। পাড়ি দিতে দিতে হঠাৎ করে তার ক্লান্তি আসল। সে ওই রকম একটা গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য নামল। গাছের ছায়ায় সে বিশ্রাম নিচ্ছিল আর উটটাকে কাছে রেখে দিয়েছিল। তার চোখ লেগে আসল। যখন তার চোখ খুলল, দেখল উটটা তার কাছে নেই। উটের পিঠে তার সবকিছু। তার খাবার, তার পানি সবই এই উটের পিঠে। এখন তার কাছে পানিও নেই, খাবারও নেই। আবার সে মরুভূমি পাড়ি দেবে সে উপায় নেই। এখন সে কী করবে? মৃত্যু ছাড়া তো কোনও গতি নেই।

কোন দিকে যাবে? কোথায় সে যাবে? এ মরুভূমির ভেতর দিয়ে কতদূর যাওয়া সম্ভব? কতক্ষণ সে না খেয়ে থাকবে? আবার পানি ছাড়া সে কতক্ষণ বাঁচতে পারবে? সে হতাশ হয়ে গেছে। সে মনে করল– আমার মৃত্যু অবধারিত। এ মরুভূমিতে এখন না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। হতাশ হয়ে সে আবার গাছের নিচে শুয়ে পড়ল। আবার তার চোখ লেগে গেল। সে তো এ হতাশার সঙ্গে এখানে শুয়েছে যে, সে আর বাঁচবে না; সে মরবে। তার বাঁচার কোনও উপায় নেই। ক্লান্ত শরীরে সে ঘুমিয়ে গেছে।

ঘুমের ভেতরই একটা আওয়াজ হল। আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে চোখ মেলে তাকিয়েছে। তাকিয়ে দেখে– উটটা তার কাছে দাঁড়ানো। যেন মৃত্যুর হাত থেকে সে বেঁচে গেল। খুশিতে চিৎকার করে বলেছে– আল্লাহ! আমি তোমার মালিক, তুমি আমার গোলাম। যখন বেশি খুশি হয়ে যায়, তখন মানুষের মুখ দিয়ে উল্টাপাল্টা কথা বের হয়। মানুষের মুখ দিয়ে দুই অবস্থায় উল্টাপাল্টা কথা বের হয়। যখন খুব খুশি থাকে তখন উল্টাপাল্টা কথা বলে। আর যখন বেশি রাগ হয়ে যায়, তখনও তার কোনও তাল ঠিক থাকে না। যা মনে চায় তাই মুখ থেকে বের হয়। যা মনে চায় তাই বলে। কী বলেছে এ হুশই তার থাকে না।

তো এ লোক এত খুশি হয়েছে যে, কী বলছে তার হুশ নেই। আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলছে– আল্লাহ আমি তোমার মালিক, তুমি আমার গোলাম। আসলে সে বলতে চেয়েছিল– আল্লাহ তুমি মালিক, আমি গোলাম। তুমি মালিক বলেই এ গোলামকে ধ্বংস করনি। তুমি তো দয়ালু মালিক। এজন্য তুমি তোমার গোলামকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। সে কৃতজ্ঞতা জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু অতি খুশির কারণে কথা গেল উল্টে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এ লোকটা যে পরিমাণ খুশি হয়েছে, হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে পেয়ে ওই লোকটা যে পরিমাণ খুশি হয়েছে, বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তাআলা আরো বেশি খুশি হন।[৩৬]

---

৩৬. সহীহ মুসলিম : ২৭৪৭

বান্দা যখন তাওবা করে তখন যেন আল্লাহর হারানো উট আল্লাহর কাছে ফিরে আসল। বান্দা গুনাহ করে আল্লাহর থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহর থেকে সে হারিয়ে যায়। পথহারা হয়ে যায়। যেন আল্লাহর এ গোলামটা পালিয়ে গেল। আল্লাহর এ বান্দা গুনাহ করে যেন পালিয়ে গেল, যেমন ওই উটটা ওই লোকের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। এরপরে যখন বান্দা তাওবা করে, তখন যেন বান্দা আবার তার মালিকের কাছে ফিরে আসল। ওই উট যেমন মালিকের কাছে ফিরে এসেছে, তেমনি বান্দাও যেন আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছে। ওই ব্যক্তি তার উটকে যত আদর করে, যত ভালোবাসে, আল্লাহ তো তাঁর বান্দাকে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি ভালোবাসেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কত ভালোবাসেন? এর কোনও মাপঝোক নেই। তার কোনও পরিমাপ নেই। এমন কোনও যন্ত্র নেই যা দিয়ে মাপা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কত ভালোবাসেন। বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা অসীম। ওই লোকটা উট ফিরে পেলে কী আর খুশি হয়? বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহর এর থেকে শত কোটি গুণ বেশি খুশি হন। কোনও তুলনাই চলে না যে, আল্লাহ তাআলা কত খুশি হন। আল্লাহ চান বান্দা তাঁর কাছে ফিরে আসুক।

صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

হে বান্দা! তুমি যদি শতবারও তাওবা ভেঙ্গে ফেল তবুও বলি– আবার ফিরে এসো। ফিরে এসো।

আল্লাহ ডাকেন– তুমি ফিরে এসো। বান্দা তুমি আমার কাছে ফিরে এসো। কত দয়ালু আল্লাহ! আল্লাহ শেষ রাতে বান্দাকে ডাকেন–

هل من مستغفرٍ فأغفرَ له

আছে কেউ ক্ষমা চাওয়ার? আমি তাকে ক্ষমা করব।[৩৭]

ক্ষমা চাইবে এমন কে আছ? ক্ষমা চাও। আমি তোমায় ক্ষমা করে দেব। আল্লাহ অপেক্ষায় থাকেন। অপেক্ষায় থাকেন মহান আল্লাহ– বান্দা কখন তাওবা করবে আর তিনি ক্ষমা করবেন। বান্দা তো তাওবার জন্য

---

৩৭. ইবনু আবী আসেম, আস্‌সুন্নাহ : ৪৯৮

অপেক্ষা করে। ষাট বছর বয়স হোক, তখন তাওবা করব। সত্তর বছর বয়স হোক, তখন তাওবা করব। সে অপেক্ষা করে বয়সের। বান্দা তাওবার জন্য অপেক্ষা করে। আর আল্লাহ ক্ষমার জন্য অপেক্ষা করেন, কখন বান্দা তাওবা করবে আর তিনি ক্ষমা করবেন।

যারা অপেক্ষায় থাকে যে ষাট বছর বয়সে, সত্তর বছর বয়সে যেয়ে তাওবা করব, তাদের ভাগ্যে তাওবা নাও জুটতে পারে। এজন্য আল্লাহ উৎসাহ দেন যে খুব তাড়াতাড়ি তাওবা করো।

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আল্লাহ অবশ্যই সেইসব লোকের তাওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত কোনও গুনাহ করে ফেলে, তারপর জলদি তাওবা করে নেয়। সুতরাং আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।[৩৮]

আল্লাহ ওই সমস্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন, যারা অজ্ঞতাবশত ভুলে শয়তানের ধোঁকায় পাপ করে ফেলে, এরপরে খুব তাড়াতাড়ি তাওবা করে। ওই যে যারা অপেক্ষা করে, তারপর যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে–

اِنِّيْ تُبْتُ الْـٰٔنَ

এখন আমি তাওবা করলাম।

আল্লাহ বলেন– ওদের তাওবা কবুল হবার সম্ভাবনা বড় কম।

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

তাওবা কবুল তাদের প্রাপ্য নয়, যারা অসৎকর্ম করতে থাকে, পরিশেষে তাদের কারো যখন মৃত্যুক্ষণ এসে পড়ে...।[৩৯]

---

৩৮. সূরা নিসা : ১৭

৩৯. সূরা নিসা : ১৮

তাওবা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা তাদেরই বেশি, যারা গুনাহ হওয়ার পরে আর দেরি করে না; খুব তাড়াতাড়ি তাওবা করে ফেলে। তো আল্লাহ অপেক্ষা করেন বান্দা কখন তাওবা করবে, তা সে যত বড় পাপই হোক, যত কঠিন পাপ হোক। শিরকের চেয়ে বড় পাপ আর কী আছে? আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা কঠিন পাপ। মানুষকে হত্যা করা কঠিন পাপ। তাও খাঁটি তাওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

ওই ঘটনা তো আমরা জানি। এক লোক নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছিল। হত্যা করার পর এখন তার অনুশোচনা জাগল, আহ! আমি এত বড় পাপী, নিরানব্বই জন লোককে খুন করেছি! কত কঠিন পাপী আমি! তার ভেতর অনুশোচনা জাগল। তখন সে তাওবা করার জন্য এক সন্ন্যাসীর কাছে গেল। গিয়ে বলল, আমি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করেছি, আমার ভাগ্যে কী তাওবা আছে? আমার তাওবা কি কবুল হবে? ওই সন্ন্যাসী তো জাহেল, তার ইলম ছিল না। মঠে-আশ্রমে যেসব সন্ন্যাসী থাকে, এদের ইলম-কালাম থাকে না। পড়াশোনা করে না। জাহেল। কেবল ইবাদতই করেছে, শেখেনি কিছু। আল্লাহ যে কত বড় দয়ালু, তাঁর রহমত যে কত অসীম সে খবর তার নেই।

কাজেই সে বলল, তুমি নিরাননব্বই জন লোককে খুন করেছ, কত কঠিন পাপী তুমি, তোমার আবার কী তাওবা? ভাগো এখান থেকে। সে তাকে হতাশ করে দিল। কোনও বান্দাকে হতাশ করে দেওয়া কোনও আলেমের কাজ হতে পারে না। ও যেহেতু আলেম ছিল না তাই তাকে হতাশ করেছে। তো যখনই সে তাকে হতাশ করল, তখন সে বলল, আমার যদি তাওবা কবুল না হয়, আমার যদি মরে দোজখেই যাওয়া লাগে, তোকে আর জীবিত রেখে কী লাভ! ব্যস, তোকেও খতম করে দিই। এই বলে ওই সন্ন্যাসীকেও সে খুন করল। এভাবে একশর কোঠা পূর্ণ করে ফেলল।

কিন্তু অনুশোচনা তো তার মনে জেগেছিল। অনুতাপ জেগেছিল। তাই শেষ খুন করার পরে আবারও সে ভাবল– মরলে তো আমার দোজখে যাওয়া লাগবে। কাজেই কী উপায়? সে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল–

কোনও জ্ঞানী আলেম আছে, যার কাছে গেলে আমি রাস্তা পাব? একজনকে মানুষ দেখিয়ে দিল, অমুক জায়গায় একজন আলেম বুযুর্গ আছেন তার কাছে যাও। তার কাছে গেল। তার কাছে গিয়ে বলল, আমার এই এই অবস্থা। আমি নিরানব্বই জন লোককে খুন করেছিলাম। তারপরে এক দরবেশের কাছে গিয়েছিলাম। সে দরবেশ আমাকে হতাশ করেছিল, আমি তাকেও খুন করেছি। এভাবে আমি সর্বমোট একশ জন লোককে হত্যা করেছি। আমার ভাগ্যে কী কোন সুযোগ আছে যে– আল্লাহ আমার পাপ মাফ করবেন। আমার তাওবা কবুল করবেন। তখন ওই আলেম বলল,

وَ مَن يَحُوْلُ بَيْنَه وَ بَيْنَ تَوْبَتِه

এমন কে আছে, যে বান্দা এবং আল্লাহর মাঝে তাওবা কবুলে বাধা সৃষ্টি করতে পারে? তুমি হতাশ হয়ো না। যত বড় পাপীই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করেন। তুমি খাঁটি মনে তাওবা করো। আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তবে তুমি যে এলাকায় থাক সে এলাকাটা খুব ভালো এলাকা নয়। ওই এলাকার মানুষ পাপী। তুমি যদি এ পরিবেশ না পাল্টাও তাহলে আবারো পাপ করে বসবে। তোমার জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য তোমার উচিত ভালো লোকের সোহবতে যাওয়া, ভালো লোকের সাহচর্যে যাওয়া। কাজেই অমুক গ্রামের লোকজন খুব ভালো। তারা নেককার। তারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে। আল্লাহর হুকুমমতো জীবনযাপন করে। তুমি তাদের কাছে যাও। তাদের সংস্পর্শে যদি থাক তাহলে পাপের প্রবণতা, মানুষকে খুন করার যে ইচ্ছা, এটা তোমার মধ্য থেকে দূর হয়ে যাবে। তুমি নিজেকে সংশোধন করার সুযোগ পাবে।

ওই লোক গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হল। কতদূর যেতেই তার আয়ু ফুরিয়ে গেল। এই লোক তো একশজন লোককে খুন করেছে। এখন তার জান কবজ করবে কে? পাপীদের জান কবজ যারা করেন সেই ফিরিশতারা, নাকি নেককারদের জান কবজ যারা করে সেই ফিরিশতারা?

আজরাঈল আলাইহিস সালাম তো সবার নেতা। তার অধীনে কাজ করে এমন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ফিরিশতা। যারা জান কবজ করে, সে

ফিরিশতাদের নেতা আজরাঈল আলাইহিস সালাম। আর তার অধীনে লক্ষ কোটি ফিরিশতা কাজ করে। সে ফিরিশতাদের মধ্যে দুই ভাগ আছে। একভাগ ফিরিশতা যারা নেককারদের জান কবজ করে, আরেক ভাগ ফিরিশতা যারা পাপীদের জান কবজ করে। দুই দল ফিরিশতা সেখানে হাজির। নেককারদের ফিরিশতারা বলল, এ তো তাওবা করেছে, আমরা তার জান কবজ করব। আর যারা পাপীদের জান কবজ করে তারা বলল, না, এ একশজন লোকলে খুন করেছে। বড় পাপী সে। আমরা তার জান কবজ করব। ফিরিশতাদের মধ্যে এখন বিরোধ লেগে গেল। শেষে আল্লাহ তাআলা মীমাংসা করার জন্য আরেক ফিরিশতা পাঠিয়ে দিলেন।

সে ফিরিশতা এসে বলল, কী ব্যাপার? তোমাদের মধ্যে কী নিয়ে তর্ক? তারা তার কাছে ঘটনা বিবৃত করল। সে ফিরিশতা বলল, একটা কাজ করো। এ লোকটা যে মহল্লা থেকে এসেছে সেখান থেকে এ জায়গার দূরত্ব মাপো। আবার এই জায়গা থেকে সে যে জায়গায় যেতে চেয়েছিল সেই জায়গা কত দূর তাও মাপো। এ দুই জায়গার মধ্যে যে জায়গা বেশি কাছে হয়, একে সেই দিকের লোক ধরা হবে। সে যাচ্ছিল নেককারদের দিকে। যদি এ দিকের পথ কম হয়, তাহলে তাকে নেককারদের লোক ধরা হবে। আর যদি তার নিজের গ্রামের পথ বেশি কাছে হয়, তাহলে তাকে পাপীদের একজন ধরা হবে। ব্যস, সে হিসেবেই তার জান কবজ হবে।

তো ঘটনাক্রমে সে যেদিকে যাচ্ছিল সেই দিকের পথই বেশি ছিল, আর যে গ্রাম থেকে এসেছে সেই দিকের পথ কম। যেহেতু সে খাঁটি মনে তাওবা করেছে, তাই আল্লাহ তাআলা তাকে নেককারদের একজন ধরেছেন। ঐদিকের মাটিকে বললেন– হে মাটি! তুমি সংকুচিত হয়ে যাও। খাটো হয়ে যাও। আর এদিকের মাটিকে বললেন, হে মাটি! তুমি ছড়িয়ে পড়ো। প্রসারিত হও। দীর্ঘ হয়ে যাও। ফলে ওই দিকের মাটি কমে গেল, আর এদিকের পথ বেড়ে গেল। ওইদিকের পথ যখন কমে গেছে, তখন সে নেককারদের কাছাকাছি হয়ে গেছে। এখন সে নেককারদের একজন। সে হিসেবে নেককারদের জান যারা কবজ

করে, তারা তার জান কবজ করল। আর তার রূহ নিয়ে 'ইল্লিয়্যীন' এ চলে গেল।[৪০] 'ইল্লিয়্যীন' জান্নাতের একটা জায়গা, যেখানে নেককারদের রূহ রাখা হয়।

মানুষ যত বড় পাপই করুক না কেন, যদি খাঁটি মনে কেউ তাওবা করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার তাওবা কবুল করেন। তো আমরাও সারা জীবন অনেক পাপ করেছি। প্রত্যেকেই জানি কত পাপ করেছি। মিথ্যা কথা বলেছি। অন্যকে ঠকিয়েছি। অন্যকে ধোঁকা দিয়েছি। মালে ভেজাল মিশিয়েছি। ওজনে কম দিয়েছি। মুরুব্বীদের সাথে বেয়াদবি করেছি। অন্যদের উপরে, গরীব লোকদের উপরে জুলুম করেছি। তাদের পাওনা কম দিয়েছি। মানুষের সাথে রূঢ় কথা বলেছি। পেছনে পেছনে অন্যের গীবত করেছি। মুখে অশ্লীল কথা উচ্চারণ করেছি। মানুষ মনে কষ্ট পায় এমন শব্দ উচ্চারণ করেছি। ছোটকে স্নেহ করিনি, স্নেহ করা তার পাওনা ছিল। রাস্তায় এমন জিনিস ফেলেছি যাতে মানুষ কষ্ট পায়। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে মানুষকে কষ্ট দিয়েছি। প্রতিবেশীর হক আদায় করিনি। হিসাব করলে শত শত হাজার হাজার গুনাহ বের হয়ে যাবে, যা আমরা প্রত্যেকে রোজ করে থাকি।

প্রত্যেকদিন হাজার হাজার গুনাহ করি। আর আল্লাহ তাআলাই জানেন, আমাদের একেকজনের আমলনামায় কত পাপ জমা হয়েছে। ওই পাপ তো মোছানো দরকার। আমলনামা থেকে এ পাপ মোছানো দরকার। যদি মোছাতে না পারি, আমলনামায় যদি এসমস্ত জিনিস লেখা থাকে, তাহলে কী দশাই না হবে! যখন আমলনামা ওজন করা হবে, তখন তো পাপ ভারী হয়ে যাবে। তখন তো দুর্গতির সীমা থাকবে না। আমাদের সময় আর নেই। কার কখন মরণ এসে যাবে, কে কখন মরব কেউ জানি না। যেকোনও সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে। হতে পারে এ রোযাই শেষ রোযা। আর হয়তো রোযা রাখার সুযোগ পাব না। কাজেই এখনই তাওবা করি। খাঁটি মনে তাওবা করি। বার বার বলি, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

---

৪০. সহীহ বুখারী : ৩৪৭০; সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৪০

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوْبُ اِلَيْهِ

আমি আমার রব্বের কাছে, আমার আল্লাহর কাছে আমার সমস্ত গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই। তাঁর কাছে আমি তাওবা করছি।

কেবল 'আসতাগফিরুল্লাহ' 'আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই' বললেও হবে। প্রতি নামাজের পরে তিনবার পড়ার কথা আছে। প্রত্যেক ফরয নামাজের পর তিনবার বলা– আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। বিশেষ করে রমাযানের এই শেষ দিনগুলোতে বেশি বেশি বলা। বেশি বেশি ইসতিগফার পড়া। বেশি বেশি তাওবা করা। আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমার তাওবা তুমি কবুল করো।

اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيَّ وَاغْفِرْ لِي

হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবুল করো।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ কর। আমি তো বড় পাপী। আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার পাপ ক্ষমা করে দাও।[৪১]

বেশি বেশি তাওবা করা। যারা আরবী জানি আরবীতে বলব। আর যারা আরবী জানি না, বাংলাতেই বলব। আল্লাহ তো সব ভাষাই বোঝেন। সব ভাষা আল্লাহর দান। সব ভাষা আল্লাহর সৃষ্টি। যেকোনও ভাষাতেই তাওবা করি না কেন, আল্লাহ সবই বোঝেন। কাজেই আরবী বলতে না পারি, বাংলায় বলি। আরবী পৃথিবীর সবচে' ভালো ভাষা। সবচে' মূল্যবান ভাষা। আল্লাহ সবচে' বেশি পছন্দ করেন আরবী ভাষা। কাজেই আরবী যারা বলতে পারি, আরবীতেই বলি।

সায়্যিদুল ইসতিগফার যাদের মুখস্থ আছে ভালো। তারা এটা পড়বেন।

---

৪১. জামে' তিরমিযী : ৫১৩

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

হে আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই। আপনি আমার স্রষ্টা আর আমি আপনার দাস। আমি আমার সাধ্যমতো আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর অটল আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই। আমার উপর আপনার নিআমত স্বীকার করছি। আমার গুনাহও স্বীকার করে নিচ্ছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া ক্ষমা করার যে আর কেউ নেই।

এটাকে বলে সায়্যিদুল ইসতিগফার। যাদের মুখস্থ নেই, কোনও সমস্যা নেই। হতাশার কোনও কারণই নেই। আল্লাহ সব ভাষা বোঝেন। মনের অবস্থা বোঝেন। আমার মনে কী আছে না আছে সব আল্লাহ জানেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

তিনি (আল্লাহ) জানেন চোখের অসাধুতা এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে।[৪২]

কার মনের মধ্যে কী আছে সব আল্লাহ জানেন। আমি যদি সত্যি লজ্জিত হয়ে থাকি, সত্যি যদি অনুতপ্ত হয়ে থাকি, আল্লাহ তাআলা তা জানেন। আল্লাহ মন দেখেন। কাজেই অনুতাপের সঙ্গে, লজ্জার সাথে আমি বাংলাতেই বলি– হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। শত শত বার বলি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন একশ' বার তাওবা করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনও পাপ ছিল না। তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। মা'সূম ছিলেন। তারপরও তিনি

৪২. সূরা মুমিন : ১৯

রোজ একশত বার তাওবা করতেন। আর আমরা তো রোজ একশ বার পাপ করি। কিংবা বেশিও করি। তাহলে আমাদের কত বেশি তাওবা করা উচিত? রমাযানের এ শেষ দিনগুলোতে আমরা বেশি বেশি তাওবা করব। রোজ শত শত বার বলব– আসতাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ! আমায় ক্ষমা করো। ক্ষমা না করলে আমার কী অবস্থা হবে? কী গতি হবে? আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি ক্ষমা করো। বারবার বলতে থাকি। শত শত বার হাজার হাজার বার বলতে থাকি। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# ইখলাসের সঙ্গে আমল করার আবশ্যিকতা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد،

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

> বলে দাও, আমি তো তোমাদের মতো একজন মানুষই। (তবে) আমার প্রতি এই ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ কেবল একই মাবুদ। সুতরাং যে-কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।[৪৩]

---

৪৩. সূরা কাহফ : ১১০

মুহতারাম ভাই–বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

মৌলিকভাবে আমাদের জন্য দুনিয়া নয়। আমাদের জন্য হল আখিরাত। মুমিনদের কামনার বস্তু হবে কেবলই আখিরাত। নিজের জীবনের সব কাজ-কর্ম সে দুনিয়ার জন্য করবে না। দুনিয়ার প্রতি সে মন লাগাবে না। দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবল হবে ওইরকম– যেমন এক পথিক পথ চলছে, রোদের ভেতর তার ক্লান্তি লাগছে। ক্লান্তি দূর করার জন্য একটা গাছের ছায়ায় বসল। গাছের ছায়ায় যখন সে বিশ্রাম নেয় তখন সে এ কথা মনে করে না যে, এ ছায়াটা আমার বাড়ি, এ গাছটা আমার ঠিকানা। কেবল কিছুক্ষণের জন্য সে এখানে আরাম করে, বিশ্রাম করে। এরপর আবার সে উঠে চলে যায়। এ গাছের ছায়ার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকে না। দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এ রকমেরই। এটা আমাদের আসল ঠিকানা নয়। আমাদের আসল ঠিকানা হল আখিরাত, জান্নাত। আমাদের সমস্ত চেষ্টা হবে সে জান্নাত পাওয়ার জন্য। আমরা যা-কিছু কাজকর্ম করি, সব কিছুর পেছনেই মূল উদ্দেশ্য থাকবে এই যে, কী করে আমি মৃত্যুর পর জান্নাত পেতে পারি।

জান্নাত পাওয়ার জন্য কর্তব্য হল শরীয়ত মোতাবেক চলা। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ায় আমাদের যেভাবে চলতে বলেছেন, সেভাবে চলা। আর সমস্ত কাজ-কর্মে এ নিয়ত রাখা যে, আল্লাহ তাআলা যেন খুশি হন। সমস্ত কাজকর্ম করা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য। আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য কাজকর্ম করার নাম হল ইখলাস। সহীহ নিয়ত। আমি যখন যে কাজ করব, তাতে নিয়ত থাকবে এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার উপর খুশি হন। এ নিয়তে কাজ করাকে বলে ইখলাস। যে-কোনও আমল যদি ইখলাসের সঙ্গে করা হয়, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য করা হয়, তখন সে কাজে ছাওয়াব পাওয়া যায়। যদি আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার নিয়ত না থাকে, তাহলে যত ভালো আমলই হোক, তাতে ছাওয়াব পাওয়া যাবে না।

মানুষ খুশি হবে, আমার সুনাম হবে– এজন্য যদি আমল করে তাহলে এটাকে বলে রিয়া। আল্লাহ তাআলার জন্য করাকে বলে ইখলাস। আর

মানুষকে দেখানোর জন্য করাকে বলে রিয়া। রিয়া থেকে বাঁচতে হবে। অন্তরে ইখলাস পয়দা করতে হবে। এ সম্পর্কে একটা প্রসিদ্ধ হাদীছ আমরা সবাই জানি, বুখারী শরীফের প্রথম হাদীছ, মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীছ, রিয়াযুস সালিহীনেও এটা প্রথম হাদীছ।

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

নিয়ত য়দি সহীহ হয়, নিয়ত যদি হয় আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা, অর্থাৎ মনে যদি ইখলাস থাকে, তাহলে আমলে ছাওয়াব পাওয়া যাবে। আর মনে যদি ইখলাস না থাকে, তাহলে সে আমলের ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। এ হাদীছ সবাই আমরা জানি। যার জানা নেই, তার এ হাদীছ মুখস্থ করে ফেলা উচিত। অন্তরের মধ্যে প্রত্যেকের এ হাদীছ লিখে ফেলা উচিত।

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

তিনটা শব্দ। সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। খুব সহজ হাদীছ। আমরা সবাই জানি, কিন্তু এ হাদীছের উপর আমল বড় কম। সবচে' প্রসিদ্ধ হাদীছ, কিন্তু এ হাদীছের উপর আমল খুবই কম। আমরা যখন যে আমল করি তাতে নিয়ত থাকে মানুষকে খুশি করা, মানুষকে দেখানো। দুনিয়ায় কিছু পাওয়া। নগদ লাভ। নগদ লাভের পেছনে আমরা দৌড়াদৌড়ি করি। সব কাজের পেছনে থাকে নগদ লাভ। নগদ লাভের নিয়ত থাকলে নগদ লাভ আল্লাহ কিছু দিতে পারেন, কিন্তু মরার পরে কিছুই পাওয়া যাবে না। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন–

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দেই। তারপর

> আমি তার জন্য জাহান্নাম রেখে দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরূপে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আখিরাত (-এর লাভ) চায় এবং সেজন্য যথোচিতভাবে চেষ্টা করে, সে যদি মুমিন হয়, তবে এরূপ লোকের চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।[৪৪]

দুনিয়ার জন্য যদি কেউ করে, যদি কেউ নগদ লাভ চায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা নগদ কিছু ইচ্ছা করলে দেবেন কিন্তু মৃত্যুর পর সে কিছুই পাবে না। আর যে আখিরাত চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতের সুফল কল্যাণ ছাওয়াব প্রতিদান দান করবেন। আফসোস এই– আমরা এ সহীহ নিয়ত না থাকার কারণে, ইখলাস না থাকার কারণে বহু আমল করেও তার ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকছি। অনেক আমল করি, দান-খয়রাত করি, অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা করি, অন্যের উপকার করি, অনেক কিছুই করি, কিন্তু নিয়ত যেহেতু থাকে মানুষকে দেখানো, তাই আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যাবে না।

## আখিরাতে ইখলাসবিহীন তিনজন আমলওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ

এ সম্পর্কে একটা প্রসিদ্ধ হাদীছ আমরা সবাই জানি। আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে তিন ব্যক্তিকে ডাকবেন। একজন শহীদ, একজন আলেম আর একজন দানশীল। প্রত্যেককে বলবেন, আমি তোমাকে কত নিআমত দান করেছিলাম, কিন্তু তুমি কী করেছ? প্রত্যেকে বলবে– তোমার জন্যই তো করেছি। শহীদ বলবে, তোমার জন্য জান দিয়ে দিয়েছি। দানবীর বলবে– আমি তোমার জন্য কত টাকা পয়সাই না খরচ করেছি। আলেম বলবে– আমি ইলম শিখেছি, ইলম চর্চা করেছি, ইলমের প্রচার করেছি। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে বলবেন– করেছ বটে! কিন্তু মনের মধ্যে ছিল রিয়া, মানুষকে দেখানো। মানুষ বলবে,

---

৪৪. সূরা ইসরা : ১৮-১৯

আমি একজন বীরপুরুষ। মানুষ বলবে, আমি একজন দানশীল। মানুষ বলবে- আমি কত বড় আলেম! কত বড় জ্ঞানী! যে উদ্দেশ্যে করেছিলে তা তোমরা পেয়ে গেছ। আমার কাছে তোমাদের জন্য কিছুই নেই। ফিরিশতাকে হুকুম করা হবে– এদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।[৪৫]

আল্লাহর পথে জান দিয়ে দিল, তারপরও জাহান্নামে যেতে হবে। ইলম শিখে আমল করল, তারপর ইলমের প্রচার করল, তাকেও জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর পথে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করল, তারপরও জাহান্নামে যেতে হবে সহীহ নিয়ত না থাকার কারণে, মনের ভেতর ইখলাস না থাকার কারণে। আমরা যখনই যে কাজ করি, দুনিয়ার নগদ একটা লাভের দিকে নজর থাকে। এমনকি এমন কথা শোনা গেছে– বাবা-মায়ের খেদমত করে ছেলে, তারপর বলে– আমি কী পেলাম! আমি বাবার জন্য মায়ের জন্য এত করলাম, আমি পেলাম কী? সব ভাই যা পেল, আমি তো তাই পেলাম, বেশি তো কিছু পেলাম না। সারা জীবন আমিই বাবার খেদমত করলাম আর অন্যরা যে যার পথ দেখেছে। আমিই বাবার পাশে থেকেছি, বাবার খেদমত করেছি। কিন্তু আমি পেলাম কী? বাবা সবাইকে যা দিল আমাকে তাই দিল। তাহলে লাভ কী হল? এই যে তার বাবার জন্য করাটা, এর জন্য সে আখিরাতে কিছু পাবে না। বাবার জন্য কষ্টও করল, আবার আখিরাতে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হল। বাবা-মায়ের জন্য করা, এখানেই তো সবচে' বেশি সহীহ নিয়ত থাকার কথা। দুনিয়ায় মানুষের জন্য বাবা-মায়ের চেয়ে বড় আর কে আছে? আল্লাহ তাআলার পরে তারাই তো সবচে' বড়। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ–

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

৪৫. সহীহ মুসলিম : ১৯০৫

> করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।[৪৬]

আল্লাহর হুকুম পালনের পর সবচে' বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাবা-মায়ের খেদমত করাকে। এর চেয়ে আপনজন দুনিয়ায় আর কেউ নেই। এখানেই সবচে' বেশি ইখলাস থাকার কথা। যে জায়গায় সবচে' বেশি ইখলাস থাকার কথা সেখানেই আমাদের ইখলাস নেই, তাহলে ইখলাস আর কোথায় থাকবে?

## অনুষ্ঠানাদিতে উপহার দেওয়ার লক্ষ্য

যখন যে কাজ করি, তখন লক্ষ্য থাকে আমার সুনামটা কীভাবে হবে। অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে কোনও অনুষ্ঠানে যাওয়া হল, হাজার হাজার টাকা খরচ করে উপহার কেনা হল, মনের মধ্যে নিয়ত থাকল কী? বলা হবে– আমার উপহারটা সবচে' বেশি দামী। আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠানে বা খতনার অনুষ্ঠানে, ফালতু নানা রকমের অনুষ্ঠান আছে, মানুষ যায় আর হাজার হাজার টাকা খরচ করে। আর সেখানে নিয়ত থাকে এই যে, বলা হবে– অমুকের উপহারটা সবচে' সুন্দর হয়েছে। ওইটা সবচে' বেশি দামী হয়েছে। খরচও করলাম হাজার হাজার টাকা, আবার এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছেও কিছু পেলাম না, তাহলে সব টাকা জলে গেল। ওখানেও সহীহ নিয়ত তো থাকতে পারে। ওই উপহার কেনার সময় নিয়ত করা এই– প্রথমেই চিন্তা করা যে, আমি যার জন্য নিচ্ছি, তার বেশি কাজে লাগবে কোন জিনিস। তার বেশি কাজের কোনটা সেদিকে লক্ষ করা। এজন্য সবচে' ভালো হল– কোন উপহার না কিনে যে টাকা দিয়ে কিনতাম সেই টাকাটা তার হাতে দিয়ে দেওয়া এবং কাউকে দেখিয়ে নয়; একান্ত গোপনে তার হাতে দেওয়া। তাহলে এ টাকাটা সে তার নিজের কাজে ভালোভাবে লাগাতে পারবে।

---

৪৬. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩

তার জরুরত কোনটা, তার বেশি কী প্রয়োজন, সে কাজে টাকাটা ব্যবহার করতে পারবে। আমরা সেটা করি না। কিন্তু কেন করি না? গোপনে তার হাতে দিলে কেউ তো জানবে না। আমার তো সুনাম হবে না। এ সুনামের পেছনে ঘুরছি বলে গোপনে তাকে দেই না। অথচ গোপনে দিলেই ইখলাস থাকত এবং ছাওয়াব পাওয়াটা নিশ্চিত হত। কিন্তু প্রচার করার কারণে, প্রকাশ করার কারণে ছাওয়াব না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ এখানে প্রচার হবে, সুনাম-সুখ্যাতি হবে।

## মৃত ব্যক্তির নামে ডাল-ভাত খাওয়ানোর উদ্দেশ্য

এমন হয় যে, বাবা মারা যায়, মা মারা যায়, ভাই মারা যায় বা আত্মীয়স্বজন কেউ মারা যায়, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষকে খাওয়ায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে মানুষকে খাওয়ায় ওইখানে নিয়ত কী? একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, নিয়ত নিজের সুনাম-সুখ্যাতি, নাম-ডাক হবে। সবাই বলবে, অমুকে তার বাবার মৃত্যুতে চল্লিশা করেছে এবং তাতে এত টাকা খরচ করেছে, এত ভালো খাবার দিয়েছে, এত মানুষকে সে খাইয়ে দিয়েছে। নজর ওইদিকে। এদেরকে যদি বলা হয়– লক্ষ লক্ষ টাকা এভাবে খরচ না করে, আপনার গ্রামের পাঁচ-দশজন গরীবকে বাছাই করুন এবং গোপনে সে দশজনকে আপনি এ টাকাটা দিয়ে দিন, তাহলে এতে তাদের উপকার হবে, তাহলে কি তারা মানবে? একদিন এক হাজার মানুষকে খাওয়ালে তার কোনও উপকার নেই। একবেলা খাওয়ার পরে পরে আরেকবেলা সে কী খাবে সে চিন্তা তো তার করতেই হবে। তার কী এমন উপকার হল? কিন্তু এ টাকাটা তাদেরকে ভাগ করে দিলে, এক লক্ষ টাকা যদি দশজনকে ভাগ করে দেওয়া হত, একেকজন দশ হাজার টাকা করে পেত। এ দশ হাজার টাকা তার অনেক উপকারে আসত। কিন্তু সে তা দেবে না। কারণ এতে সুনাম হবে না। আমরা সুনামের পেছনে ঘুরি। এক লক্ষ টাকা খরচও করল, আর এর বিনিময়ে সে কিছু পেলও না! নিয়ত যখন সহীহ নয়, তখন পাবে না এটা নিশ্চিত। নিয়ত তো থাকবে কেবলই আল্লাহকে খুশি করা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا

আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনও প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।[৪৭]

কী সুন্দর আল্লাহ তাআলা বলেছেন! আমরা তোমাদেরকে খাওয়াই কেবলই আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এর বদলে আমি তোমাদের কাছে কোনও বদলা চাই না এবং তুমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাবে এটাও চাই না। শুক্‌র আদায় করবে এটা চাই না। আমরা কারো কোনও উপকার করার পর অপেক্ষায় থাকি যে, সে আমার নাম প্রচার করে বেড়াবে এবং এসে বলবে– আপনি আমার অনেক বড় উপকার করেছেন। আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। আমার কাছে নত হয়ে থাকবে। মানে আমি যখন তার উপকার করলাম, এখন সে আমার গোলাম হয়ে গেল। কারো উপকার করে এরপর তাকে গোলাম মনে করি। কথায় কথায় খোঁটাও দিই। এতে যদি এক কোটি টাকাও খরচ করি, তাহলে আল্লাহর কাছে এর এক পয়সাও মূল্য নেই। বরং এটাই কাল কিয়ামতের দিন আমার জন্য মুসীবত হয়ে দাঁড়াবে।

## ইখলাসের সঙ্গে আমলের সুফল ও তার দৃষ্টান্ত

পক্ষান্তরে এ কাজ যদি ইখলাসের সঙ্গে করি, আল্লাহকে খুশি করার জন্য করি, তাহলে এক টাকার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে প্রভূত ছাওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ তাআলা কী সুন্দর বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَ اللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

৪৭. সূরা দাহর : ৯

যারা আল্লাহর পথে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এ রকম—যেমন একটি শস্য দানা সাতটি শীষ উদ্‌গত করে (এবং) প্রতিটি শীষে একশ' দানা জন্মায়। আর আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন (সওয়াবে) কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ।[৪৮]

আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে দান করে, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়, তার উদাহরণ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এভাবে– যেন একটা ধান, একটা গম সে মাটিতে লাগাল। এরপর ওই একটা ধান থেকে সাতটা শীষ, সাতটা ধানগাছ জন্মায়। সাতটা তো কম, অনেক সময় দেখা যায়, একটা ধান লাগালে ওখান থেকে এতগুলো গাছ জন্মায় যে, এক মুঠে ধরে না। গ্রামে গঞ্জে যারা থাকে বা ছিল, তারা জানে। একটা মাত্র বীজ লাগানো হয়েছে। ওখান থেকে এতগুলো ধানগাছ জন্মিয়েছে যে, এক মুঠোর মধ্যে তা ধরে না। অন্তত পক্ষে সাতটা তো হয়ই। যদি সাতটা হয় আর একেকটা ধান গাছে, একেকটা ছড়ায় যদি একশটা ধান হয়, তাহলে সাতটা ধান গাছে হবে সাতশ ধান। আমরা ছোটবেলা অনেক সময় গুনেছি। গ্রামের যারা, তারা ছোট সময় ফুর্তি করে, দেখি কার ছড়ায় কয়টা ধান হল। দেখা যায়, একশ কী; আরো অনেক বেশি হয়। দেড়শ-দুশো পার হয়ে যায়। বড় বড় ছড়া যদি হয়, ইরি ধানের বড় ছড়া হলে দুশো পার হয়ে যায়। তো কমপক্ষে একশ তো হয়ই। তাহলে একটা মাত্র ধানগাছ, একটা ধান, সেখান থেকে সাতটা ধান হল, সেখান থেকে সাতটা গাছ হল। তো আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য একটা টাকাও যে এভাবে খরচ করে, তার বদলে আল্লাহ তাআলা অন্তত সাতশ নেকী দান করেন। আর বেশিটা কী, তার কোন হিসাব-কিতাব নেই। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ–

وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে অনেক বেশি দেন।[৪৯]

---

৪৮. সূরা বাকারা : ২৬১

৪৯. প্রাগুক্ত

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

আল্লাহ প্রাচুর্যময় (এবং) সর্বজ্ঞ।[৫০]

আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনও কিছুর অভাব নেই। কার অন্তরে কী আছে তা আল্লাহ ভালো করে জানেন। আল্লাহ জানেন, কার অন্তরে ইখলাস কতটুকু, কে টাকাটা দিল আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আল্লাহ বলেন–

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

আল্লাহ জানেন চোখের অসাধুতা এবং সেইসব বিষয়ও, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রাখে।[৫১]

আল্লাহ তাআলা অন্তর্যামী। মানুষের মনের মধ্যে কী আছে তাও আল্লাহ জানেন। ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ

আল্লাহ অন্তরের গুপ্ত বিষয়ও ভালো করে জানেন।[৫২]

কার মনে কতটুকু ইখলাস, আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন। কাজেই এক হাজার লোককে খাওয়ালাম আল্লাহকে খুশি করার জন্য না মানুষকে দেখানোর জন্য, তা আল্লাহ তাআলাই জানেন। সাধারণত দেখা যায়, এটা মানুষকে দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। ফলে ওই এক হাজার লোককে খাওয়ানোর জন্য যে এক লক্ষ টাকা খরচ করলাম, এর বদলে আল্লাহর কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে যদি একটা টাকাও আল্লাহকে খুশি করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এক টাকার বিনিময়ে অন্তত সাতশ নেকী পাওয়া যাবে। কাজেই আমাদের দরকার হল মনের ভেতর ইখলাস আনা। সকল কাজে। যখন যে কাজ করি

---

৫০. প্রাগুক্ত

৫১. সূরা মুমিন : ১৯

৫২. সূরা আলে ইমরান : ১১৯

সেখানে নিয়ত এটা থাকা যে, আমার আল্লাহ আমার প্রতি খুশি হবেন। আল্লাহকে খুশি করা, মানুষকে দেখানো নয়।

## রিয়া বা গুপ্ত শিরক

মানুষকে দেখালে তখন সেটা রিয়া হয়। এটা এক রকমের শিরক, গুপ্ত শিরক। আমি যে আয়াত পড়েছি তাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

সুতরাং যে-কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।[৫৩]

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশা যে রাখে, সে যেন নেক আমল করে। মৃত্যুর পর আমি যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি পাই, বদলা পাই, এ আশা যে রাখে সে যেন নেক আমল করে, আর...

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।

ওই নেক আমল যেন কেবল আল্লাহকে খুশি করার জন্য করে, এতে অন্য কাউকে শরীক না করে। মানে মানুষ আমার প্রশংসা করবে, আমার নামডাক ছড়িয়ে পড়বে এজন্য না করে। প্রতি বছর হজ্জে যাওয়া হল, প্রতি বছর রমাযানের আগে-পরে উমরায় যাওয়া হল। তো হজ্জে যাওয়া, উমরায় যাওয়া কত বড় নেক কাজ। কিন্তু মনের মধ্যে যদি থাকে যে, লোকে বলবে– দেখ, কত বড় আল্লাহওয়ালা, প্রত্যেক বছর হজ্জে যায়, প্রতি বছর সে উমরায় যায়, একজন বড় হাজী সাহেব, তাহলে এ হজ্জে যাওয়া, উমরায় যাওয়া কোনও কাজে লাগল না। খরচ তো হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। হজ্জে যেতে তিন লক্ষ টাকা। উমরায় যেতে এক লক্ষ টাকা। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করল, কিন্তু এর বিনিময়ে আল্লাহর

---

৫৩. সূরা কাহফ : ১১০

কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে বা গুপ্ত শিরক বলেছেন এবং একে দাজ্জালের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক সাব্যস্ত করেছেন।

## ভাই ভাইয়ের বা বোনের উপকার করে কী উদ্দেশ্যে?

ভাই ভাইয়ের উপকার করল। ভাই বোনের উপকার করল। এবং এটা তো করতেই হবে দুনিয়ায় এর চেয়ে করার ভালো জায়গা আর কোথায় আছে? এক ভাই তার ভাইয়ের পেছনে টাকা খরচ করবে, এক ভাই তার বোনের জন্য টাকা খরচ করবে, এর চেয়ে খরচের ভালো জায়গা আর কোথায় আছে? এর চেয়ে ভালো খরচের জায়গা আর নেই। পরিষ্কার কথা। ভাই ভাইয়ের জন্য যদি খরচ করে, তাহলে খরচের এরচেয়ে ভালো জায়গা আর হতেই পারে না। কিন্তু আমাদের অবস্থা হল এই– লক্ষ লক্ষ টাকা এখানে-সেখানে খরচ করি, বন্ধুর পেছনে খরচ করি, কিন্তু ভাইয়ের খোঁজ রাখি না, বোনের খোঁজ রাখি না। আমরা সবাই এ রোগে রোগী। ভাইয়ের জন্য করা, বোনের জন্য করা, এটা যেন কোনও কাজই না। অথচ টাকা খরচ করার এর চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। খুব কমই করি। এরপর আবার যা করি, তাও আবার মাঝেমধ্যেই বলি– 'এত করি! এত করি! আমার কোনও নাম নেই।' আমার নাম নেই– এর মানে কী? এর মানে করার সময় নিয়ত ছিল যে নামটা তার হবে। এ শব্দ, এ বাক্য আমি আমার কানে অনেক শুনেছি, আমি তার জন্য এত করলাম আমার কোনও নাম নেই। এবং আমার মনে হয়, এখানে প্রত্যেকেই শুনেছে। এ বাক্য শুনেনি, এমন মনে হয় এখানে একজনও নেই। বলতে শোনা যায়– 'আমি করি আর নাম আমার হয় না, নাম হয় অমুকের।' অথচ আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন এটা–

لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا

আমরা তোমাদের কাছে কোনও প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।[৫৪]

---

৫৪. সূরা দাহর : ৯

আমি নাম চাই না। তুমি আমার গান গেয়ে বেড়াবে, গুণ গেয়ে বেড়াবে, আমি সেটা চাই না। আমার যা চাওয়ার তা কেবল আল্লাহর কাছেই চাই।

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমার পারিশ্রমিক অন্য কেউ নয়, কেবল আল্লাহই নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। আর আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, আমি যেন অনুগত লোকদের মধ্যে শামিল থাকি।[৫৫]

এটা তো নবীদের চরিত্র। আমার কিছু পাওয়ার থাকলে তা কেবল আল্লাহর কাছেই, তোমার কাছে নয়। তো সবচে' ভালোটা ভাইয়ের জন্য করা, বোনের জন্য করা। সেখানে এক তো করিই না, আবার যতটুকু করি তারপর আবার বলে বেড়াই, এত করলাম! আমার কোনও নাম নেই। ভাতিজার জন্য করা। ভাগ্নের জন্য করা। ভাগ্নীর জন্য করা। এটা তো করার সবচে' ভালো জায়গা।

## চাচা-ভাতিজা সম্পর্ক

আজকাল ভাতিজা আপন নেই। ভাতিজাও মনে করে না– চাচা আমার আপন। চাচাও মনে করে না– ভাতিজা আমার আপন। অথচ শরীয়ত এর কত গুরুত্ব দিয়েছে। ভাতিজাকে শিক্ষা দিয়েছে এই–

عمّ الرجل صِنْوُ أبيه

চাচা বাবাতুল্য।[৫৬]

বাবার মতো সম্মান-শ্রদ্ধা তাকে করবে। আবার চাচাকে শরীয়ত অভিভাবক বানিয়েছে। কারো বাবা যদি মারা যায়, তাহলে তার অভিভাবক কে? চাচা। আমাদের সমাজ বানিয়েছে মা'কে। চাচার কোনও গুরুত্ব নেই এখানে। মা অভিভাবক। এখানে সব কিছু মা করে। চাচাকে জিজ্ঞেসও করে না। আর চাচাও খবর নেওয়ার কোনও গরজ

৫৫. সূরা ইউনুস : ৭২

৫৬. সহীহ মুসলিম : ২৩২৪

বোধ করে না। তার এ ভাতিজা খেয়ে আছে, না না খেয়ে আছে, কী অবস্থায় আছে, তা চাচাও খোজ নেয় না, আর ওই ভাতিজার মা'ও চাচাকে কিছু জিজ্ঞেস করার কোন গরজ বোধ করে না। অথচ চাচাই অভিভাবক। আর অভিভাবক হওয়ার মানে কী? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[৫৭]

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন, তোমার ভাই মারা গিয়েছিল, এরপর তোমার ভাতিজার অভিভাবক হয়েছিলে তুমি। বলো, তুমি তোমার ভাতিজাদের জন্য কী করেছ? তোমার এ ভাতিজার জন্য তুমি কী করেছ? তোমার এ দায়িত্ব তুমি কতটুকু আদায় করেছ? আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন। তখন আমরা কী জবাব দেব? চাচাও করে না। ভাতিজারাও চাচার নাম নেয় না। ফলে হয় কী? একজন আরেকজনের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। জগতের সবচে' বড় শত্রু আজকাল চাচা-ভাতিজা। ওই যে একটা কথা আছে– ভাতিজা মহকুমা শহরে গেছে। আগে মহকুমা শহর ছিল, এখন তো মহকুমা নেই। ভাতিজা বলছে– গ্রাম থেকে মহকুমায় আসলাম। শুধু শুধুই ফিরে যাব? কিছুই করব না? যাই, চাচার নামে একটা মামলা করে যাই। চাচা-ভাতিজার সম্পর্ক এ রকমের হয়েছে। টাকা খরচ করার বা অন্য উপায়ে কিছু করার কোনও চিন্তা নেই। ভাতিজাদের জন্য টাকা দিয়েই করতে হবে, এমন তো কোনও কথা নেই। ভাতিজাদের জন্য কত ভাবেই তো করা যেতে পারে। যেভাবে করা সম্ভব, এখানে তা করাটা দায়িত্ব। আবার করার পরে খোটাও দেওয়া যাবে না। কারণ করতে হবে কেবলই আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য।

এক তো আমরা এটা করিই না। আবার যতটুকু করি, করি সামান্যই, কিন্তু বলার সময় বলি বিশাল করে– নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছি।

---

৫৭. সহীহ বুখারী : ৮৯৩

কী ঘোড়ার ডিম না খেয়ে খাইয়েছে! নিজের উচ্ছিষ্ট তাকে খাইয়েছে। যেটা নষ্ট হয়ে যাবে সেটা খাইয়েছে। কিন্তু বলার সময় বলে– আমি নিজে না খেয়ে তাকে খাইয়েছি। একটু করে অনেক বলা। অথচ শরীয়তের শিক্ষা হল এই– এত বড় করে মনে করো তুমি সামান্যই করেছ। মনে করবে– আমার তো দায়িত্ব ছিল অনেক কিছু করার, কিন্তু কিছুই করা হয়নি, অতি সামান্যই করেছি। বরং যতটুকুই করেছ সেটাও ভুলে যাবে। মনে করবে যে, আমি কিছুই করিনি। অথচ আমি একটু করেন অনেক বড় করে দেখাই এবং জীবনভর ওইটা মনে রাখি যে, আমি আমার চাচার জন্য, ভাইয়ের জন্য, ভাতিজার জন্য এই এই করেছি। মরণ পর্যন্ত ভুলি না। ফলে যাই করি, আল্লাহ তাআলার কাছে এর কোনও বদলা, কোনও বিনিময় আমাদের থাকবে না।

যে হাদীছ শুরুতে বললাম, সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত হতে হবে সহীহ। মনের মধ্যে থাকতে হবে ইখলাস, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা। কেবল এটাই। ব্যস, আমি আর কিছু চাই না। আল্লাহ আমার প্রতি খুশি হবেন। এছাড়া আর কোনও দিকে আমার নজর নেই। যখন যে কাজ করব, যার যে উপকার করব, আল্লাহর জন্য করব। কুরআনুল কারীম পড়ি, নামায পড়ি, হজ্জ করি, যাই করি, আমার জীবনের সমস্ত আমল কেবলই আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য করব।

## নিয়তের জন্য ছোট আমলও বড় হয়ে যায়

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিয়ত অনুযায়ীই আমল।

তার মানে, আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা এটা তো একটা বিশাল নিয়ত। অনেক বড় নিয়ত। কাজেই ছোট্ট একটা কাজও যদি হয়, নিয়ত যেহেতু অনেক বড়, এ কাজটা আর ছোট্ট থাকবে না। আল্লাহর কাছে এ কাজটা অনেক বড় হবে।

রাস্তায় চলতে গিয়ে আমি একটা ইটের টুকরো সরিয়ে দিলাম। দেখলাম রাস্তার মাঝখানে একটা ইটের টুকরো পড়ে আছে। আর ভাবলাম, এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় কারো পায়ে লাগতে পারে। আর পায়ে লাগলে সে অনেক ব্যথা পাবে। আমি এটা রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলাম। নিয়ত কেবলই আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা। তাহলে কাজটা তো একটা ছোট্ট কাজ, কিন্তু নিয়্যত অনেক বড়– আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা। আল্লাহ তাআলা মহান। সারা জাহানের মালিক। আমার মালিক। দুনিয়ায় যত মালিক আছে, যত মাখলুক আছে, সবার মালিক। এ আসমান-যমীনের মালিক। নিখিল বিশ্বের মালিক। আল্লাহ কত বড়! আল্লাহু আকবার। কত বড় যে, কে এটা কল্পনা করতে পারে?

প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য যদি কেউ কোনও কাজ করে, সে কাজটা অনেক বড় হয়ে যায়। কেউ প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য ছোট্ট একটা কিছু বানাল। আর এটা যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছাতে পারে আর প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারে যে, এ কাজটা সে করেছে তারই জন্য তাহলে কতটা খুশি হয়? কেউ একটা মাফলার তৈরি করল, একটা সোয়েটার তৈরি করল। একটা সোয়েটার বুনতে আর কী খরচ হয়! বুনে এটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছাল। প্রধানমন্ত্রী যদি জানতে পারে অমুকে আমার জন্য এ সোয়েটার তৈরি করেছে, তখন প্রধানমন্ত্রী কী বদলা দেবে তার? এ সোয়েটারটার দাম যদি হয় পাঁচশ টাকা, তাহলে প্রধানমন্ত্রী যে উপহার তাকে দেবে তার দাম হবে পাঁচ লক্ষ টাকা। কারণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এখন এ জিনিসটা ছোট্ট নেই, এটা অনেক বড় হয়ে গেছে। কেননা প্রধানমন্ত্রীর জন্য করেছে। ফলে ক্ষুদ্র কাজ অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন প্রধানমন্ত্রী দেবে তার ক্ষমতা অনুযায়ী, তার সাধ্য অনুযায়ী। প্রধানমন্ত্রীর আর কী ক্ষমতা! সে তো একটা দেশের মালিক নয়, শুধু ক্ষমতাটা তার হাতে। সে ক্ষমতাও কত সীমিত! একজন মানুষের উপর আল্লাহ তাআলার যে ক্ষমতা, তার লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগও একজন মানুষের উপর প্রধানমন্ত্রীর নেই। তাহলে এ মহাবিশ্বের যিনি মালিক, তার কত ক্ষমতা? সেই আল্লাহকে খুশি করার জন্য যদি কোনও কাজ করা হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে সে কাজটা কত বড় হয়ে যাবে!

# একবার যদি সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলা হয়

এজন্যই তো একবার মুখে বললাম 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী', এতে আর কী কষ্ট! কোনওই কষ্ট নেই। এতে কতটুকু সময় লেগেছে? মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল। আর মুখেরও কোনও কষ্ট হয়নি। সারা শরীরের কষ্ট তো নেইই। হাতের, পায়ের, চোখের, কোনও অঙ্গের কোনও কষ্ট নেই। কেবল একটু মুখ নাড়লাম। টাকাও খরচ হল না এবং শারীরিক কোনও কষ্টও নেই। তাহলে বাহ্য দৃষ্টিতে একদম তুচ্ছ একটা কাজ, কিন্তু আল্লাহকে খুশি করার জন্য করেছি। এজন্য করিনি যে, লোকে বলবে দেখো, লোকটা কত বড় যাকির, যিক্‌রকারী। এজন্য করিনি। করেছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য। ছোট্ট একটা কাজ করলাম, কিন্তু আল্লাহর কাছে কত দামী হয়ে গেছে। হাদীছে এসেছে– যে ব্যক্তি দিনে একশো বার সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী বলবে তার গুনাহসমূহ মুছে দেওয়া হবে, যদিও তা সাগরের ফেনাসম হয়।[৫৮]

আরেক হাদীছে আছে, 'সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বললে আল্লাহ তাআলা এর বদলে জান্নাতে একটা করে গাছ দেবেন।[৫৯] জান্নাতের গাছ তো আর দুনিয়ার গাছের মতো নয়। দুনিয়ার গাছের সাথে তার কোনও তুলনাই চলে না।

ওই হাদীছ তো আমরা সবাই জানি, জান্নাতে এক বিশাল গাছ আছে। গাছটা এত বড় যে, ওর ছায়ায় যদি এক ব্যক্তি একটা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে ঘুরতে শুরু করে, তাহলে ওই ছায়া ঘুরে আসতে তার একশ বছর লাগবে, তাও শেষ হবে না![৬০] একটা ঘোড়ার পিঠে যদি একজন লোক চড়তে শুরু করে আর একশ বছর চলে, তাহলে এমন কয়েক পৃথিবী সে ঘুরে আসতে পারবে। ঠিক না? কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, জান্নাতে এত বড় গাছ দিয়ে আমি কী করব? এত বড় গাছ! এটা আবার কী

---

৫৮. সহীহ বুখারী : ৬৪০৫; সহীহ মুসলিম : ২৬৯১

৫৯. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮০৭

৬০. জামে তিরমিযী : ৩২৯৩

কাজে লাগবে? ভাবা যায়, গাছটা কত বড়! এ পৃথিবীর চাইতে তো অনেক বড় হবে। এত্ত বড় গাছ আমার কী কাজে লাগবে? হাঁ, এটা কাজে লাগবে।

এটা বোঝা যায়, কেউ যদি পাঁচ কাঠা একটা প্লটের মালিক হয়, সেখানে একটা বাড়ি করে আর সামনে একটা ফুল বাগান করে, তাহলে এখানে সে কিছু গাছ লাগাবে। চিন্তা করবে– সামান্য একটু জায়গা, এখানে আমার বুঝেশুনে গাছ লাগাতে হবে, যাতে এত বড় না হয় যে, আরেকজনের বাড়ির সীমানায় গিয়ে পড়ে। তাই সে ছোট ছোট গাছ লাগাবে। কারণ জায়গা অল্প। বেশি বড় গাছ লাগালে একটা লাগাতে পারবে, তাও আবার বছরে বছরে ডাল কাটতে হবে। তাই সে ছোট ছোট গাছ লাগাবে। যদি তার বাড়িটা হয় এক বিঘা, তাহলে সে আরো বড় গাছ লাগাবে। কারণ এখানে প্রচুর জায়গা আছে। আর এখানে যদি ছোট ছোট গাছ লাগায়, সুন্দরও লাগবে না। এক বিঘা জায়গা। সামনে বেশ বড় বাগান। ওই বাগানে ছোট ছোট কেবল গোলাপ গাছ আছে। সুন্দর লাগবে না। এখানে আরো বড় বড় গাছ চাই। যদি কারো বাগানটা হয় রমনা পার্কের মতো, তাহলে সেখানে বড় বড় বটগাছ চাই। কারণ রমনা পার্কে যদি বটগাছের মতো গাছ না থাকে, তাহলে এ বাগানটাকে ন্যাড়া মনে হবে। এ পার্ক সুন্দর লাগবে না। বাগান যত বড়, গাছ তত বড় হতে হবে, তা না হলে বাগান সুন্দর দেখাবে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে জান্নাত দান করুন। আমীন। জান্নাত তো বিশাল এক বাগানবাড়ি। প্রত্যেকের জান্নাত বিরাট বাগানবাড়ি। একেকজনের জান্নাত এ পৃথিবীর অন্তত দশ গুণ বড়। যার বাড়িটা সারা পৃথিবীর মতো, তার বাগানকে সাজাতে হলে কত বড় গাছ লাগবে? এখানে বটগাছ দিয়ে সাজালে হবে না। এ পৃথিবীর মতো এত বড় যদি কারো বাড়ি হয়, এখানে যদি বটগাছের মতো গাছ লাগায়, তাতে সুন্দর দেখা যাবে না তার বাগান। এখানে আরো অনেক বিশাল গাছ চাই। এত বড় গাছ চাই, যে গাছের ছায়ায় একটা ঘোড়া একশ বছর দৌড়াতে পারবে। তা না হলে এ বাগান সুন্দর দেখা যাবে

না। জান্নাত যেহেতু বিশাল বাগানবাড়ি, তাই ওই বাগান সাজাতে হলে ওইরকম বড় বড় গাছ চাই।

আলহামদুলিল্লাহ বলার ছাওয়াব এত যে, বললে ছাওয়াব দিয়ে দাঁড়িপাল্লা ভরে যায়। হাদীছে আছে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ

আলহামদুলিল্লাহ বললে দাঁড়িপাল্লা ভরে যাবে।[৬১]

এত নেকী। তাহলে কেউ বলতে পারে, একবার আলহামদুলিল্লাহ বললে যদি দাঁড়িপাল্লা ভরে যায়, তাহলে তো ব্যস আলহামদুলিল্লাহ বললাম, আর কিছু দরকার নেই, জীবনে আর কোনও আমল লাগবে না। না, অবশ্যই লাগবে। কারণ যেমন আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলে দাঁড়িপাল্লা ভরে ফেলি, তেমনি গীবত করে গুনাহের এক পাল্লা ভরে ফেলি। এক হাদীছে আছে, এক গীবতকারীকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন– তোমার এই এতটুকু গীবত যদি সাগরের পানিতে মেশানো হয়, তবে সব পানি নষ্ট হয়ে যাবে।[৬২]

প্রতিদিন আমরা অগণিত গুনাহ করি। নেকীর চেয়ে গুনাহ অনেক বেশি করি। প্রত্যেকে যদি হিসাব করে প্রত্যেকদিন কত গুনাহ করে সে, তাহলে দেখা যাবে অসংখ্য গুনাহ করে। কাজেই একদিকে ছাওয়াব কামাই করি, আরেকদিকে গুনাহ করে করে সেটা নষ্টও করি। এজন্য গুনাহ করে করে যে বদের আমলনামা ভরে ফেলি, ওটাকে তো কাটাতে হবে। তা কাটানোর জন্য বেশি বেশি আলহামদুলিল্লাহ পড়তে হবে।

## চাই ইখলাসের সঙ্গে বেশি বেশি নেক আমল

বেশি বেশি নেক আমল করতে হবে। যত কাজই করি, সমস্ত কাজই করতে হবে কেবলই আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য। এমনকি খানা খাওয়ার ক্ষেত্রেও। এখানেও নিয়ত করব এই যে, আমি খাবার

৬১. সহীহ মুসলিম : ২২৩

৬২. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৮৭৫

খাচ্ছি আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য। কারণ খাবার আল্লাহ তাআলার নিআমত। এ নিআমত আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন খাওয়ার জন্য। আমি আল্লাহর নিআমত যদি ভোগ করি তাহলে আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। আমি যদি কাউকে একটা লুঙ্গি দিই আর সে লুঙ্গিটা ব্যবহার না করে, তাহলে খুশি হব না। একজন আমাকে একটা জামার কাপড় দিয়েছে। এখন জিজ্ঞেস করে জামাটা বানিয়েছি কি না। যদি শোনে এটা ফেলে দিয়েছি, তাহলে মনে মনে আঘাত পাবে। তাকে দিলাম, আর দেখ কোনও পাত্তাই দিল না। তো আল্লাহর নিআমত যদি আমি ভোগ করি আল্লাহ খুশি হবেন। তাহলে যখন খাবার খাই তখন যদি এ নিয়ত রাখি যে, আমি খাবার খাচ্ছি আল্লাহকে খুশি করার জন্য, ব্যস, তখন খানা খাওয়াটাও নেকীর কাজ হয়ে যাবে। পানি খেলাম এজন্য যে, পানি আল্লাহর নিআমত, আমি খেলে আল্লাহ খুশি হবেন, তখন পানি পান করাটাও নেকীর কাজ হয়ে গেল। আমরা আমাদের পার্থিব জীবনের যত কাজ আছে সব যদি করি আল্লাহকে খুশি করার জন্য, তাহলে সবই ছাওয়াব। শুধু এতটুকু লক্ষ রাখা– কাজটা যেন গুনাহের কাজ না হয়। যে কাজটা হালাল কাজ, বৈধ কাজ, এ কাজের যদি নিয়ত করি আল্লাহকে খুশি করা, তাহলে ইনশাআল্লাহ এটা নেকীর কাজ হয়ে যাবে, ইবাদত হয়ে যাবে।

কাজেই আমরা যেন ইখলাসের সঙ্গে, সহীহ নিয়্যতের সাথে আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য সমস্ত আমল করি তাহলে আমরা আমাদের আসল ঠিকানা জান্নাতে পৌছতে পারব। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# ঈমানী জীবনের চালিকাশক্তি সবর ও শুক্‌র

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قال الله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

صدق الله العظيم.

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ এবং মা ও বোনেরা!

দুনিয়ায় মানুষের অবস্থা দু'রকম। একটা ভালো অবস্থা আর আরেকটা আপাতদৃষ্টিতে ও বাহ্যিকভাবে মন্দ অবস্থা। হাদীছে বলা হয়েছে মুমিনের জন্যে দুটোই ভালো। যদি ভালো অবস্থা হয় আর সে তাতে শুক্‌র করে, এটা তার জন্যে ভালো। আর যদি মন্দ অবস্থা হয় আর সে সবর করে, এটাও তার জন্যে ভালো। এর বাইরে তৃতীয় কোনও অবস্থা নেই। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-কষ্ট, হাসি-কান্না, এইতো। অবস্থা দু'টোই। মানুষের প্রতি আল্লাহর হুকুম হল যখন তোমার হাসির অবস্থা হয় তখন তুমি শুকরিয়া আদায় করো আর যখন কান্নার অবস্থা হয় তখন সবর করো। এই দুটো যে করতে পারবে সে আল্লাহকে পেয়ে যাবে। আল্লাহকে পাওয়ার সহজ পথ সুখের সময় শুক্‌র আর দুঃখের সময় সবর। এই

দুটো করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে। এই দুটো যার নাই, সে আর যা কিছুই করুক না কেন, আল্লাহকে সে পাবে না। পেতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

আল্লাহ সবরকারীর সঙ্গে।[৬৩]

আরো ইরশাদ করেন

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

যে সবর করে, আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কার দেবেন বিনা হিসাবে।[৬৪]

আল্লাহ সবরকারীর সঙ্গে। যার সঙ্গে আল্লাহ হয়ে যান তার আর কী দরকার? তার আর কাকে দরকার?! কিন্তু আমরা সবর করতে পারি না। সবর এবং শুক্‌র দুটোই আমাদের হাতছাড়া। ভালো অবস্থায় শুক্‌র করি না। খাবার খেলাম। আল্লাহ তায়ালা খাওয়ালেন। আলহামদুলিল্লাহ। শুক্‌র করা হয় না। অথচ শুক্‌র করলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হত। হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ يَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدُ اللهَ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُه عَلَيْهَا

আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রতি রাজি হয়ে যান, যে একটু খাবার খায় আর সেজন্য আল্লাহর শুক্‌র করে। এমনিভাবে একটু পানীয় পান করে আর সেজন্য আল্লাহর শুক্‌র করে।[৬৫]

দেখুন, খাবারও খাওয়া হল আবার আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও পাওয়া গেল। কত লাভ! কিন্তু আমাদের অবস্থা কেমন? খাবার খাওয়া হয়, কিন্তু

---

৬৩. সূরা বাকারা : ১৫৩

৬৪. সূরা যুমার : ১০

৬৫. সহীহ মুসলিম : ২৭৩৪

শুক্‌র করা হয় না। বরং দোষ ধরা হয়। কেমন খাবার! কি তরকারি! লবন কম হয়ে গেছে বা বেশি হয়ে গেছে ইত্যাদি। কিন্তু এ যে আল্লাহর নিআমত! এ খেয়ে যে আমার প্রাণ রক্ষা হল। খেয়ে আমার ক্ষুদা মিটল– একথা একবারও চিন্তা করলাম না।

কত লোক আছে এই খাবারটুকুও পায় না। আফ্রিকায় এখনও কোটি কোটি মানুষ খাবারের জন্য কষ্ট করে। খাবারের জন্য লংগরখানায় গিয়ে লাইন ধরে। কোনও রকম একটু খাবার পাওয়া যায় কি না। সে খাবার আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঘরে বসে বসে খাওয়াচ্ছেন আর আমি খাবারের দোষ ধরছি। এ কত বড় নাশুকরি। অথচ শুক্‌র আদায় করলে আল্লাহ খুশি হন আবার ছাওয়াবও পাওয়া যায়। খেলাম, পেট ভরল। আবার খাওয়ার পর যদি বলা হয় আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে পেছনের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। খাওয়ার পরে শুক্‌র আদায় করলে পেছনের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। খেলাম, পেট ভরল, গুনাহও মাফ হল। আল্লাহ কত মেহেরবান! খাবার আল্লাহ দিলেন, তাতে আমার পেট ভরল, আবার শুক্‌র আদায় করলাম, গুনাহও মাফ হলো। লাভই লাভ। কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে আমাদেরকে শুক্‌রের আদেশ করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমাকে শুক্‌র আদায় করো, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।[৬৬]

আরো ইরশাদ হয়েছে–

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

তোমরা যদি শুক্‌র কর, তবে আমি তোমাদের আরো বেশি দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞতা কর, তবে মনে রেখো– আমার শাস্তি সুকঠিন।[৬৭]

---

৬৬. সূরা বাকারা : ১৫২

৬৭. সূরা ইবারহীম : ৭

আমরা শুক্‌র করি না, আবার সবরও করি না। যে-কোনও বিপদ দেখা দিলে অন্যের কাছে বলে বেড়াই, ভাই! শেষ হয়ে গেলাম। দুঃখের কথা বলে বেড়ানোটা সবরের পরিপন্থী। হ্যাঁ, দুআ চাওয়া যাবে যে, ভাই আমার এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, এই মুসীবতে পড়েছি, তুমি দুআ করো আমার জন্যে। সে এক জিনিস। আরেক হলো অভিযোগ করে বেড়ানো– আমার এত কষ্ট! শেষ হয়ে গেলাম একেবারে। যার সাথে দেখা হয় তাকেই বলে বেড়ায়। যেন আল্লাহ বিরুদ্ধে নালিশ। বৃষ্টি হল, তো অভিযোগ করে, 'দেখো এই অসময়ে বৃষ্টি, ধান-পান তো সব শেষ! আমরা মুসলমান আমাগো এই দশা, আমাগো দুইটা ধান হইছিল তাও শেষ কইরা দিল।' لا حول ولا قوة الا بالله আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ! 'দেখো কাফেরদের কত সম্পদ, কত টাকা-পয়সা, আর আমরা মুসলমান, দুইটা ধান হইছিল তাও আল্লাহ শেষ করে দিল। আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহর বিরুদ্ধে নালিশ! এ কত বড় কঠিন ধৈর্যহীনতা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

আমি পরীক্ষা করব ভয়ভীতি দিয়ে। ক্ষুধা দিয়ে। টাকা-পয়সা কোনওভাবে হ্রাস করে। ছেলে-মেয়ে, কোনও আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু দিয়ে। ফল-ফসল কমিয়ে দিয়ে। তবে এই বিপদে পড়ে যারা সবর করবে তাদেরকে সুসংবাদ শোনাও।[৬৮]

সবর করে কারা?

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

যারা তাদের কোনও মুসীবত দেখা দিলে বলে ওঠে, 'আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'[৬৯]

---

৬৮. সূরা বাকারা : ১৫৫

৬৯. সূরা বাকারা : ১৫৬

যারা মুসীবত হলে ইন্নালিল্লাহ পড়ে, তারাই সবরকারী। জুতা ছিড়ে গেছে, বলবে– ইন্নালিল্লাহ। জামা ছিঁড়ে গেছে, বলবে– ইন্নালিল্লাহ। পায়ে উষ্ঠা খেয়ে নখটা উল্টে গেল, বলবে– ইন্নালিল্লাহ। ছেলের অসুখ, নিজের মাথা ব্যথা, পড়বে– ইন্নালিল্লাহ। যে-কোনও রকমের মুসীবত দেখা দিলে সে পড়বে–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

কত সুন্দর কথা! "ইন্নালিল্লাহ"। আমার টাকা-পয়সা গেছে কী হয়েছে! আমি নিজেই তো আল্লাহর। আল্লাহ আমার টাকা নিয়েছেন, আমাকেও নিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ আমার মালিক। আমার দশ হাজার টাকা গেছে, আল্লাহ নিয়ে গেছেন। আল্লাহ যেমন আমার দশ হাজার টাকা নিয়েছেন, আল্লাহ যেমন আমার ছেলেকে নিয়ে গেছেন, আল্লাহ যেমন আমার বাবাকে নিয়ে গেছেন, আল্লাহ যেমন আমার দাদাকে নিয়ে গেছেন, আল্লাহ যেমন আমার স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন কিংবা স্বামীকে নিয়ে গেছেন, তেমনি আল্লাহ আমাকেও নিয়ে যেতে পারেন। একদিন তো নেবেনই। আমি তো আল্লাহর।

আমদের সকলেরই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। কারো নিস্তার নাই, কারো রেহাই নাই, সকলেরই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। আমরা সকলে আল্লাহর মালিকানাধীন। আমাদের সকলের মালিক আল্লাহ। আমার ছেলেরও মালিক আল্লাহ, আমারও মালিক আল্লাহ। তো যেই আল্লাহ আমার ছেলের মালিক, সেই আল্লাহই আমার ছেলেকে নিয়েছেন। ওই আল্লাহ আমারও মালিক, ওই আল্লাহ আমাকেও নিয়ে যাবেন। ইন্নালিল্লাহ। আর যদি সঙ্গে ঈমান নিয়ে যেতে পারি তাহলে আর ভয় কী? বাবা তুমি চলে গেছ, কোনও চিন্তা নেই, আমাদের সকলেরই আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেখানে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। এ ক্ষণিকের বিচ্ছেদ। দুনিয়া থেকে তুমি চলে গেছ আর আমি আছি, ক্ষণিকের বিচ্ছেদ।

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তুমি সেখানে গেলে, যেখানে আমিও একদিন যাব। ঈমান নিয়ে যেতে পারলে সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তান-সন্ততিগণ ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেব এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে।[৭০]

এক ছেলে মুমূর্ষু, মারা যায় যায় অবস্থা। পাশে তার বাবা-মা কাঁদছে। ওই ছেলে বলছে– তোমরা কাঁদছ কেন? তারা বললেন– কাঁদছি বাবা এ কারণে যে, তুমি তো আমল ভালো করনি। ওই বাব-মা প্রকৃতই ভালো ছিল। আমরা হলে হয়তো বলতাম– বাবা কাঁদব না! তুমি আমাদের প্রাণের ধন, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তুমি মরে যাচ্ছ। হায়! তোমাকে ছাড়া আমরা কেমনে বাঁচব! আর ওই বাবা-মা বলছে– বাবা! তোমার তো যা দেখছি মনে হয় আয়ু শেষ, কিন্তু তোমার তো আমল ভালো ছিল না। তোমার মৃত্যুর পরে কী যে অবস্থা হবে সেই চিন্তায় কাঁদছি। তখন ওই ছেলে জবাব দেয়– তোমরা কেঁদো না। বরং তোমরা আমাকে তাঁর হাতে ছেড়ে দাও, আমার প্রতি যার মায়া-মমতা তোমাদের চেয়েও বেশি। আমি মরলে আমার কী হবে সেই মায়ায় কাঁদছ? কিন্তু আমি যাচ্ছি তার কাছে, যার মায়া তোমাদের চেয়েও বেশি। আমি তাঁর রহমতের আশা করি। আল্লাহর প্রতি আস্থা, আল্লাহর প্রতি এই ভরসাটা থাকা ভালো। বিশেষ করে মৃত্যুকালে।

মৃত্যুর আগে দুটোই থাকতে হবে– আশা এবং ভয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আশাও থাকতে হবে আর ভয়ও থাকতে হবে। কিন্তু মৃত্যুকালে আশাটা থাকা ভালো। কারণ দুনিয়ার শেষ অবস্থা। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, এই সময় যদি প্রাণভরা আশা নিয়ে যাওয়া যায়! স্বাভাবিক ভাবে দুনিয়াতেই কারো কাছে কেউ আশা নিয়ে গেলে সহজে তাকে ফিরিয়ে

---

৭০. সূরা তূর : ২১

দেয় না। ভাবে– এত আশা করে আমার কাছে আসছে, ফিরিয়ে দিই কীভাবে? কাজেই মৃত্যুকালে যদি প্রাণভরা আশা নিয়ে যাওয়া যায়! আল্লাহ তো আমাকে মাফ করবেন, আমাকে রহম করবেন। তাহলে সেই আল্লাহ কীভাবে শাস্তি দেবেন?

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কি করবেন যদি তোমরা শুক্‌র কর ও ঈমান আন?[৭১]

তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোনও দরকার তো আল্লাহর নেই। আল্লাহ তো রহমান, রহীম। তো সবরকারী ওই ব্যক্তি, যে বিপদ-আপদে বলে–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

যে-কোনও বিপদে বলে। পায়ে কাটা ফুটল, জুতো ছিঁড়ে গেল, মাথা ব্যথা হলো, দশ টাকা হারিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বলবে– ইন্নালিল্লাহ। কেউ বলতে পারে, মাত্র দশ টাকা হারিয়ে গেল এর জন্য ইন্নালিল্লাহ পড়ব? না, দশ টাকা এটাও একটা নিআমত। এই নিআমতকে অবহেলা করা উচিত না। এর জন্যও ইন্নালিল্লাহ পড়া উচিত। এই ইন্নালিল্লাহর এতো পুণ্য, এতো ছাওয়াব যে, আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিচ্ছেন–

اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে বিশেষ করুণা ও রহমত এবং তারাই সফল।[৭২]

বর্ণিত আছে– যে ব্যক্তি অতীতের বিপদের কথা মনে করে নতুন করে ইন্নালিল্লাহ পড়ে, সে নতুন করে ছাওয়াব পায়।[৭৩] দশ বছর আগে বাবা মারা গেছে তখন সে إنا لله و إنا إليه راجعون পড়েছিল। তখন ইন্নালিল্লাহ পড়ে যেই ছাওয়াব পেয়েছিল, এখন দশ বছর পরে যদি ওই কথা মনে

---

৭১. সুরা নিসা- ১৪৭

৭২. সূরা বাকারা : ১৫৭

৭৩. সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৬০০

পরে আর বলে إنا لله و إنا إليه راجعون, তাহলে ওই সময় যেই ছাওয়াব পেয়েছিল, এইবার ইন্নালিল্লাহ পড়েও সেই ছাওয়াব পাবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ এতো খুশি হন ইন্নালিল্লাহ পড়লে।

তো দু'টি অবস্থা– আনন্দের অবস্থা আর বিষাদের অবস্থা। আনন্দের অবস্থায় করতে হবে শুক্‌র আর বিপদের অবস্থায় করতে হবে সবর। এটা অবলম্বন করলে বান্দার গোটা জীবনই কল্যাণকর হয়ে যায়। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন –

عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

মু'মিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সব ব্যাপারই ভালো। মু'মিন ছাড়া অন্য কারো অবস্থা এরকম নয়। তার যদি আনন্দদায়ক কিছু দেখা দেয় তবে সে শুক্‌র করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি কষ্টদায়ক কিছু দেখা দেয়, তবে সবর করে। ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।[৭৪]

ব্যস, এই দুই অবস্থা যদি কেউ অবলম্বন করতে পারে, এই দুই গুণ যদি কেউ অর্জন করতে পারে, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহকে পেয়ে যাবে। আর হাশরের ময়দানে দেখা যাবে তখন তার আমলনামায় নেকী আর নেকী, পুণ্য আর পুণ্য। কারণ বান্দার কোনও কিছুই আল্লাহ বৃথা যেতে দেন না, সব লেখা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

যে ব্যক্তি এক বিন্দু পরিমাণ নেক কাজ করে, এটাও সে দেখবে। আর যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ বদ কাজ করে সেও তা দেখবে।[৭৫]

এখানে বলা হয়েছে 'দেখবে'। এই দেখার এক অর্থ তো হলো– তার সব পুরস্কার ও শাস্তি দেখবে। নেক কাজ করলে তার পুরস্কার সে পাবে। আর

---

৭৪. সহীহ মুসলিম : ৭৬৯২

৭৫. সূরা যিলযাল : ৭, ৮

বদকাজ করলে তার শাস্তি সে পাবে। সেইসঙ্গে ﷻ বলে আল্লাহ তাআলা এই কথা বোঝাচ্ছেন– ওই সময় ছবি দেখানো হবে। দুনিয়ায় যে যেই মন্দ কাজ করে, এ মন্দ কাজ করার যে অবস্থাটা, সেটা দেখানো হবে।

যেমন, কারো পকেটে হাত দিয়েছে, ব্যস, সে ছবি তুলে রাখা হয়েছে। হাশরের ময়দানে ছবি দেখানো হবে। দেখো তুমি ওই কাজ করেছিলে। যত পাপ কাজ আছে, সবকিছুর ছবি দেখানো হবে। ভাবা যায়?! চিন্তা করা যায় কী ভয়াবহ ব্যাপার! যে যত মন্দ কাজ করেছে, করাকালীন যে অবস্থাটা হয় তার ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। এই ছবি সেদিন খুলে দেয়া হবে। দেখো। তখন কারো অস্বীকার করার কোনও উপায় থাকবে? এখন সি.সি. ক্যামেরায় ছবি উঠে যায়। কেউ মার্কেটে গেল। মার্কেটে গিয়ে কোনও দোকান থেকে কোনও কিছু তুলে নিল, তার ছবি উঠে যাচ্ছে। ধরা পড়ে যায় যে, অমুক এই কাজ করেছে। যদি অস্বীকার করে, তখন দেখায় এই দেখো তোমার ছবি। ঠিক এই অবস্থা হবে। দুনিয়ার যত মানুষ যত অপরাধ করছে, এই সমস্ত অপরাধের ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। হাশরের ময়দানে সবার ছবি খুলে দেওয়া হবে। দেখো তুমি কি কি কাজ দুনিয়ায় করেছিলে!

ভালো করলেও দেখানো হবে যে, তুমি অমুক এতিমের মাথায় হাত বুলিয়েছিলে। আবার তুমি অমুক এতিমকে ধমক দিয়েছিলে সে ছবিও দেখানো হবে। আরো কত মন্দ কাজ আমরা করি। আমরা তো পাপ নানা রকমের করি। অনেক কঠিন কঠিন বাজে বাজে কাজও আমরা করি। ওই সমস্ত পাপেরও ছবি তুলে রাখা হচ্ছে। তখন কেমন লাগবে ওই ছবিগুলো যদি সামনে পড়ে? সুতরাং খুব হুশিয়ার! পাপকর্ম করতে খুবই সাবধান!

যাই হোক, যদি আমরা ওই দুই গুণ অর্জন করতে পারি তাহলে কত যে নেকী হবে! পদে পদে নেকী! কারণ সারাদিনই তো দুই অবস্থা থাকে। আনন্দের অবস্থাও থাকে আর থাকে কষ্টের অবস্থাও। প্রত্যেক আনন্দের অবস্থায় যদি শুক্‌র করি তাহলে সারাদিন কত ছাওয়াব হবে! যেমন যতবার খাই ততবারই বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। যতবার ছেলের দিকে

তাকাই আর মনে ভালো লাগে, বলব– আলহামদুলিল্লাহ। যতবার আকাশের দিকে তাকাই আর আকাশভর্তি নক্ষত্র দেখি আর সৌন্দর্যে প্রাণটা ভরে যায়, বলব– আলহামদুলিল্লাহ। যতবার পাখার নিচে শুই আর ঠাণ্ডা বাতাসে প্রাণটা জুড়িয়ে যায়, বলব– আলহামদুলিল্লাহ। যখনই গরম কাপড় গায়ে দিই আর শীতটা দূর হয়ে যায়, বলি– আল্‌হামদুলিল্লাহ। যখনই রাস্তায় বের হই আর নিরাপদে নির্বিঘ্নে পথ চলতে পারি, বলব– আলহামদুলিল্লাহ। কোথাও যাওয়ার কথা ছিল সময়মতো পৌঁছে গেলাম, বলব– আলহামদুলিল্লাহ। অনেকদিন একজনের সঙ্গে দেখা হয় না, দেখা হয়ে গেল, খুশিতে মনটা ভরে গেল, বলি– আলহামদুলিল্লাহ।

সারাদিন তো এগুলোই ঘটে। সারাদিন আনন্দের অনেক কিছুই ঘটে। জামাটা গায়ে দিলাম। কত মানুষ জামা পায় না। জামা আল্লাহর নিআমত। গায়ে দিয়ে দেখি খুব ভালো লাগছে। সবাই জামা গায়ে দেয়, আর নিজের দুই কাঁধের দিকে তাকায়, কেমন লাগছে। তখন যেন বলে– আলহামদুলিল্লাহ। জুতা পায়ে দেয় আর দেখে ভালো লাগছে, বলবে– আলহামদুলিল্লাহ। সারাদিনই শত শত বার আলহামদুলিল্লাহ বলার সুযোগ আছে। হাজারও বার আলহামদুলিল্লাহ বলার সুযোগ আছে। যখনই যেই কাজ করি, সে কাজটা ভালো লাগে, নির্বিঘ্নে হয়, সে কাজটা সুন্দর হয়, সে কাজটায় শান্তি পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে যদি বলি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে সারাদিন হাজারে হাজারে নেকী আমলনামায় লেখা হতে পারে।

ঠিক এমনি সারাদিনই অনেক কিছুই এমন ঘটে, যেটা ভালো লাগে না। তখন বিরক্ত হয়ে নানান আজেবাজে কথা বলি। রাস্তায় জ্যাম পড়েছে, রোজই পড়ে। তখন কত ধরনের কথা বলা হয়! ওই সমস্ত না বলে যদি বলতাম– ইন্নালিল্লাহ! কারণ এইটাও তো একটা বিপদ। সময় নষ্ট হচ্ছে, সময়মত আমি পৌঁছতে পারব না, কাজটা সময়মতো করতে পারব না, এ তো একটা বিপদই। আর যদি তখন পড়তে থাকি– ইন্নালিল্লাহ, ইন্নালিল্লাহ, তাহলে সময়টা বেহুদা গেল না। এর ভেতর দিয়ে ছাওয়াব হয়ে গেল। নামতে গিয়ে হোঁচট খেলাম। পা' টা যেভাবে

পড়ার কথা ছিল সেভাবে পড়ল না। সঙ্গে সঙ্গে পড়ি– ইন্নালিল্লাহ। হাঁটতে গিয়ে প্রায় সময় এমন হয়। তখন বলি– ইন্নালিল্লাহ। আজকে পেটটা ভালো লাগছে না, পড়ি– ইন্নালিল্লাহ। মোটকথা প্রতিদিন ইন্নালিল্লাহ পড়ারও অনেক সুযোগ এসে যায়। তো এ সবগুলো বারই যদি ইন্নালিল্লাহ বলি, তাহলে আমলনামায় প্রচুর ছাওয়াব লেখা হবে। আসলে আমরা এগুলোকে তুচ্ছ মনে করি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– কোনও নেকীকে তুচ্ছ মনে করো না, অনেক নেকী আছে যেটা আখিরাতে তোমার অনেক বড় কাজে এসে যাবে। যেমনটা হাদীছেও এসেছে–

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا

কোনও নেকের কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না।[৭৬]

একজনের সঙ্গে হাসি দিয়ে কথা বলা, লোকে ভাবে যে এটা আর কি কাজ! না, এটাও ছাওয়াবের কাজ। হাসি দিয়ে কথা বলাটাও একটা ছাওয়াবের কাজ।

এ জন্যেই ফুযায়ল ইবন ইয়ায রহ. বলেছেন– "একজন লোক সারারাত নফল নামায পড়েও ওই ছাওয়াব পাবে না, যে ছাওয়াব পাওয়া যাবে একটা মজলিসে সকলের সাথে হাসিমুখে কথা বললে।" মজলিসে বসা আছি পাঁচ-সাত জন লোক। সবার সাথে কথা বললাম হাসিমুখে। ফলে সবাই মনে শান্তি পেল। এই মজলিসে যেই ছাওয়াব পাওয়া যাবে, একজন লোক সারারাত নফল নামায পড়ে সেই ছাওয়াব পাবে না। কাজেই হাসি দিয়ে কথা বলাকেও তুচ্ছ মনে করা যাবে না। আমরা এটাকে তুচ্ছ মনে করে থাকি। মুখ ভার করে থাকি। পছন্দের মতো লোক না হলে তার সঙ্গে কথাই বলতে চাই না। ভাবি, ও আমার পজিশনের লোক নাকি, ওর সঙ্গে কী করে কথা বলব! নিজেরও একটা পজিশন আছে!

আহা মানুষ! তোমারও একটা পজিশন আছে। মানুষ কী? মানুষ মলমূত্র, রক্ত ইত্যাদি নাপাকের একটা বোঝা। এছাড়া আর কী?

---

৭৬. সহীহ মুসলিম : ২৬২৬

শরীরের ভেতর রক্ত। এ রক্তও নাপাক। বের হলে ওযু চলে যায়। এই রক্ত যদি না থাকে, মানুষ শেষ। রক্ত যদি শরীরে না থাকে, মানুষ বাঁচবে? বাঁচে না। কিন্তু জিনিসটা কী? নাপাক। বের হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। এই তো তুমি মানুষ। যাতে তুমি বাঁচো আর যা না হলে তুমি মরো সেই জিনিসটাই নাপাক। বের হলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। আর পেটের ভেতরে তো নাপাকির বোঝা। এই মানুষ আবার পজিশন খোঁজে! সে আবার তার মতো লোক না হলে তার সাথে কথা বলে না! আরে সব মানুষই তো তোমার মতো। ওই লোকের শরীরের ভেতর রক্ত, তোমার শরীরেও রক্ত। ওই লোকও মলমূত্র ত্যাগ করে, তুমিও মলমূত্র ত্যাগ কর। ওই লোকের যেভাবে জন্ম হয়েছে, তোমারও সেভাবে জন্ম হয়েছে। তার সাথে তোমার পার্থক্যটা কী? কী ভাব! সহজে কথা বলে না। অথচ তা না করে যদি হাসি দিয়ে কথা বলত– ভাই তুমি কেমন আছ, তাহলে দান-সদাকার ছাওয়াব পেত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَ لَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ

কোনও নেকের কাজকেই তুচ্ছ মনে করো না। এমনকি হাসি দিয়ে কথা বলাটাকেও।[৭৭]

কারণ দেখা যাবে যেটাকে তুমি তুচ্ছ মনে করছ এটি আখিরাতে অনেক কাজের জিনিস। কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন– বান্দা তুমি অমুক দিন এই করেছিলে, অমুক দিন ওই করেছিলে। শুধু পাপ আর পাপ। দেখো, তুমি কি কোনও ভালো কাজই করনি? বলবে– আল্লাহ! তুমি তো জান আমি শুধু পাপ আর পাপ করেছি। আল্লাহ বলবেন, খোঁজো বান্দা খোঁজো, কোনও ভালো কাজ করেছ কি না। আল্লাহ তো সবই জানেন। শেষে বান্দা বলবে, আল্লাহ! আমি আমার দোকানের লোককে বলেছিলাম– কোনও গরীব মানুষ যদি আসে, তাদেরকে ছাড় দিয়ো। গরীব মানুষ আসলে বলে– টাকা নাই পরে দেব। ঠিক আছে পরে

---

৭৭. প্রাগুক্ত

দিক। নগদের জন্য কষাকষি করো না। বলছিল এক তারিখ দেবে, দিতে পারেনি। ঠিক আছে, তাকে আরো দুইদিন বাড়িয়ে দাও। পরে দিক। আমি আমার দোকানের লোকদের বলে রেখেছিলাম, গরীব লোক হলে তাদেরকে ছাড় দিয়ো। আল্লাহ বলবেন– বান্দা! তুমি আমার বান্দা হয়ে মানুষকে এরকম ছাড় দিতে, আমি তোমাকে ছাড় দিতে পারব না? যাও তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিলাম।

কোনও নেক কাজকেই তুচ্ছ মনে করতে নেই। কাজেই এরকম ভাব না ধরে যদি একজন লোকের সাথে হাসি দিয়ে কথা বলা যায়, অসম্ভব কী, হাশরের ময়দানে আল্লাহও আমার সাথে হাসি দিয়ে কথা বলবেন? বান্দা তুমি আমার বান্দাদের সঙ্গে হাসি দিয়ে কথা বলেছিলে, আসো, কোনও চিন্তা করো না। বান্দা, কোনও চিন্তা করো না। এই জান্নাত তো তোমার জন্যই তৈরি করেছি। একদম চিন্তা করো না। তো আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব হাদীছের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। যখনই কোনও কষ্ট হয়, যেন সবর করি, পেরেশান না হয়ে পড়ি, অস্থির-উতলা না হয়ে পড়ি। বরং আল্লাহকেই বলি– আল্লাহ তুমিই কষ্ট দিয়েছ, তুমিই দূর করে দাও। আর মুখে বলি– إنا لله وإنا إليه راجعون। আর যখনই কোনও আনন্দের ব্যাপার দাঁড়ায় তখন উল্লাস না করি। আজকাল আনন্দের ব্যাপার হলেই সবাই উল্লাস করে। একদম ঢাক-ঢোল পিটানো শুরু করে। ওইসব না; আল্লাহর শুক্‌র আদায় করা– الحمد لله পড়া। ইনশাআল্লাহ, এই দুই গুণ আমরা অর্জন করতে পারলে নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ তাআলাকে পেয়ে যাব। এটা আল্লাহ তাআলারই ঘোষণা।

و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



# ধৈর্যধারণের প্রয়োজনীয়তা ও তার সুফল

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ. وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করো। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশূ' (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।[৭৮]

মুহতারাম ভাই–বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

দুনিয়ার জীবনে কত রকম কষ্ট-ক্লেশ আসে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত কষ্ট করেছেন! কিন্তু কখনোই ধৈর্যহারা হননি। সমস্ত দুঃখকষ্ট তিনি খুশিমনে মেনে নিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম কত কষ্ট করেছেন। ওই সমস্ত দেখে দেখে আমাদের শিখতে হবে। আমরা বড় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। কোনওরকম কষ্ট আমরা মানতে

৭৮. সূরা বাকারা : ৪৫

রাজি নই। আমাদের জীবনে আর কিইবা কষ্ট! শুধু অন্যের আনন্দ দেখলে তখন কষ্টবোধ হয়– আহা! অতটা সুখ তো আমার নেই। না হয় আমাদের কিসের অভাব? সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশই তো এমন ছিলেন যে, মাত্র এক পোশাক দিয়ে চলেছেন। এক পোশাক কী? একটা মাত্র লুঙ্গি। গায়ে এ ছাড়া আর কিছু নেই। আমাদের যারা গরীব তাদেরও একেকজনের কত পোশাক। পাঁচ-সাত সেট। পোশাকের কোনও অভাব আমাদের নেই। একেকজনের পাঁচ-সাত জোড়া জুতা। অথচ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক জোড়াই জুতো ছিল, তাও ছিঁড়ে যেত আর তিনি নিজেই সেলাই করতেন। নিজে সেলাই করে করে পরতেন। ফিতা ছিঁড়ে যেত, আবার জোড়া লাগিয়ে পরতেন। পোশাকের কষ্ট, থাকার কষ্ট, খাবারের কষ্ট আবার ওদিকে শত্রুর নির্যাতন। সব রকম কষ্ট ছিল। সে তুলনায় আমাদের কোনও কষ্টই নেই। নিয়মিত খাবার পাচ্ছি। তিন বেলা নয়, আরো বেশি খাচ্ছি। অথচ তাদের রোজ এক বেলা খাবারও ঠিকমতো জুটত না। আর আমরা তিন বেলারও বেশি খাই। আর কত রকামারি খাবার। তাদের তো এমনও হয়েছে, কেবল খেজুর আর পানি, রুটি হলে কেবল শুকনো রুটি। তরকারি সহজে জুটত না। আর আমরা ভাত খাই, তিন-চার রকমের তরকারি থাকে। তাদের ঘর কত ছোট ছোট ছিল যারা হজ্জে গিয়েছেন তারা জানেন। মসজিদে নববীর পূর্বদিকে যে জায়গাটা সেখানেই তাদের ঘর ছিল। ছোট ছোট ঘর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছোট কামরা। অত ছোট কামরা আজকাল আমাদের কারোই হয় না। সবদিক থেকেই তো আমাদের সুখ। তারপরও আমরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। একটু কষ্ট হলেই ধৈর্য হারাই। বলি– এই খাবার খাওয়া যায়! ভাতে যদি গন্ধ হয় বা তরকারিটা খুব সুস্বাদু না হয়, বলে ফেলি এটা খাওয়া যায়? কিংবা খাবারটা স্বাদ হয়নি, বলি– কী রান্না করেছ? মন কই থাকে? এ সমস্ত বলে ফেলি আমরা। আল্লাহর নিআমতের শুক্‌র নেই। হল না হয় একদিন স্বাদটা কম। কিন্তু কত লোক আছে এ খাবারটাও জোটে না। একদিন স্বাদটা মনমতো হয়নি, তো আমরা ধৈর্য হারিয়ে বসি। সব কিছুতেই আমরা ধৈর্য হারাই।

## হযরত খাব্বাব রাযি.-এর সবর

কত কষ্ট করেছেন সাহাবায়ে কেরাম! কাফেররা এমন কোন নির্যাতন আছে যা করেনি?! হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযি.-কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিত। সেই কয়লার আগুনে পিঠ পুড়ে পুড়ে গর্ত হয়ে গিয়েছিল। একদিন উমর ফারূক রাযি. জিজ্ঞেস করলেন– খাব্বাব! তোমাকে মুশরিকরা যে কষ্ট দিয়েছিল তা কেমন ছিল একটু বলতো? হযরত খাব্বাব রাযি. তাঁর পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দিলেন। বললেন, দেখুন। হযরত উমর রাযি. দেখে বলে উঠলেন, এমন পিঠ তো কখনও দেখিনি! সারা পিঠে বড় বড় গর্ত। তিনি বললেন– তারা আমাকে জ্বলন্ত কয়লায় শুইয়ে দিত। সে কয়লার আগুনে পুড়ে আমার পিঠে গর্ত হয়ে গেছে।[৭৯] এরকম কষ্ট অবস্থাতেও খাব্বাব রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে ওদের হাত থেকে নিস্তার দেন। এত নির্যাতন আমাদের করছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– খাব্বাব! এখনই? জানো এর আগের উম্মতদেরকে কাফের-মুশরিকরা কত কষ্ট দিয়েছিল? এমনও হয়েছে যে, লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে আঁচড়িয়ে পিঠের চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে। ধৈর্য ধরতে হবে। আরো ধৈর্য ধরো।[৮০]

হযরত বিলাল রাযি. কত কষ্ট করেছেন! প্রচণ্ড রোদের মধ্যে, গরম পাথরের উপর তাঁকে শুইয়ে রাখা হত। আরেক পাথর দিয়ে তাঁকে চাপা দেওয়া হত। তাও তিনি দীন থেকে এক চুল সরেননি। কষ্ট করেছেন সমস্ত সাহাবী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও। এরপরও সব যুগেই যারা আল্লাহর নৈকট্য চেয়েছেন, সবাই কষ্ট করেছেন। এমন এমন কষ্ট করেছেন, যা শুনলে আমরা হয়রান হয়ে যাব যে, এমন কষ্টও মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব?

---

৭৯. হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/১৪৩

৮০. সহীহ বুখারী : ৩৬১২

# হযরত আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আর-রমলী রহ.-এর ঘটনা

হযরত আহমাদ ইবন হাম্বল রহ.-এর ঘটনা তো আমরা সবাই জানি। এমন আরো আছে। আবূ বকর মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আর-রমলী। তাকে মিশরের শিয়া শাসক অনেক কষ্ট দিয়েছে। শুনলেও আতঙ্কিত হই। সুবহানাল্লাহ! এমন নির্যাতনও মানুষ মানুষকে করতে পারে? ওরা শিয়া। আমরা শিয়াদেরকে সাধারণভাবে মুসলমান মনে করি। আসলে শিয়া মুসলমান নয়। যারা আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-কে গালাগাল করে, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-কে গালাগাল করে, এদেরকে যারা গালাগাল করে এরা আবার কিসের মুসলমান?

একবার মুহাম্মাদ ইবন আহমাদকে পাকড়াও করল মিশরের শিয়া শাসক। তারপর যা চাবুক মারার তা তো মেরেছেই, শেষে এক ইহুদীকে লাগিয়ে দিল। বলল, এর গায়ের চামড়া তুলে ফেলো। ইহুদী তার মাথার চামড়া খোলা শুরু করেছে। ছুরি দিয়ে ছাগলের চামড়া যেভাবে ছাড়ায়, এভাবে চামড়া ছাড়ানো শুরু করেছে। আর উনি ধৈর্যের সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করছেন। 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' করছেন আর বলছেন–

كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

এ কথা (তাকদীরের) কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে।[৮১]

যাই ঘটে তা সবই তাকদীরে লেখা আছে। তাকদীরে যা লেখা আছে তা-ই হবে। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য (তাকদীরে) যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনও কষ্ট আমাদেরকে

৮১. সূরা বনী ইসরাঈল : ৫৮

কিছুতেই স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহরই উপর মুমিনদের ভরসা করা উচিত।[৮২]

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন, এর বাইরে কিছুই ঘটবে না। আমার তাকদীরে এটা লেখা ছিল, তাই ঘটছে। এছাড়া মুখে তিনি আর কোনও কথা উচ্চারণ করেননি।

মাথা থেকে চামড়া ছাড়ানো শুরু করেছে। মাথার চামড়া খুলে ফেলেছে। চেহারার চামড়া খুলে ফেলেছে। ওদিকে তিনি একই কথা বলছেন–

كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا

এরপর গলা থেকে নেমে বুকের চামড়া তুলে ফেলেছে। আর মিশরের শাসক মজা পাচ্ছে। ভাবুন দেখি, শিয়াদের আমরা মুসলমান মনে করি। সে শিয়া একজন মুসলমানকে নির্যাতন করার জন্য এক ইহুদীকে লাগিয়ে দিয়েছে। আর ইহুদী তো মুসলমানের সবসময়কার শত্রু। শেষে সে ইহুদীরও মায়া লেগে গেছে। এ কী নির্যাতন! এটা কেমন নির্যাতন! একটা জ্যান্ত মানুষের চামড়া তুলে ফেলা! যখন বুকের চামড়াও এভাবে ছুলে ফেলেছে, তখন ইহুদীরও মায়া লেগে গেছে– এ লোককে আর কত নির্যাতন করব! তখন সে ছুরি তার বুকে ঢুকিয়ে হৃদপিণ্ড ভেদ করে ফেলেছে, যাতে করে আর কষ্ট না হয়, সহজে মরে যায়। সহজে মারার জন্য আর চামড়া না খুলে ছুরি তার হৃদপিণ্ডে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরপর তিনি ইন্তিকাল করেছেন।[৮৩]

এতকিছুর পরও তিনি বলেননি– আল্লাহ! এ তোমার কেমন বিচার! আমরা তো একটু হলেই বলি, এ কেমন বিচার! আল্লাহ দেখে না এগুলো?! আমরা নানা কথা বলি। কাফের-বেঈমান কত আরামে আছে, আর আমাদের কত কষ্ট! একবারও নামায পড়ে না, পশ্চিম দিকে ফিরে দেখেনি, আর কী আরামে জীবনযাপন করছে। এ জাতীয় কথা আমরা মাঝেমধ্যেই উচ্চারণ করি। ধৈর্য ধরতে হবে। যারাই আল্লাহওয়ালা, তারা সবসময়েই সকল দুঃখকষ্ট হাসিমুখে বরণ করেছেন।

---

৮২. সূরা তাওবা : ৫১

৮৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৬/১৪৮

## সবরে ছাওয়াব ও কষ্ট লাঘব

মুমিনের জন্য তো এটা ভালো। বিপদ-আপদ যদি হয়, এটা মুমিনের জন্য ভালো। কারণ যে কোনও কষ্ট মুমিনের দেখা দেয়, তাতে হয় তার গুনাহ মাফ হয় আর না হয় তার আমলনামায় ছাওয়াব লেখা হয়। গুনাহ যদি থাকে তাহলে গুনাহ মুছে ফেলা হয়, আর গুনাহ না থাকলে আমলনামায় ছাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। এমনকি একটা কাঁটাও যদি ফুটে, তাতেও তার আমলনামায় ছাওয়াব লিখে দেওয়া হয়। ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্য না ধরলে ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। ধৈর্য ধরলে সব দিক থেকেই ফায়দা। বিপদ-আপদে দুঃখে-কষ্টে সব কিছুতেই যদি ধৈর্য ধরা যায়, তাহলে লাভ আর লাভ। যদি আমরা অস্থির হয়ে পড়ি, তাতে বিপদ যে দূর হবে তা তো নয়।

একবার একজন বলছিল, কী গরম! যার সামনে বলেছিল, তিনি আল্লাহওয়ালা ছিলেন। আমার নাম মনে নেই। ঘটনা আমি পড়েছি। সত্য ঘটনা। সে যখন বলল, 'কী যে গরম!' এ কথা বলতেই সে বুযুর্গ বললেন– যে কথা বললে, এতে গরমটা কমে গেছে? কমেনি যখন, তখন শুধু শুধু বলে কী লাভ! ঋতু সব রকমেরই হয়। কখনো গরম আবার কখনো শীত। কখনো বৃষ্টি আবার কখনো অনাবৃষ্টি। আল্লাহর যখন যা ফায়সালা তাই হয়। আমার কর্তব্য আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়া। তাহলে তুমি এ গরমের মধ্যেও ছাওয়াব পাবে। যদি তা না বলে গরম সহ্য করতে, তাহলে ছাওয়াব পেতে। 'এ কী গরম' বলে তুমি তো ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হলে। গরমও দূর হল না, আর এতে কষ্টও বেশি বোধ হয়। যদি মনে করা হয় এটা আল্লাহর ফায়সালা, তাহলে কষ্ট সহ্য করতে মন প্রস্তুত হয়ে যায়। আর যে কাজে মন প্রস্তুত হয়ে যায়, সে কাজ আসান হয়ে যায়। এটা দুনিয়ার নিয়ম। যে-কোনও কাজ, যদি মন সে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন সে কাজ সহজ হয়ে যায়। আর মন যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহলে সে কাজ আরো বেশি কঠিন বোধ হয়। যদি মনে করি এটা আল্লাহর ফায়সালা, মানুষ তো আরো বেশি কষ্ট করে, তার মন প্রস্তুত হয়ে গেছে, তখন কষ্ট বড় কম বোধ হবে।

গরমের কষ্টটা কম বোধ হবে। আর তা না হলে শুধু অস্থিরতাই বাড়বে, কষ্ট বেশি হবে। ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। আর উল্টাপাল্টা কথা বললেই তো গুনাহ হবে।

এমন সকল ক্ষেত্রেই। ওই যে বললাম, তরকারির একটু স্বাদ কম হয়েছে আর ক্ষেপে গেল– কী রান্না কর? কোথায় থাক? এ কথা না বলে যদি মনে করে, এটা আল্লাহর নিআমত, কত মানুষ আরো কত সাধারণ খাবার খেয়ে থাকে, আমি তো নিত্যদিনই মজার খাবার খাই, আজ না হয় একটু অন্যরকম হলই, তাহলে এ খাবারটা বিস্বাদ লাগবে না। ব্যস, তাহলে আসান হয়ে গেল। কী রান্না কর, খাওয়া যায়, এসব বললে তো কষ্ট হবে আরো বেশি। খেতে তো হবে। আর যদি না খাই তাহলে ক্ষুধার কষ্ট করতে হবে। না খেলে ক্ষুধার কষ্ট। আর যদি খায় অরুচি নিয়ে, তাহলে খেতে বেশি কষ্ট হবে। আর যদি আল্লাহর নিআমত মনে করে খাই, তাহলে বিস্বাদ কমে যাবে। স্বাদ লাগবে। খাওয়াটা আসান হয়ে যাবে। সবর করলে সব জায়গাতেই আরাম।

সবর করলে পারিবারিক জীবনেও আরাম হয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্ক ভালো থাকে। আমরা এ মাহফিল শুরু করেছি মূলত আমাদের মা-বোনদের উদ্দেশ্যে। তাদের দীনের কথা শোনবার সুযোগ কম।

## সব আশা পূরণের জায়গা কেবলই জান্নাত

অনেক সময় মা-বোনেরা বাসায় খুব অস্থির হয়ে যায়, ধৈর্যহারা হয়ে যায়। হয়তো কোনও কষ্ট দেখা দিয়েছে, স্বামী তার এ আশা মেটাতে পারছে না, তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারছে না, ফলে তার মনে কষ্ট। তখন যদি মনে করে যে, সব মানুষের সব আশা পূরণ হয় না, দুনিয়া এমন এক জায়গা, যেখানে সকলের সব আশা পূরণ হয় না, দুনিয়া সমস্ত আশা পূরণের জায়গাও নয়; সমস্ত আশা পূরণের জায়গা হল জান্নাত, তবে কষ্ট-অস্থিরতা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। জান্নাতই হল সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের একমাত্র জায়গা। আল্লাহ তাআলা বলছেন–

نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ

আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের সাথী ছিলাম এবং আখিরাতেও থাকব। জান্নাতে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই, যা তোমাদের অন্তর চাবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আছে এমন সব কিছুই যার ফরমায়েশ তোমরা করবে।[৮৪]

জান্নাত এমন এক জায়গা, যেখানে তোমরা যা কামনা কর তাই পাবে। মনে মনে যা কামনা কর তাও পাবে। মুখে যখন যা আনতে বলবে তা হাজির হয়ে যাবে। এটা আল্লাহ তাআলা পক্ষ থেকে আতিথেয়তা। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনও কিছুরই অভাব নেই। আর জান্নাতেও আল্লাহ তাআলা কোনও কিছুরই অভাব রাখবেন না। মনের সমস্ত আশা পূরণের জায়গা হল জান্নাত। বরং সেখানে আল্লাহ তাআলার আশার বাইরেও দেবেন। মানুষের চাহিদার বাইরেও দেবেন। আল্লাহ বলছেন–

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

আমার কাছে আরো আছে।[৮৫]

মানুষ যা চায় তার অতিরিক্ত আল্লাহ তাআলা দেবেন। আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দেবেন । আল্লাহ বলবেন, বান্দা! চাও। বান্দা চাবে। চাইতে চাইতে একসময় তার আর চাওয়ার কিছু থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আরো চাও। বান্দা বলবে, কী আর চাব? আমার সমস্ত চাওয়া শেষ। এরপর আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দেবেন– এটা চাও, ওই জিনিস চাও, সেটা চাও। আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দেবেন। সে চাইতেই থাকবে। এরপর আল্লাহ বলবেন, এ যা কিছু তুমি চাইলে, এ সমস্তই তোমাকে দেওয়া হল এবং এর আরো দশগুণ দেওয়া হল।

---

৮৪. সূরা হামীম সাজদা : ৩১

৮৫. সূরা কাফ : ৩৫

# দুনিয়া সব ইচ্ছা পূরণের জায়গা নয়

সমস্ত ইচ্ছা পূরণের জায়গা হল জান্নাত। দুনিয়ায় এমন কোনও মানুষ নেই, যার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেছে। অসম্ভব! হতেই পারে না। একজনে চায়, আমার যেন অনেক টাকা পয়সা হয়। চায় তো দুনিয়ার সব। কিন্তু যত চায় তত পায় না। এরপর টাকা-পয়সা না হয় পেলই, কিন্তু দেখা যাবে তার স্বাস্থ্য ভালো নেই। টাকা-পয়সাও অনেক, কোনও অসুখ-বিসুখ কখনোই হয় না, এমন নেই। টাকা-পয়সা অনেক, কিন্তু রোগের কারণে মন যা চায় তা খেতে পারে না। ডায়বেটিস হয়ে বসে আছে। এখন মিষ্টি খাওয়া নিষেধ। মিষ্টি খেতে অনেক মন চায়, কিন্তু খেতে পারে না। আমের মৌসুম চলছে। মিষ্টি মিষ্টি আম। যাদের ডায়বেটিস রোগ আছে তারা খেতে পারে না। হয়তো রোজ একটাই খেল একবার, এরপর আর খেতে পারবে না। ডাক্তারের নিষেধ। খেলে ডায়বেটিস বেড়ে যাবে। টাকার অভাবে নেই। আর বাজারে আমের অভাব নেই। কিন্তু সে খেতে পারছে না। জগতে কারোই সব আশা পূরণ হয় না।

সব ঠিক আছে, টাকাও অনেক আছে, স্বাস্থ্যও অনেক ভালো, কিন্তু ছেলেমেয়ে মনমতো হয়নি। একমাত্র ছেলে চরম বেয়াদব। বাবার সঙ্গে বেয়াদবি করে। তাহলে কী হল? সে তো কামনা করেছিল সব দিকের সুখ। কিন্তু সব দিকের সুখ পায়নি। ছেলে মনমতো নয়, ছেলে কথা শোনে না। কিংবা মেয়ে কথা শোনে না। হয়তো ছেলেমেয়ে কথা মানে, কিন্তু স্ত্রী কথা শোনে না। কিংবা এমন যে, স্বামী কথা শোনে না। স্বামী ঘরে থাকে না। বাইরে বাইরে ঘুরে। টাকার অপচয় করে। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না যে, সে কোথায় আছে। কিন্তু স্ত্রী নেককার। সে আল্লাহর কাছে কাঁদে– হে আল্লাহ! তুমি আমার স্বামীর মন ঘুরিয়ে দাও। দুআ করে। এদিকে স্বামী শুধু বাইরে বাইরে ঘোরে। তার ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদের পেছনে ঘোরে। মানুষের সব আশা পূরণ হয় না কোনওদিন। মানে এক জায়গায় না এক জায়গায় অভাব রয়ে গেছে। আমরা দূর থেকে মনে করি, ওই লোক কত সুখে আছে!

নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস

নদীর এপার বলে, ওই পারে সব রকমের সুখ আছে। আমার বিশ্বাস হল– সব দুঃখ এপাশেই। ওই পারে কোনও কষ্ট নেই। ওখানে সব সুখ।

নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলই ওপারে

কিন্তু নদীর ওইপারও একই আফসোস করে। আহা! আমার এদিকে কত কষ্ট, কত দুঃখ! কোন সুখ পাই না। সব সুখ ওই পারে। আমি মনে করছি ওই লোক কত সুখে আছে। কত টাকা! কী সুন্দর বাড়ি! কত দামী গাড়ি! যখন যেখানে মনে চায়, যেতে পারে। মনে চাইল– আমেরিকা ঘুরে আসি, ঘুরে আসে। কিংবা সে নেককার, মনে চাইল হজ্জে যেতে, হজ্জে চলে গেল। প্রতি বছর উমরায় যায়। ওই লোকের কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু সে লোকও বলে, আমি হজ্জে আসছি, উমরা করছি সব ঠিক, কিন্তু আমার কত কষ্ট! আমি ঠিকভাবে খেতে পারি না। ঘুমাতে পারি না। রাত্রে ঘুমাতে পারি না। যাদের রাতের ঘুম হয় না, খোঁজ নিয়ে দেখেন কী কষ্ট হয়। রাত আর পার হয় না। শুয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে। ছয় ঘন্টার রাত মনে হয় বিশ ঘন্টা। রাত আর পার হয় না। কী কষ্ট তাদের। যদি কারো ঘুম না আসে সে জানে।

কত লোক আছে বছরের পর বছর ঔষধ খেয়ে ঘুমায়। অনেকে আছে, ঔষধেও কাজ হয় না। ঔষধ খায়, তাও ঘুম আসে না। তাদের কত কষ্ট! সে লোক বলে, আহা! আমার কত কষ্ট। হজ্জ করি, উমরা করি সে তো ঠিক আছে, কিন্তু ঘুমাতে পারি না। আর ওই লোক গরীব মানুষ, কিন্তু কী মজা করে ঘুমায়! রিকশার হুড ফেলে ভেতরে ঘুমিয়ে আছে। আর সে দামী বিছানায় ঘুমাতে পারে না। পঞ্চাশ হাজার টাকার বা লাখ টাকার খাট। কত দামী বিছানা। কিন্তু তার ভেতর ঘুমাতে পারে না। আর ওই লোক রিকশার হুড ফেলে তার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। রাস্তায় ফুটপাতে সে ঘুমিয়ে আছে। সকালবেলায় দেখা যায়, এমন কত মানুষ ঠেলাগাড়ির মধ্যে আরামে ঘুমাচ্ছে! মনে হয়, ওই লোকের মতো

সুখ আর কারো নেই। ওই টাকাওয়ালা বলছে– আমার কত কষ্ট! ওই লোকের মতো সুখ কারো নেই। আমার কাছে মনে হয় সে সুখে আছে, আর তার কাছে মনে হয় আমি সুখে আছি। ইহকালে কারোই সকল আশা পূরণ হয় না। কাজেই যে জিনিস নেই, যে জিনিস পাইনি, তা নিয়ে আফসোস নয়; তার জন্য দরকার সবর করা। যদি সবর করি, তাহলে এই 'নাই' এর কষ্ট অন্তর থেকে দূর হয়ে যাবে। জীবন সুখের হয়ে যাবে।

## সুখী হওয়ার দুটি উপায়

জীবনে সুখ লাভের উপায় দুটি জিনিস। এক হল সবর, আরেক হল কানাআত বা অল্পেতুষ্টি। সবর আর অল্পেতুষ্টি যার আছে, তার মতো সুখী জগতে আর কিছু নেই। অসুখ, দাঁতে রোগ। কয়দিন পরপরই ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে। যাদের দাঁতে রোগ আছে, তারা জানে এটা কত কষ্টের জিনিস। যাদের রুট ক্যানাল করা লাগে তাদের অনেক কষ্ট হয়। এটা অনেক কষ্টের কাজ। দাঁতের ব্যথায় সারা শরীর ব্যথা হয়ে যায়। মাথা ব্যথ্যা, চোখে ব্যথা সব জায়গায় ব্যথা করে। কষ্টের শেষ নেই। ঠিক আছে, অনেক কষ্ট। কিন্তু আমি যদি সবর না করি, তাহলে এ কষ্ট কি লাঘব হবে? আমি যদি ব্যথায় আফসোস করি আর বলি, সব কষ্ট আমার, সমস্ত দুঃখ আমার, ওই লোকের দাঁতে কোনও ব্যথা নেই, কী সুখে আছে, তাহলে আমার কষ্ট কি একটুও কমবে? তার দাঁতে না হয় ব্যথা নেই, কিন্তু অন্য কোনও রোগ-শোক তো আছে!

এক লোকের পেটে ব্যথা। সে লিফটে উঠছে, ডাক্তারের চেম্বারে যাবে। ঠিক ওই সময় আরেক রোগী হুইল চেয়ারে করে উঠছে। তাকে উপরে নেওয়া হচ্ছে এবং তার ওপেন হার্ট সার্জারি হবে। তার সমস্যা হার্টে। আর ওপেন হার্ট সার্জারি তো অনেক ঝুঁকির। অনেক লোক এতে মারাও যায়। তখন যার পেটে ব্যথা তাকে তার সঙ্গী বলল, দেখো এ লোকের কত কষ্ট! এই যে অপারেশন হবে, সে বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে। কিন্তু এ লোকের তো ধৈর্য নেই। সে বলল, তাতে কী হয়েছে, এ লোকের

তো পেটে ব্যথা নেই! সে তার পেটে ব্যথাই দেখল, ওই লোকের যে হার্টের সমস্যা এবং মারাও যেতে পারে, সে জিনিস দেখল না। আর না দেখার কারণেই সে শুক্‌র আদায় করতে পারছে না। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দিয়েছেন, বলো–

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَهُ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

আল্লাহর শুক্‌র, যিনি ওই ব্যক্তিকে যাতে আক্রান্ত করেছে, আমাকে তা থেকে মুক্ত রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর বহু মাখলুকের উপর বিভিন্নভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।[৮৬]

আল্লাহর শুক্‌র, ওই লোকের যে কঠিন রোগ, সে কঠিন রোগ আল্লাহ তাআলা আমাকে দেননি। আমাকে দিলে আমার কী দশা হত! এ ক্ষেত্রে তো শুক্‌র আদায় করার কথা যে, ওর এত কঠিন রোগ, আমার রোগ তো তার চেয়ে অনেক সহজ। তা নয়; সে কেবল নিজেরটাই দেখছে। যদি সে ধৈর্য ধরত, তাহলে তার কষ্ট কম হত, আবার সে ছাওয়াবও পেত, গুনাহ মাফ হত, আর আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ হত।

## সবরে উচ্চ মর্যাদা লাভ

এক হাদীছে আছে– অনেক সময় এমন হয়, আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য উচ্চ মর্যাদা নির্দিষ্ট করেন। আল্লাহ তাআলা তাকে এত উচ্চ মর্যাদা এত উচ্চ মাকাম দান করবেন, কিন্তু বান্দা নিজ আমল দ্বারা সেখানে পৌঁছতে পারে না। ওই জায়গায় পৌঁছার জন্য, জান্নাতের উঁচু স্তরে পৌঁছার জন্য যত আমল দরকার, অত আমল সে করতে পারছে না। কিন্তু আল্লাহ চান তাকে সে জায়গায় পৌঁছাবেন। এখন সে কীভাবে পৌঁছবে? আল্লাহ তাআলা তখন তাকে বিপদ-আপদ দেন, বালা-মুসীবত দেন, অসুখ-বিসুখ দেন আর তাতে তাকে ধৈর্য দেন। সে ধৈর্য

৮৬. সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮৯২

ধরে আর বলে, আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন, মানুষের আরো কত কষ্ট, আমি যদি ধৈর্য ধরি তাহলে ছাওয়াব পাব। এ চিন্তা করে সে ধৈর্য ধরে আর এর ফলে এ অসুখ-বিসুখ ও বালা-মুসীবত দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে ওই মর্যাদায় পৌঁছে দেন।[৮৭]

জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য একটা উপায় এ বালা-মুসীবত। কাজেই বালা-মুসীবত তো আল্লাহ তাআলার নিআমত। নেককার যারা, তারা এটাকে নিআমতই মনে করে। যে-কোনও দুঃখকষ্ট আসে, আল্লাহর প্রিয় বান্দা যারা, তারা মনে করে এটা আল্লাহ তাআলার দান, এটা আল্লাহ তাআলার নিআমত। তখন সে এতে সবর করে, ধৈর্য ধরে।

এর মানে এই নয় যে, সে ভালো হওয়ার জন্য দুআ করবে না। না, বরং সুস্থ হওয়ার জন্য দুআ করবে। নিআমত তো এজন্য যে, সে মনে করবে– সব সময় তো আল্লাহকে স্মরণ করি না, এখন একটা বিপদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহর সামনে হাত তোলার সুযোগ হল। কাজেই এটা নিআমত হল। এ অসিলায় আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে পারছি। দুআও তো ইবাদত। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা একটা ইবাদত। তো এ অসুখের কারণে সে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছে– হে আল্লাহ! তুমি আমার এ মুসীবত দূর করে দাও। তাহলে মুসীবতের কারণে সে একটা ইবাদত করল। বালা-মুসীবত দেখা দিলে তা দূর করার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করতে হবে। আল্লাহ চান, বালা-মুসীবতের অসিলায় বান্দা আমার কাছে হাত তুলুক, আমার অভিমুখী হোক, আমার দিকে রুজু করুক, আমার কাছে ফিরে আসুক। বান্দাকে তাঁর কাছে টেনে নেওয়ার জন্য আল্লাহ এমন একটা বাহানা হিসেবে দিয়ে থাকেন।

رحمت حق بہانہ می جوید

আল্লাহ নানা বাহানায় বান্দাকে নিজের দিকে টানেন। এটা একটা বাহানা। একটা রোগ দেন, বিপদ দেন, তারপর দেখেন এ অসিলায়

---

৮৭. সুনানে আবূ দাউদ : ৩০৯০; মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৩৮

বান্দা তাঁর দিকে ফিরে আসে কি না। বান্দা তাকে স্মরণ করে না। সে শুধু দুনিয়া নিয়ে মাতামাতি করছে। নিজের বাড়ি নেই, কীভাবে বাড়ি করা যায়, একটা বাড়ি আছে, আরো দামী বাড়ি কীভাবে করা যায়, গাড়ি নেই, কীভাবে গাড়ি কেনা যায়, নানা রকমের দুনিয়াবী ধান্দায় সে থাকে। আল্লাহকে স্মরণ করে না। তখন আল্লাহ বিপদ দেন যে, দেখি! এ অসিলায় বান্দা আমার কাছে ফিরে আসে কি না। তাহলে তো এটা নিআমত হল। বিপদ দিয়ে আল্লাহ তাঁর দিকে টানছেন, তাঁর দিকে ঘুরাচ্ছেন। যদি সে এটাকে নিআমত মনে করে, তাহলে কষ্ট আসান হবে। দুনিয়ার সব রকম কষ্ট আসান হয়ে যায় ধৈর্য ধরলে। এজন্য আল্লাহ বলছেন–

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

এবং সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ করো। সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়, কিন্তু তাদের পক্ষে (কঠিন) নয়, যারা খুশূ' (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়)-এর সাথে পড়ে।[৮৮]

তোমরা আল্লাহর সাহায্য চাও ধৈর্যের মাধ্যমে এবং নামাযের মাধ্যমে। যদি বিপদ-আপদে ধৈর্য ধর, আল্লাহ সাহায্য করবেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য লাভ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।[৮৯]

আল্লাহ ধৈর্যশীলের সঙ্গে। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তার সঙ্গে। আল্লাহ যার সঙ্গে আছেন তার আবার কী চাই? আমরা এখানে ঘুরি, ওখানে ঘুরি, অমুককে ধরি,তমুককে ধরি, কিন্তু আসল জায়গায় যাই না। যাকে ধরা দরকার, তাকে ধরি না। বিপদ হলে নানা জনকে বলি।

---

৮৮. সূরা বাকারা : ৪৫

৮৯. সূরা বাকারা : ১৫৩

কষ্ট হলে নানা জনকে বলে বেড়াই। যাকে বলা উচিত তাকে বলি না। যদি অসুখ-বিসুখ হয় আর মানুষের কাছে বলে বেড়াই, তখন আল্লাহ বলেন– ঠিক আছে! যাদের কাছে বলে বেড়াচ্ছ, আমি তাদের হাতে তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তারা তোমার অসুখে আরোগ্য দিক। তোমার বিপদ তারাই দূর করুক।

## বালা-মুসীবতে দুআ করা ও তার সুফল

বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ মানুষকে বলা দু' রকম। এক বলা হল এজন্য যে, সে দুআ করবে। ভাই এ মুসীবতে আছি, তোমার কাছে দুআ চাই। এ তো ভালো। আরেক হল কেবলই নিজের আফসোস আক্ষেপ প্রকাশ করা যে, দেখো আমার কত কষ্ট। যদি কেবল আক্ষেপ প্রকাশ করার জন্য সে অন্যকে জানায়, তখন আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, তুমি যাদেরকে জানিয়েছ, তারা তোমাকে ভালো করুক, তারা তোমার বিপদ দূর করুক। আর এ রকমের প্রচার না করে যদি আল্লাহকে বলে, আল্লাহর দিকে রুজু করে– হে আল্লাহ! তুমি এ বিপদ দিয়েছ, তুমি এটা দূর করতে পার, তখন আল্লাহ তাআলা হয় নগদ তার বিপদ দূর করে দেন কিংবা তা দূর না করে তিনি এটাকে জমা রাখেন আর এর বিনিময়ে তার আখিরাতের বিপদ দূর করে দেন অথবা এর মাধ্যমে দুনিয়াতেই তার অন্য বড় কোনও বিপদ দূর করে দেন। আসলে আমার জন্য কোনটা কল্যাণ তা আমি জানি না, আল্লাহ তাআলাই জানেন। আমার সম্পর্কে আমার চেয়ে আল্লাহ তাআলা অনেক বেশি জানেন। অনেকে বলে, এত দুআ করছি, বিপদ তো দূর হচ্ছে না। এরকম কথা বলা উচিত না। 'এত দুআ করলাম, আল্লাহ শোনেন না' এটা বলা ভুল।

আল্লাহ ঠিকই শোনেন। কিন্তু আমি চাই আমার বুদ্ধি অনুযায়ী আর আল্লাহ দেন তাঁর জানা অনুযায়ী। আল্লাহ তাআলা জানেন যে, আমি যা চাই তার চেয়েও বেশি দরকার আরেকটা জিনিস। আমি চাই আমার এ বিপদ দূর হোক এবং এটাই আমার জন্য বেশি মঙ্গল। আর আল্লাহ জানেন, তার বেশি মঙ্গল হবে তার ছেলেরা যদি নামাযী হয়ে যায়। তো

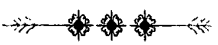
দেখা যায়, এতদিন যে ছেলে নামাযই পড়ত না, সে ছেলে নামাযী হয়ে গেছে। সে আল্লাহর কাছে বলছে, আল্লাহ! আমার বাবার এত কষ্ট! সে নামায পড়ে আর দুআ করে। এতদিন নামাযের ধারেকাছেও আসেনি। কিন্তু বাবার যেই বড় রকমের অসুখ হয়ে গেল, তখন ছেলে নামাযী হয়ে গেল। আল্লাহ আমার বিপদ দূর না করে, আমার ছেলেকে নামাযী বানিয়ে দিয়েছেন। আমার তো ওইটা বেশি দরকার। এ বিপদে আমি একটু কষ্ট করলাম। দুদিনের দুনিয়ায় একটু কষ্ট করলাম। কিন্তু আমার ছেলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে গেল। ওইটা তো আমার জন্য বেশি মঙ্গল। আল্লাহ তাআলা দেন আমার জন্য যেটা বেশি কল্যাণকর সে অনুযায়ী। কাজেই এ কথা বলা ঠিক না যে, এত এত দুআ করলাম, সুতরাং কবুল হল না। দুআ অবশ্যই কবুল হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দেন তাঁর জানা অনুযায়ী।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

যারা সবর অবলম্বন করে তাদেরকে তাদের ছাওয়াব দেওয়া হবে অপরিমিত।[৯০]

আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলকে দেন বিনা হিসাবে। ধৈর্যের প্রতিদান দেন সমস্ত হিসাব-নিকাশের বাইরে। ওইটাই তো আমাদের দরকার। কাজেই আমার যে জিনিসের অভাব আছে, টাকার অভাব হোক, স্বাস্থ্যের অভাব হোক, কিংবা ছেলে-মেয়ে মনমতো না হোক, ধৈর্য হারালে চলবে না। স্বামী মন-মতো নয়, স্ত্রী মন-মতো নয়, প্রতিবেশী মন-মতো নয়, যে রকমের কষ্ট হোক না কেন, ধৈর্যহারা না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা দুনিয়াতেও শান্তি পাব এবং তা আমার আখিরাতের নাজাতের কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকেই ধৈর্যের সঙ্গে জীবনযাপনের তাওফিক দান করুন। আমীন।



৯০. সূরা যুমার : ১০



# সুখের সংসার গড়তে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الله مع الصابرين . صدق الله العظيم .

মুহতারাম ভাই–বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীছে বলা হয়েছে, ধৈর্যধারণ করা এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। মুসলিম জাতির বিশেষ গুণ।[৯১] যেহেতু ধৈর্য ধরা মুসলিম জাতির বিশেষ গুণ, তাই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য সর্বাবস্থায় ধৈর্যের প্রতি লক্ষ রাখা, কোনও অবস্থাতেই ধৈর্য না হারানো। বিশেষভাবে পারিবারিক জীবনে। দাম্পত্য জীবনে ধৈর্যধারণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। একটি পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাই গড়ে ওঠে। এই পরিবারে সুখ-শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করে ধৈর্যধারণের উপর। স্বামী–স্ত্রী, বাবা–মা প্রত্যেকের বিশেষভাবে লক্ষ রাখা দরকার যাতে কোনও অবস্থাতেই তাদের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে।

---

৯১. মুসনাদে আহমাদ : ২৬৯১৯; মুস্তাদরাকে হাকেম : ১২৩৬

কিন্তু এই দিকে আমাদের পুরুষ ও নারীরা লক্ষ রাখে না। ফলে দাম্পত্য জীবনে নানান কলহের সৃষ্টি হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুসন্তান গড়ে উঠে তাদের বাবা-মায়ের আদর্শ জীবনের ভিত্তিতে। যেই সন্তানের বাবা-মা আদর্শ, তাদের সন্তান স্বাভাবিকভাবেই সুসন্তানরূপে গড়ে ওঠে। তাদের গড়ে তোলার পেছনে খুব বেশি মেহনত করতে হয় না। বাবা-মায়ের দেখাদেখিই তারা গড়ে ওঠে। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম তো থাকেই। নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ছেলে বেঈমান ছিল। ব্যতিক্রম সব জায়গায় থাকে। এটা পরীক্ষা। যেখানে ব্যতিক্রম হয় সেটা পরীক্ষাস্বরূপ হয়ে থাকে। নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে যে বেঈমান ছিল, এটা নূহ আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ তাআলার অনেক বড় পরীক্ষা ছিল। সে পরীক্ষায় তিনি পাশ করেছেন। এ ঘটনা কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে। তো সেটা ব্যতিক্রম । না হয় সাধারণত লক্ষ করা যায়, বাবা-মা আদর্শ হলে তাদের সন্তান স্বাভাবিকভাবেই ভালো হয়ে যায়। তাদের ভালো করার জন্য মেহনত খুব বেশি লাগে না। তো আদর্শ বাবা-মা হওয়ার জন্যে একটা বড় গুণ হল সবর, ধৈর্য। ধৈর্য ধরতে হবে বাবাকেও, ধৈর্য ধরতে হবে মা'কেও। ধৈর্য ধরতে হবে স্বামীকেও, ধৈর্যধারণ করতে হবে স্ত্রীকেও।

## স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের উচিত অন্যজনের চিন্তা-ভাবনার মূল্যায়ন করা

পারিবারিক জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যায়, এমন অনেক পরিস্থিতি দেখা যায়, যখন স্বামীর কিংবা স্ত্রীর রাগ উঠে যায়। স্বামীর দ্বারা এমন কিছু হয়ে যায়, যেটা স্ত্রীর পছন্দ নয়। কিংবা স্ত্রীর দ্বারা এমন কিছু হয়ে যায় যা স্বামীর পছন্দ নয়। এখন ওই ক্ষেত্রে যদি দু'জনই রাগারাগি শুরু করে দেয়, তাহলে এই পরিবারের শান্তি কীভাবে বজায় থাকতে পারে? একজনের কাজ সবটাই যে আরেকজনের পছন্দ হবে তা কখনো সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন

এরকম– প্রত্যেকের মেজায-মর্জি, চিন্তা, রুচি-অভিরুচি আলাদা। একজনের রুচি আর বাকি সবার মতো নয়, একশভাগ নয়। অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে, কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অমিলও আছে। স্বামী যেই চিন্তা করে, স্ত্রীও যে সব ব্যাপারে একই চিন্তা করবে তা নাও হতে পারে। এমনিভাবে স্ত্রী যা চিন্তা-ভাবনা করে, স্বামী সবসময় সেই একই চিন্তা করবে তা নাও হতে পারে। সুতরাং স্ত্রীর কোন চিন্তা যদি স্বামীর চিন্তার সঙ্গে না মেলে, তখন স্বামীর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠা উচিত নয়। উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়। লক্ষ করতে হবে– আমার স্ত্রী যে চিন্তা করছে, সে চিন্তা সঠিক না বেঠিক? যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে খুশিমনে তা মেনে নেওয়া উচিত। গো ধরা উচিত নয়– আমি স্বামী, সে স্ত্রী, এখানে তার নাক গলানো কেন, সে কী বোঝে? এরকম চিন্তা করা ভুল। এটা অহমিকা। অন্যকে তাচ্ছিল্য করা অহংকারের আলামত। সত্য-সঠিক কথা না মানাও অহংকার। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ النَّاسِ

অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা, অন্যকে তুচ্ছ করা।[৯২]

আর যদি স্ত্রীর চিন্তা ভুল হয়ে থাকে, তখন সেই ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে নম্রতার সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে বোঝানো। বোঝানো দরকার এজন্য যে, প্রত্যেকেই নিজের চিন্তাকে সঠিক মনে করে। এটা দুনিয়ার নিয়ম। কেউ নিজের চিন্তাকে ভুল মনে করে না। তাই তারটা যে ভুল– এ কথা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যদি বোঝানো না হয় আর তার চিন্তাকে উপেক্ষা করা হয় বা না মানা হয়, তখন স্ত্রীর মনে অভিমান দেখা দিতে পারে। সে ভাবতে পারে– আমি একটা ভালো চিন্তা করলাম, আমার স্বামী মানল না। মানেনি তো এজন্য যে, স্ত্রীর এই চিন্তা ঠিক নয়, ভুল। কিন্তু সে তো বুঝেনি যে এটা ভুল। সে তো মনে করছে তারটাই সঠিক। তারটা যে ভুল এ কথা নম্রতার সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে বোঝাতে হবে।

---

৯২. সহীহ মুসলিম : ২৭৫, ৪০৯২

ঠিক এর বিপরীত, স্বামী যে চিন্তা করে, হতে পারে স্ত্রীর সঙ্গে মিলছে না। এই ক্ষেত্রে স্বামীর চিন্তা সঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। স্ত্রীকে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে, দেখতে হবে– স্বামীর চিন্তাটা সঠিক না বেঠিক। যদি মনে হয় সঠিক, তাহলে খুশিমনে মেনে নেওয়া চাই। আর যদি মনে হয়– স্বামী যেটা চিন্তা করছে এটা ঠিক নয়, তখন সেখানে আদরের সঙ্গে, যুক্তির সঙ্গে স্বামীকে বুঝাতে হবে। এমন তো হতেই পারে যে, পুরুষ হওয়ার পরও স্বামীর ভুল হচ্ছে। এমনিভাবে স্ত্রী নারী বলে তার সবটা ভুল হবে এমন তো কোনও কথা নেই। তারটাও সঠিক হতে পারে। কাজেই উভয়কেই সুচিন্তিতভাবে ধৈর্যের সঙ্গে, নম্রতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। মনে রাখতে হবে, কঠোরতা অপেক্ষা নম্রতা অনেক বেশি সুফল দেয়। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ

আল্লাহ তাআলা দয়ালু। তিনি কোমলতা ভালোবাসেন এবং তিনি বান্দার কোমলতায় এমন সুফল দিয়ে থাকেন যা কঠোরতায় দেন না।[৯৩]

## প্রত্যেকের উচিত অন্যজনের কাজের মূল্যায়ন করা

অনেকসময় পারিবারিক জীবনে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়, যখন দুজনেরই মেজায গরম থাকে। সেই গরম মেজায নিয়ে কাজ করলে হবে না। যেমন কথার কথা– সংসারে অর্থের অনটন, টাকা-পয়সার অভাব চলছে। টাকা-পয়সার অভাব দেখা দিলে স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর মেজাযই বেশি গরম হয়। গরম হয় এ কারণে যে, এই পরিবারের দায়িত্ব তার উপরে। সন্তানের লালন–পালন তার উপরে। স্ত্রীর খোরপোশ সবকিছু তার উপরে। এ সংসারের সবটা দায়িত্ব তার মাথার

৯৩. সহীহ মুসলিম : ৬৭৬৬

উপরে। সে এটাকে সচ্ছলতার সঙ্গে আঞ্জাম দিতে পারছে না। এই জন্য তার মনে দুঃখ-ক্ষোভ থাকতেই পারে; থাকা স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্তব্য তাকে সাহস দেওয়া, সবরের সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে তাকে সঙ্গ দেওয়া, তার মনে হিম্মত যোগানো।

একটা কথা মনে রাখতে হবে– স্ত্রীর প্রধান কাজ দু'টো। সে দুয়ের একটি কাজ হল– মা হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং এটা একটা বিশাল কাজ এবং এজন্যে আল্লাহ তাআলা নারীকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন। কারণ এটা একটা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ، وَحَمْلُهُ وَفِصٰلُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

নারী সন্তান ধারণ করে কষ্ট-ক্লেশে এবং তাকে প্রসব করে কষ্ট-ক্লেশে। তাকে গর্ভধারণ ও দুগ্ধদান করতে হয় অন্ততপক্ষে ত্রিশ মাস।[৯৪]

সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা এবং তার গর্ভ থেকে সন্তানের জগতে আসা, তারপরে সন্তানকে লালন-পালন করা, এই সবটা তো স্ত্রী করে। সন্তানের মা করে। এটা কত কঠিন কাজ, তা পুরুষের পক্ষে বোঝাই সম্ভব নয়। কিছুটা অনুমান করতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি বোঝা সম্ভব না। নয় মাস পর্যন্ত তাকে গর্ভে ধারণ করা, লাগাতার একটা বোঝা বয়ে বেড়ানো অত সহজ কথা নয়।

## একটি চমৎকার বিচার

এক জায়গার একটি ঘটনা। ছেলে মাকে খুব বেশি কষ্ট দেয়। শেষে ছেলে সম্পর্কে আদালতে বিচার আসে যে, এই ছেলে তার মাকে কষ্ট দেয়। আদালত এই ছেলেকে শাস্তি দিয়েছে। ছোট্ট একটি শাস্তি। তা এই– তিন কেজি ওজনের একটি বোঝা তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল

৯৪. সূরা আহকাফ : ১৫

আর বলা হল যে, এটা তুমি দিনে-রাতে চব্বিশ ঘন্টা নিজের সঙ্গে রাখবে, ফেলতে পারবে না এবং এভাবে কমপক্ষে তিন মাস এই বোঝা বহন করবে। কমপক্ষে তিন মাস। দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টা এই বোঝা একবারও খুলতে পারবে না। দেখা গেল, চব্বিশ ঘন্টাও নয়, কয়েক ঘন্টা পরে তার ঘাড় ব্যথা হচ্ছে এবং সে এটা নিয়ে চলাফেরা করতে পারছে না। কয়েক ঘন্টা পরে তার কাছে মনে হল কয়েক মন বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আদালতের কঠিন নির্দেশ যে, তিন মাস রাখতেই হবে, তিন মাসের আগে এই বোঝা ঘাড় থেকে নামানো যাবে না। সে কান্নাকাটি করে কয়েকদিন পর্যন্ত পেরেছে। এরপর আর তার পক্ষে এটা সম্ভবই হচ্ছে না। এরপর আদালত তাকে বলল, এবার বোঝো, তিন কেজি ওজনের একটা বোঝা মাত্র কয়েকদিন বইতে পারছ না। আর তোমার মা তোমাকে তার পেটের ভেতরে রেখেছে নয় মাস। টানা নয় মাস। এবং তখন তার কত রকম সমস্যা ছিল! তুমি তো কেবল তোমার গলায় এটা ঝুলিয়ে রেখেছ ব্যস, আর কোনও কিছু না। কিন্তু তোমাকে তোমার মায়ের পেটে লালন-পালন করতে কেবল বোঝা বওয়ার কষ্ট কি! তোমার শরীরে খাদ্য তোমার মায়ের শরীর থেকেই আসত। তোমার খাদ্য যোগানোর জন্য তার যে খেতে হত, সেই খাওয়াটাও তার জন্য সুখকর ছিল না। সব পুরুষ এইটুকু জানে যে, সন্তান গর্ভে ধারণের পরে মা ভালোভাবে খাওয়া-দাওয়া করতে পারে না। তোমার খাদ্য যোগানোর জন্য তার তো খেতে হত, কিন্তু সেই খাওয়ার রুচি তার থাকত না। এরপরে একটু বড় হওয়ার পরে তুমি যে নড়াচড়া করতে, তখন তার কত কষ্ট! জান বের হয়ে যেত! এইবার বুঝে দেখো, তোমাকে নয় মাস তার পেটে রাখতে তোমার মায়ের কত কষ্ট হয়েছে!

## স্ত্রীর গর্ভকালীন সময়ে স্বামীর করণীয়

ওই কষ্ট পুরুষ তো বুঝবে না। কিন্তু সে না বুঝুক, এই ক্ষেত্রে পুরুষের চরম ধৈর্য ধরতে হবে। চরম ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কারণ ওই সময়ের কষ্টের কারণে স্ত্রীর দ্বারা অনেক সময়ই এমন আচরণ হতে পারে, যা

স্বামীর জন্য মর্যাদাকর নয়। কারণ মন-মেজায ভালো না থাকলে আচরণও ভালো হয় না। টানা কষ্ট করছে, এত সময় পার করা তার পক্ষে কী করে সম্ভব! এটাই তো একটা বিশাল কাজ। সন্তানকে ধারণ করছে তার পেটের ভেতরে এটাই তো একটা বিশাল কাজ। স্বামীদেরকে এই কাজের মূল্য দিতে হবে। তা না হলে এই স্বামী অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হবে। ওই সময় যাতে সে আরামে থাকতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। ওই সময় কোনও রকম মানসিক কষ্ট তাকে দেওয়া যাবে না। শারীরিক কষ্ট দেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না, মানসিক কষ্টও তাকে দেওয়া যাবে না। যা হোক, এই কথা বলতে গেলে অনেক লম্বা। সংক্ষেপে আমি সারছি।

নারীর দুই কাজ। তার মধ্যে এক কাজ তো হল সন্তানের লালন-পালন, একদম গর্ভধারণ থেকে নিয়ে। এরপরে সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ পায়ে না দাঁড়ায়, নিজের কাজ নিজে করতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সন্তানের লালন পালন মায়ের দায়িত্ব। তারপর তাকে শিক্ষাদান করা। বুনিয়াদী দীনী শিক্ষা। এ বিষয়ে আলোচনা পরে কখনও হবে ইনশাআল্লাহ।

## স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে সাহস দেওয়া

নারীর দ্বিতীয় দায়িত্ব, স্বামী যাতে তার নিজের কাজ যথাযথভাবে করতে পারে তার জন্য স্বামীকে উৎসাহ দেওয়া তাকে সাহস দেওয়া এবং তার মনোবল রক্ষায় সহযোগিতা করা। স্বামীর এক দায়িত্ব পারিবারিক খরচ আঞ্জাম দেওয়া। ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী সবার পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা– এর জন্য যত খরচ দরকার এর সবটা উপার্জন স্বামী করবে। অনেক সময় এমন হয় যে, প্রয়োজনীয় খরচ সে কামাই করতে পারছে না। এর জন্য স্বামীর মনে অনেক কষ্ট যে, সে তার সন্তানদের মুখে প্রয়োজনীয় খাবার তুলে দিতে পারছে না। তার ছেলের জামাটা ছেঁড়া, তার মনে অনেক কষ্ট। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া– তুমি ভেঙ্গে পড়ছ কেন? তাকিয়ে দেখো জগতে

আরো কত পুরুষ আছে তারা তোমার চেয়ে বেশি কষ্ট করছে। তাদের সন্তানরা আরো বেশি কষ্ট করে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তো দু'বেলা খেতে পারছি। ছেঁড়া জামা হলেও আমরা পরতে পারছি। কিন্তু কত বাবা আছে, তার সন্তানকে ছেঁড়া জামাটাও দিতে পারছে না। দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই নিয়ম। নিজের চেয়ে যারা আরো বেশি সাধারণ জীবন যাপন করছে, তাদের দিকে তাকাতে হবে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

أُنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ.

তোমাদের নিচে যারা আছে তাদের দিকে তাকাও, তোমাদের উপরে যারা আছে, তাদের দিকে তাকিয়ো না। তোমরা যাতে তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর নিআমতকে তুচ্ছ মনে না কর, তার পক্ষে এটা বেশি সহায়ক হবে।[৯৫]

তো স্বামীকে সঙ্গ ও সাহস দিতে হবে। স্ত্রীর এটা বড় কর্তব্য। ওই যে রান্নাবান্নার কাজ, এটা হল তিন নম্বরের কাজ। কিন্তু আমাদের স্বামীরা মনে করছে– স্ত্রীর এক নম্বর কাজ রান্নাবান্না। এটা ভুল ধারণা। এটা তার এক নম্বরের কাজ নয়।

স্ত্রীর যাতে চব্বিশ ঘন্টা রান্নাঘরে পড়ে থাকতে না হয়, সেই দিকেও স্বামীর লক্ষ রাখা উচিত। রান্নাঘরের কাজ হালকা করে দেওয়া উচিত। নিজেরও সহযোগিতা করা উচিত যাতে স্ত্রীর সবটা সময় রান্নাঘরে খরচ হয়ে না যায়। রান্নাঘরে যদি সময়টা খরচ হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী তোমাকে সঙ্গ দিবে কীভাবে? তোমার মনে সাহস যোগাবে কীভাবে? রান্নাঘরে থেকে থেকে, আগুনের পাশে থেকে থেকে তার মনটাও তো আগুন হয়ে থাকবে। নম্রতার সঙ্গে তোমাকে সঙ্গ কীভাবে দেবে? এজন্য রান্নাঘরের কাজ হালকা করা উচিত প্রত্যেকের নিজ সঙ্গতি অনুযায়ী। সবার পক্ষে সমানভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, সেই

৯৫. সহীহ মুসলিম : ২৯৬৩; জামে' তিরমিযী : ২৫১৩; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৪৩; মুসনাদে আহমাদ : ১০২৪৬

অনুযায়ী তার কর্তব্য স্ত্রীর রান্নাঘরের কাজকে হালকা করে দেওয়া। যদি হালকা করতে পারে, তখনই স্ত্রী স্বামীর পাশে দাঁড়াতে পারবে। স্বামীর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীর কর্তব্য, যাতে স্বামী ভেঙ্গে না পড়ে।

অতীতের ইতিহাসে এমন অনেক আছে, স্বামীরা তাদের কাজ আঞ্জাম দিতে পেরেছে এজন্য যে, স্ত্রী তার মনোবল জাগ্রত করেছে। স্ত্রী তার অন্তরে সাহস যুগিয়েছে। খোদ আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘটনা। নবুওয়াত লাভ করে তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁর উপরে যে আল্লাহর কালাম নাযিল হচ্ছে, এর এত চাপ, এত ওজন! তিনি ভাবলেন, আমি মরে যাব কি না! কিন্তু আমাদের মা হযরত খাদীজা রাযি. পাশে দাঁড়ালেন। সাহস দিলেন। বললেন– আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব আপনার উপর চাপিয়েছেন, সেই দায়িত্ব যাতে আপনি পুরোপুরি পালন করতে পারেন সেজন্য আল্লাহই সাহায্য করবেন। করবেন এজন্য যে, আপনি মানুষকে সাহায্য করেন। বুখারী শরীফের শুরুতে আছে, আম্মাজান খাদীজা রাযি. কীভাবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহস যুগিয়েছেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

كَلَّا وَ اللهِ، مَا يُخْزِيْكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، و تَحْمِلُ الْكَلَّ،
وَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، و تَقْرِيْ الضَّيْفَ، وَ تُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

কখনও নয়, আল্লাহর কসম! তিনি কখনও আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের হক আদায় করেন, রোজগারে অক্ষমদের দায়িত্ব বহন করেন, অভাবগ্রস্তদের উপার্জন করে দেন, অতিথিদের সেবা করেন এবং বিপদাপদে মানুষের সাহায্য করেন।[৯৬]

সবকালেই পুরুষরা যে বড় বড় কাজ করতে পেরেছে তাতে নারীদেরও ভূমিকা আছে। পুরুষের কাজ তো অনেক। পুরুষের কাজ তো কেবল কামাই করা নয়। কামাই-রোজগার ছাড়াও পুরুষের অনেক কাজ

৯৬. সহীহ বুখারী : ৩

আছে। বহুমুখী সামাজিক কাজ। যেমন এক জায়গায় দুই ভাই ঝগড়া লেগেছে, সেই দুই ভাইয়ের মধ্যে মিটমাট করতে আরেক পুরুষ যাবে। তার প্রতিবেশী বিপদে পড়েছে, এই পুরুষ মানুষ তার সেই প্রতিবেশীর বিপদে এগিয়ে যাবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজ, এটা পুরুষ মানুষ করবে। কারণ এই ঝামেলার কাজের জন্য আল্লাহ নারীকে বানাননি।

## কঠোর পরিশ্রমের কাজ থেকে নারীকে মুক্ত রাখা উচিত

আল্লাহ তাআলা নারীকে বানিয়েছেন নরম মন দিয়ে, নরম শরীর দিয়ে। তাকে এজন্য বানাননি যে, সে পুরুষের মতো বনে-জঙ্গলে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে, মাটি কাটবে, কোদাল কাঁধে নেবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো নারীদের বহনকারী উটগুলো পর্যন্ত ধীরে চালাতে বলেছেন, যাতে দ্রুত চলার কারণে তাদের কষ্ট না হয়। তিনি ইরশাদ করেন–

رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ

ধীরে হে আনজাশা! কাঁচগুলো (নরম শরীরের নারীদের) ভেঙে ফেলো না।[৯৭]

তিনি কোমল নারীদেহকে কাঁচের সঙ্গে তুলনা করে ইশারা করছেন যে, তারা ক্ষণভঙ্গুর। কাঁচ যেমন অতি সাবধানে ব্যবহার করতে হয়, যাতে ভেঙ্গে না যায়, তেমনি নারীদের প্রতিও কোমল আচরণ করা চাই। কিছুতেই তাদের দিয়ে শক্ত-কঠিন কাজ নেওয়া উচিত নয় এবং উচিত নয় তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করাও।

আজকাল পুরুষের রুচিও বিকৃত হয়ে গেছে। এই জন্য তারা নরম মন ও নরম শরীরের নারীকে কঠিন কঠিন কাজে ব্যবহার করতে চায়। অফিস-আদালতের কাজ তো সহজ নয়। সকালে বের হয়ে যাও, এরপর আবার সন্ধ্যার সময় আসো। অফিসের যারা সহকর্মী আছে, এদের সঙ্গে মিলমিশ দিয়ে থাকো। আর মিলমিশ দেওয়া মানে কী?

---

৯৭. সহীহ বুখারী : ৬২১১

তাদের মনোরঞ্জন করো। এইসব শয়তানি। পুরুষরা তাদের শয়তানি খাহেশ পূরণ করার জন্য মহিলাদেরকে মাঠে নামিয়েছে। পুরুষরা অফিস-আদালতে, সবজায়গায় আনন্দ-ফুর্তি করবে, সেজন্যে মহিলাদেরকে অফিস-আদালতে নিয়েছে। যে দেশের লক্ষ লক্ষ পুরুষ বেকার, সেখানে নারীদের মাঠে-ময়দানে কাজ করার কী দরকার? এ সমস্ত বদ চিন্তা।

তো বলছিলাম এই সমস্ত কাজ হল পুরুষের । এগুলো শক্ত কাজ। আমার মাঝেমধ্যে খুব আফসোস লাগে। বাইরে থেকে হয়তো বাসায় ফিরব, কোনও এক জায়গায় হয়তো দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির অপেক্ষায়। দেখা যায়, গাড়ির অপেক্ষায় আরো অনেক মহিলা আছে, তারাও উঠবে। এক একটা গাড়ি আসছে আর যাচ্ছে, আর বলছে– না, না, মহিলা সিট নাই। ওই মহিলা দাঁড়িয়ে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা। পুরুষ ঠেলেঠুলে উঠে যায়। মহিলার পক্ষে তো ঠেলেঠুলে উঠা সম্ভব নয়। সে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আমার তখন আফসোস হয়, আহা! এই মহিলা তার ঘর ছেড়ে, শান্তির জায়গাটা ছেড়ে কেন রাস্তায় নেমে আসে? হয় শীতের মধ্যে, নয় গরমের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। আমরাই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যাই। গরমের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা, এটা কি সম্ভব? গাড়ি পাওয়া যায় না। সিট নাই। এমন বিরক্তি ধরে! আর তার মধ্যে আমাদের মায়েরা দাঁড়িয়ে আছে। খুব আফসোস হয়, কেন এই নরম মনের নরম শরীরের মহিলা বাইরে নেমে আসে!! এরা কী মনে করছে? বাইরের এ জগৎ সংগ্রামের জগৎ। এটা নারীর জন্য নয়; পুরুষের জন্য। হ্যাঁ, ওই সংগ্রামের জগতে পুরুষ যাতে অটল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তার জন্য ঘরে বসে নারী সাহস যোগাবে। তার কষ্টে উৎসাহ দিবে, সাহস দিবে।

## একটি অসাধারণ ত্যাগের ঘটনা

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম ওয়াকিদী রহ.। তিনি তার নিজ ঘটনা বলেন। তিনি বাদশাহ মামুনুর রশীদের আমলের লোক। হারুনুর রশীদের ছেলের নাম মামুনুর রশীদ। তিনি বলেন– আমার দুই বন্ধু

ছিল। আমরা তিন বন্ধু একসঙ্গে চলাফেরা করতাম। সুখে দুঃখে পাশে থাকতাম। এক বছরের ঘটনা। পরের দিন ঈদ। কিন্তু আমার আর্থিক কষ্ট এত বেশি যে, আমি আমার সন্তানদের সারা বছর তো দিতে পারিইনি, এই ঈদ উপলক্ষেও কাপড় দিতে পারিনি। বাচ্চাদের মায়ের মনে কষ্ট– আগামীকাল আমার ছেলেরা ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরে ঈদের মাঠে যাবে! আর সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা, তারা তো ভালো ভালো কাপড় পরে মাঠে যাবে। আর আমার সন্তানরা ঈদের মাঠে যাবে ছেঁড়া কাপড় পরে! তো তাদের মায়ের মনের কষ্ট দেখে আমি ভাবলাম একটা কিছু করি।

বনু হাশেম গোত্রে আমার এক বন্ধু ছিল। আমি আমার সেই বন্ধুকে চিঠি লিখলাম, ভাই, বড় বিপদে আছি, ঈদের আনন্দটাও আমি আমার সন্তানদের দিতে পারছি না। যদি সাহায্য করতে! সেই বন্ধু এক হাজার দিরহাম পাঠাল। একটা থলির ভেতরে এক হাজার দিরহাম। দিরহাম মানে রূপার টাকা। সেই কালে রূপার বা সোনার টাকা চলত। রূপার টাকাকে বলে দিরহাম আর সোনার টাকাকে বলে দীনার। এক হাজার দিরহাম পাঠাল। খুব খুশি আমি। আলহামদুলিল্লাহ, আগামীকালের খরচটা এর দ্বারা হয়ে যাবে। ঠিক এই সময় আমার অপর বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি আসল আমার কাছে। সেই বন্ধু বলল, ভাই, অনেক চেষ্টা করেছি আগামীকাল ঈদের ব্যবস্থা করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই ব্যবস্থা করতে পারিনি। যদি সাহায্য করতে! আমি সেই এক হাজার দিরহামের থলিটা আমার সেই বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। পাঠানোর পরে আমার মনে সংকোচ লাগল– আমি আমার স্ত্রীর কাছে যাব এখন কোন মুখ নিয়ে! বন্ধু এক হাজার দিরহাম পাঠিয়েছিল, সেটাও আমি দিয়ে দিলাম। শেষে লজ্জায় শরমে আমি মসজিদে চলে গেলাম। আর আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম আল্লাহ যেন কোনও ব্যবস্থা করে দেন।

রাত শেষ, ফজরের নামায পড়ে আমি বাসায় আসলাম। বাসায় আসলে আমার স্ত্রী আমাকে বলল, তোমাকে পেরেশান মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। পেরেশানির কী আছে? জগতে মানুষ কি আমরা

একাই? গরীব কি শুধু আমরাই? এই দেশে কি আর গরীব নেই? আমদেরচে' আর গরীব মানুষ নেই? আমার সন্তান ছেঁড়া কাপড় পরে মাঠে যাবে এমন কত সন্তান আছে যাদের কাপড়ই নাই, তারা মাঠে যেতে পারবে না। তুমি কেন পেরেশান? আর এই সন্তান তোমার একার? আমার সন্তান না? আমরা দুজন মিলে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিই। তুমি একা কেন এত পেরেশান হচ্ছ? এভাবে আমার স্ত্রী আমাকে সান্ত্বনা দিল। ঠিক এই সময় বনু হাশেম গোত্রের আমার যে বন্ধু, যে প্রথমে আমাকে এক হাজার দিরহাম দিয়েছিল, সে ওই থলিটা নিয়ে আমার কাছে আসল। আমি থলি দেখেই চিনে ফেললাম। আমি বললাম, কী ভাই? এই থলি তো আমি আমার অমুক বন্ধুর নিকট পাঠিয়েছিলাম, তোমার কাছে কেমনে গেল? সে বলল, ভাই, তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে আমার কাছে, তখন আমার কাছে এই এক হাজার দিরহামই ছিল এবং এটা আমি অনেক কষ্টে কালকেই জোগাড় করেছিলাম ঈদের খরচ হিসেবে। কিন্তু তুমি যখন চিঠি লিখলে, তখন আমি এই থলি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আমি কী করব? আমি কোনও উপায় না পেয়ে আমার ওই বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে পাঠিয়েছি– বিপদে পড়েছি, যদি সাহায্য করতে! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে দেখি আমি তোমাকে যেই থলি দিয়েছিলাম, সেই থলিই ঘুরে ঘুরে আমার কাছে এসেছে।

তাদের তিন বন্ধুর এ ঘটনা পরে বাদশাহ মামুনুর রশীদের কানে পৌঁছে যায়। মামুনুর রশীদ তাদের এ ত্যাগের বৃত্তান্ত শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি তাদের কাছে সাত হাজার দীনার হাদিয়া পাঠিয়ে দেন। দীনার হল সোনার টাকা। ওটা ছিল রূপার। সাত হাজার দীনার হাদিয়া পাঠিয়ে দিলেন এ কথা বলে যে, তোমাদের তিন বন্ধুর দুই হাজার করে ছয় হাজার, আর এক হাজার দীনার তোমার স্ত্রীর। তোমার স্ত্রী তোমার এ কষ্টের সময় তোমাকে সঙ্গ দিয়েছে, সাহস দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়েছে। তাই তাকেও এক হাজার দীনার দেওয়া হল।[৯৮]

---

৯৮. মুরূজুয যাহাব : ২/৫১

# স্বামীর অর্থাভাবে স্ত্রীর করণীয়

নারীর এটা একটা বড় কাজ যে, সে সুখে দুঃখে স্বামীর পাশে থাকবে। কখনোই খোঁচা দেবে না যে, তুমি কেমন স্বামী! তুমি কেমন বাবা!! ওই দেখো, আমাদের প্রতিবেশী ওদের বাবা তার ছেলেমেয়েকে কত দামি দামি জামা কিনে দিয়েছে। আর তুমি দু'শ টাকা দিয়েও একটা জামা কিনে দিতে পারলে না! এই খোঁটা তার স্বামীকে দেবে না। কারণ, জামা দিতে না পারায় ওই বাবার মনে অনেক কষ্ট। যেহেতু দায়িত্বটা তার, তাই তার মনে অনেক কষ্ট। এই খোঁটা দিলে তার কলিজা থেকে রক্ত ছোটে। কারণ তার মনে তো এমনিই দুঃখ, তারপরে আবার স্ত্রী কষ্ট দিচ্ছে। কেবল সন্তানকে দেওয়া কেন, তার নিজের খরচও যদি দিতে না পারে, স্বামী যদি স্ত্রীর খোরাকও দিতে না পারে, তবুও স্ত্রীর উচিত নয় স্বামীকে খোঁচা দেওয়া। কারণ সমস্ত স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে। দুনিয়ায় এমন কোনও স্বামী পাওয়া যাবে না, যেই স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে না। হ্যাঁ, যেই স্বামীর মধ্যে দীন নেই, যে আরো চার ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, তার কথা তো আলাদা। আর যার নারী বলতে কেবল তার স্ত্রী, সে অবশ্যই তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। কাজেই সে চায় তার সামর্থ্য অনুযায়ী সবচে' ভালো পোশাক, সবচে' ভালো খাবার তার স্ত্রীকে দিতে। তারপরও দিতে যদি না পারে, তখন তার মনে অনেক কষ্ট থাকে। ওই সময় স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া। একথা না বলা যে, তুমি কেমন পুরুষ, আমাকে ঈদের একটা কাপড়ও দিতে পারলে না। এটা আদর্শ স্ত্রীর কাজ না।

এই যে আজকে সবরের হাদীছ পড়া হল, এটাই তো সবরের জায়গা। সবরের আসল জায়গা এটাই। চরম ধৈর্য ধরতে হবে দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্য। এইখানে যদি খোঁচা দেয়, তাহলে লাভ কী হবে? এই খোঁচা দিয়ে কি সন্তানদের কাপড় আদায় করা যাবে? কখনোই নয়। উল্টো স্বামীকে কষ্ট দেওয়া হবে এবং সেই কষ্টের ফল হবে এই যে, তার মনে স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মাবে– কেমন স্ত্রী আমার, যে আমার কষ্টও বোঝে না। ফলে স্ত্রীর থেকে মুখ ঘুরিয়ে সে অন্য নারীর পেছনে ছুটবে। আর এর ফলে সংসারে ভাঙ্গন ধরবে। স্ত্রীর কর্তব্য এখানে সবর করা।

## স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে আমাদের অবহেলা

তবে হ্যাঁ, স্ত্রী যাতে এই সবর করতে পারে তার জন্য স্বামীর অনেক দায়িত্ব আছে। দায়িত্বটা স্বামীরই বেশি। ঘরের কর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব বেশি। কারণ সে শাড়িও দিতে পারল না, চিকিৎসাও করতে পারল না, আবার সান্ত্বনাদায়ক দুটো কথাও বলল না, তাহলে তো সে দায়িত্বহীন সাব্যস্ত হবে। ভালোবাসার সঙ্গে স্ত্রীকে এই কথা বলতে হবে– আহা! আজকে একটা আনন্দের দিন। আমি তোমাকে একটা শাড়িও দিতে পারলাম না, তোমাকে একটা জামা দিতে পারলাম না! এই আক্ষেপটা প্রকাশ করতে হবে। এই আক্ষেপটা প্রকাশ করলেই স্ত্রী বুঝবে– না, স্বামী আমাকে দিতে চায়। এই আক্ষেপটা যদি প্রকাশ করা না হয়, তাহলে স্ত্রী বুঝবে কী করে? স্ত্রীকে তো বোঝার সুযোগ দিতে হবে। আমাদের সমাজের স্বামীরা এই জিনিসগুলো বোঝে না। এটা বুঝতে হবে। রান্নাঘরে কষ্ট করে কিন্তু স্বামী বলে না যে, আহা, তোমার এত কষ্ট, তোমার এত কাজ! এই কথা মুখ ফুটে বলে না। এটা বলা তার কর্তব্য এবং নিঃসন্দেহে তার কাজ অনেক বেশি।

আমি তো মাঝেমধ্যেই বলি, পুরুষের চে' নারীর কাজ অনেক বেশি। পুরুষের ছুটি আছে, বিশ্রাম আছে, নারীর নেই। পুরুষের সাপ্তাহিক ছুটি আছে, নারীর সাপ্তাহিক ছুটি বলতে কিছু নেই। পুরুষের ঈদের ছুটি আছে, নারীর ঈদের ছুটি নেই। কেন নারীর ঈদের ছুটি নেই? কারণ ওই দিনও তার ব্যস্ততা। অন্য দিন যে ব্যস্ততা, ঈদের দিন একই ব্যস্ততা; বরং অরো বেশি ব্যস্ততা। কাজেই নারীর তো কোনও ছুটি নেই। পুরুষের অসুখ-বিসুখের ছুটি আছে, নারীর অসুখ-বিসুখের ছুটিও নেই। স্বামীর জ্বর, ব্যস শুয়ে আছে। তার আর চিন্তা কী! শুয়ে আছে আর স্ত্রী তার যত্ন করছে। মাথায় পানি ঢালছে। স্ত্রীর জ্বর, কিন্তু সে শুয়ে নেই। সে ঠিকই স্বামীর জন্য রান্না করতে রান্নাঘরে চলে গেছে ওই জ্বর নিয়েই। স্ত্রীর কোনও ছুটি নেই। এইগুলি স্বামীদের বুঝতে হবে। স্বামীরা যদি এগুলি বুঝে আর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয়– তোমার অনেক কাজ, আমি তো কিছু করতে পারছি না; তখন স্ত্রী বুঝবে– আমার স্বামী আমার কাজের মূল্য দেয়।

## প্রত্যেকের উচিত আপন দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া

তবে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই আসল কথা হল– প্রত্যেকেই দেখবে আমার দায়িত্ব কী! সে কী করছে না করছে, তা আমার দেখার দরকার নেই। স্বামী দেখবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি কি না? স্ত্রী কী করল না করল সেই দিকে সে তাকাবে না। তার কর্তব্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেওয়া, তার পোশাক-আশাক দেওয়া, ভালোভাবে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা। স্বামী তার মাথা ঘামাবে এটা নিয়েই। স্ত্রী তার দায়িত্ব পালন করছে কি না, এটা তার ব্যাপার। সে আল্লাহর কাছে জবাব দেবে। আমি এই প্রশ্নের সম্মুখিন হব যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি কি না। স্ত্রী তার দায়িত্ব পালন করেছে কি না, সেই প্রশ্ন আমাকে করা হবে না। ঠিক এমনি স্ত্রীরও ওই দিকে তাকানোর দরকার নেই যে, স্বামী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কি না। বরং সে দেখবে আমার কী দায়িত্ব, আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি কি না। কারণ আমাকে আমার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। স্বামী আমাকে সান্ত্বনা দিল কি না– এ প্রশ্ন সেখানে আমাকে করা হবে না। সেই প্রশ্ন স্বামীকে করা হবে। তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, তা নিয়ে সে থাকুক। দু'জনেই যদি নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে কিন্তু আর ঝামেলা থাকে না।

## উচিত শতভাগ ধৈর্যধারণে সচেষ্ট থাকা

প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করুক। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে সব দায়িত্ব পূরণ হবে এবং ওই ঘরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা হবে। আর এর জন্য দরকার শতভাগ সবর। ধৈর্য দরকার। আমি আমারটা করি, সে কি করল না করল তা নিয়ে আমি মাথা গরম না করি,ওই জায়গায় মাথা ঠান্ডা রাখি। সবর দরকার। আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।[৯৯]

---

৯৯. সূরা বাকারা : ১৫৩

আল্লাহর সঙ্গে থাকা মানে তাঁর সাহায্য লাভ হওয়া। তাঁর সাহায্য লাভ হলে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সব কাজে সফলতা আসে। দাম্পত্য জীবনেও যদি ধৈর্য রক্ষা করে চলা যায়, তবে আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে এবং ইনশাআল্লাহ ঘরে অবশ্যই শান্তি থাকবে। টাকা-পয়সা কম হতে পারে, কিন্তু শান্তি থাকবে। আর ওই শান্তিই তো দরকার। ওই টাকা-পয়সা দিয়ে কী হবে, যে ঘরে শান্তি নেই? স্বামী কামাই করে কোটি কোটি টাকা, কিন্তু সে অন্য মেয়ের পেছনে ঘোরে। তো ওই স্বামী দিয়ে আমার কী হবে? কিংবা ঘরে টাকার কোনও অভাব নেই, কিন্তু স্ত্রীকে সেই ঘরে পাওয়া যায় না; সে বাইরে বাইরে ঘোরে। তো ওই স্ত্রীকে দিয়ে কী ফায়দা? পক্ষান্তরে গরীব, কিন্তু দুজনই দুজনকে ভালোবাসি, দুজন দুজনকে নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে এই ঘরে শান্তি থাকবে। এই ঘরটা সুখের ঘর হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে সবরের সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে সংসার-জীবন যাপনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# ধৈর্য না ধরার বহুবিধ ক্ষতি

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

وَ الْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

এই যে সূরা পড়লাম, এ সূরার নাম হল সূরা আস্‌র। আস্‌র মানে সময় বা কাল। আল্লাহ তাআলা এ সূরায় কাল বা সময়ের শপথ করে বলেছেন– সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ

সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে ক্ষতির মধ্যে নেই কেবল ওই সমস্ত লোক, যারা ঈমান এনেছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

যারা ঈমান এনেছে,

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

এবং নেক কাজ করেছে

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ

এবং যারা একে অন্যকে ন্যায় ও সত্যের উপদেশ দিয়েছে।

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

এবং যারা একে অন্যকে সবরের উপদেশ দিয়েছে।

এ চারটা গুণ যাদের মধ্যে আছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত নয়। চারটা গুণ যদি কারো মধ্যে থাকে, তাহলে সে ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। এক নম্বরের গুণ ঈমানওয়ালা হওয়া। দুই নম্বর হলো নেক কাজওয়ালা হওয়া। নেক কাজ হল তা, যে কাজ করলে আল্লাহ খুশি হন, যে কাজ করলে ছাওয়াব পাওয়া যায়। তিন নম্বর হলো যারা একে অন্যকে সত্য ও ন্যায়ের আদেশ করে। একে অন্যকে বলে, ন্যায় কাজ করো, সঠিক কাজ করো, সত্যের উপর থাকো। আর চতুর্থ হলো একে অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। এ চারটা গুণ যাদের মধ্যে আছে তারা ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে। আর এ চারটা গুণ যাদের মধ্যে নেই তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

আমরা এ সূরা সবাই জানি, সবারই মুখস্থ আছে। অত্যন্ত ছোট্ট সূরা। নামাযে এ সূরা পড়ে থাকি। কিন্তু অর্থ বুঝি না বলে এ সূরার উপদেশ আমরা গ্রহণ করতে পারছি না। এ সূরা থেকে শিক্ষা নিতে পারছি না। কাজেই এ সূরা মুখস্থ করার পাশাপাশি এর অর্থও সকলের জেনে নেওয়া উচিত। এবং যখনই নামায পড়ি, তখনই যেন এ সূরায় আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কী বলেছেন সেদিকে লক্ষ করে করে পড়ি। ইনশাআল্লাহ! তাহলে জীবনে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। জীবনে অনেক পরিবর্তন আসবে।

আমি মূলত এ সূরাটি পড়েছি গত সপ্তাহের আলোচনাকে সামনে রেখে। গত মঙ্গলবার ধৈর্য ও সবর সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। ওই সম্পর্কে আলোচনা শেষ হয়নি। সবর সম্পর্কে আরো কিছু কথা রয়েছে।

এ সূরায় সবরের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ক্ষতি থেকে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে নিজেও সবর করো, এবং অন্যকেও সবর করতে বলো। যারা সবর করে না তারা নানা রকম ক্ষতির মধ্যে থাকে। ঘরে বাইরে সর্বত্র তার বিপুল ক্ষতি হয়ে যায়। এ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ঘরে বাইরে সব জায়গায় ধৈর্য ধরা উচিত। সবরের সঙ্গে থাকা উচিত। যদি সবর না থাকে, আমরা যদি ধৈর্য ধরতে না পারি, তাহলে পারিবারিক জীবনে অনেক ক্ষতির শিকার হয়ে যাব। ক্ষতির শিকার হয়ে যাচ্ছিই তো।

## স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

যে ঘরে স্বামী-স্ত্রী সবর করে না, সে ঘরে শান্তি থাকে না। ঘরের শান্তির জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সবর দরকার। আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর ব্যবস্থাটা দিয়েছেন শান্তির জন্য। কুরআন মাজীদে আল্লাহ বলেছেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।[১০০]

যাতে তোমরা শান্তি পেতে পার, সে জন্যই স্বামী-স্ত্রীর ব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ ঘরেই শান্তি নেই। কারণ শান্তি পাওয়ার জন্য কেবল বিবাহ করাই যথেষ্ট নয়; বরং ধৈর্য ধরাও জরুরি। স্বামীর মধ্যেও অনেক গুণ থাকে। স্ত্রীর মধ্যেও অনেক গুণ থাকে। কিন্তু দুনিয়ার কোনও মানুষই কেবল গুণ আছে, কোনও দোষ নেই, এরকম নেই। গুণের পাশাপাশি

১০০. সূরা রূম : ২১

কিছু দোষও থাকে। সব মানুষেরই। স্বামীও শতভাগ ত্রুটিমুক্ত নয়, দোষমুক্ত নয়। স্ত্রীও শতভাগ দোষমুক্ত থাকতে পারে না। স্বামীও এমন নয় যে, তার মধ্যে কেবল গুণ আর গুণ। আর স্ত্রীও এমন নয় যে, তার মধ্যে কেবল গুণ আর গুণ। কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি সবার মধ্যেই থাকে। মানুষ তো! মানুষ তো ফিরিশতা নয়। কাজেই যদি শান্তি পেতে হয় তাহলে গুণগুলোর দিকে তাকিয়ে দোষগুলোকে উপেক্ষা করতে হয়, অগ্রাহ্য করতে হয়। এটা তখনই সম্ভব যখন ভেতরে ধৈর্যের গুণ থাকে।

স্বামী যদি চায় তার স্ত্রীকে নিয়ে শান্তিতে থাকবে, তাহলে সব সময়ই ধৈর্যের সঙ্গে থাকতে হবে। অনেক সময় এমন হয়, স্ত্রী একটা কথা বলল, যে কথাটা স্বামীর মনোপুত নয়, কিংবা কথাটাই বলল রাগের সঙ্গে। রাগ হতেই পারে। ঘরের ভেতর সর্বক্ষণ কাজ করে। ছেলেমেয়ে সামলায়। ঘরে নানা রকমের কাজ করে। এত কিছু কাজের ভেতরে সব সময়ই মনটা ঠিক থাকবে, মেজায ঠান্ডা থাকবে, তা নাও তো হতে পারে। কাজেই এমন হতে পারে যে, রাগের সঙ্গে একটা কথা বলে ফেলেছে। এখন কেন রাগের সঙ্গে কথা বলল এ নিয়ে যদি স্বামী উঠে পড়ে লেগে যায়, তাহলে তো ঘরের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাবে। অনেক স্বামী এটা হজম করতে পারে না। হজম করতে না পারায় ব্যস, যুদ্ধ লেগে যায়, স্ত্রী এক কথা বলে, স্বামী দুই কথা বলে এভাবে বাড়তেই থাকে। অনেক সময় ব্যাপারটা মারামারি পর্যন্ত চলে যায়। প্রথমেই যদি স্বামী ধৈর্য ধরত, সে যদি মনে করত, সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে নানারকমের কাজের মধ্যে থাকে, হয়তো মেজায ঠিক নেই, তাই এ কথাটা বলে ফেলেছে, তাহলেই তো শেষ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময়ই অপরের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করতেন। এমনকি যখন তার জানের উপর কিংবা ইজ্জতের উপর আঘাত আসত, তখনও তিনি ক্ষমা করতেন এবং আল্লাহর কাছে তার ক্ষমার জন্য দুআ করতেন এই বলে–

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

হে আল্লাহ! এদের ক্ষমা করে দাও, এরা বোঝে না।[১০১]

---

১০১. সহীহ বুখরী : ৩৪৭৭

এরা জানে না, বোঝে না। ক্ষমা করে দাও। মানে তার কমতিটা লক্ষ রাখতেন। কোন অভাবটা তার মধ্যে আছে সেদিকে লক্ষ করতেন। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই এটা করতে পারে। স্বামী এটা চিন্তা করতে পারে, আমার স্ত্রী একটু মেজাযী। এটা তার মধ্যে কমতি। এটা তার একটা অভাব। সে যখন মেজাযী মানুষ আমি জানি, তখন মনে মনে এটা বলতে পারি, আল্লাহ! এর মধ্যে মেজাযটা একটু বেশি। সে এ মেজাযের কারণে কাজটা করে ফেলেছে, কথাটা বলে ফেলেছে, আমি ক্ষমা করে দিলাম, তুমিও ক্ষমা করে দাও। কিংবা এটা সে চিন্তা করতে পারে, আমার স্ত্রীর বুঝ-বুদ্ধিটা একটু কম। বুঝ কম হয়ে যাওয়ার কারণে সে এ কথাটা বলে ফেলেছে। কাজেই আল্লাহ! আমি ক্ষমা করে দিলাম, তুমিও ক্ষমা করে দাও। তাহলে আর অশান্তি সামনে বাড়ে না।

স্বামী একটা উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলেছে। স্ত্রী চিন্তা করতে পারে– বাহির থেকে এসেছে, মেজাযটা গরম। কিংবা ওর তো এমনিতেই মেজাযটা গরম থাকে। স্ত্রী যদি চিন্তা করে– মেজাযী মানুষ! তাই কথা বলে ফেলেছে। তাই রাগ করে ফেলেছে। বাইরে হয়তো সে কোনও খারাপ একটা অবস্থার মধ্যে ছিল। কারো সঙ্গে ঝগড়া লেগেছিল। কেউ হয়তো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এজন্যই মেজাযটা খারাপ হয়ে আছে, আর সে কারণেই সে ঘরে এসেই মেজায দেখিয়েছে। স্ত্রী যদি এভাবে চিন্তা করে, তাহলে কিন্তু ঝগড়া সামনে বাড়ে না। কিন্তু অনেক স্ত্রী এরকম বলে ফেলে– এই, তুমি আমার সাথে মেজায দেখালে! স্বামী একটু রাগ করে, সে তখন আরেকটু বেশি রাগ দেখায়। কিংবা স্ত্রী মেজায দেখায়, তো স্বামী আরো বেশি মেজায দেখায়। বলে– তোমার এত পাওয়ার! আমার সাথে তুমি মেজায দেখাও! ব্যস, এই করে সামনে বাড়তে থাকে। এরকম যদি একজনের মেজাযের উপর আরেকজন মেজায দেখাতে শুরু করে, তাহলে ওই ঘরে শান্তি থাকতে পারে না। আর শান্তি না থাকা মানে হল ঘরের নানারকম নিআমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া। স্ত্রীর এবং স্বামীর কাছ থেকে একে অন্যে শান্তি পাবে, এ শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া, এটাই তো একটা বড়

ক্ষতি হয়ে গেল। শান্তি তো একটা নিআমত। এ নিআমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল রাগারাগি করার কারণে, ধৈর্য ধরতে না পারার কারণে।

## স্বামী-স্ত্রীর কলহ ও তার পরিণাম

অনেক ঘরে এ ঝগড়া-ফাসাদ থেকে নানা রকমের ক্ষতি হয়ে যায়। স্বামী বা স্ত্রী অসুস্থ মানুষ, সে একটু মেজায দেখাল, এর বিপরীতে যদি অন্যজন আরো মেজায দেখায় তাহলে দেখা যাবে যে, তার রোগ আরো বেড়ে গেছে। অসুস্থ অবস্থায় দেখা যায় সবার মেজায একটু কড়া থাকে। অসুস্থ হলে মেজায খিটখিটে হয়ে যায়। এ অবস্থায় যদি সে রাগ করে আর এর বিপরীতে অন্যজন আরো রাগ করে, তার ফল দাঁড়াবে এই– তার রোগ আরো বেড়ে যাবে। যদি হাই প্রেশার থাকে, তখন তো অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হল। সবর করতে না পারার কারণে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হল। স্বাস্থ্যের ক্ষতি থেকে সম্পদের ক্ষতি হয়। এখন ডাক্তার-কবিরাজ-ঔষধপত্র লাগবে। কাজেই স্বাস্থ্যের ক্ষতি থেকে সম্পদের ক্ষতি। সম্পদের ক্ষতির পাশাপাশি সময়ের ক্ষতি। কারণ ঝগড়া করলে অনেকক্ষণ এর রেশ থেকে যাবে। তখন কোনও কাজে মন বসবে না। স্ত্রীর রান্নাবান্নায় মন লাগবে না। রান্না করতে যেয়ে সব নষ্ট করে ফেলবে। স্বামীরও নিজের কাজে মন থাকবে না। কাজ নষ্ট হবে। সময়ের ক্ষতি হল, কাজেরও ক্ষতি হল, এমনিভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হল, টাকারো ক্ষতি হল।

এ সূরা বলছে, সব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতি থেকে বাঁচার একটা উপায় হল সবর করা। সবর না করলে ক্ষতি। দেখুন সবর না করার কারণে কত রকম ক্ষতি ঘরে চলে আসে। ক্ষতি কেবল এখানেই শেষ হয়ে যায় না, আরো অনেক রকম ক্ষতি হয়। অনেকের তো এমন ক্ষতি হয় যে, ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। ঝগড়া থেকে ভাঙচুর। স্বামী একটা ভাঙ্গে, স্ত্রী দুইটা ভাঙ্গে। এত কষ্ট করে ঘরে আসবাবপত্র সংগ্রহ করেছে। এখন সবর না করার ফলে ওইসব ধ্বংস হচ্ছে নিজেদের হাতে। যে জিনিস কষ্ট করে সংগ্রহ করেছিল, নিজ হাতে তা ধ্বংস করছে সবরের অভাবে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে চারটি গুণের অভাবে। তার মধ্যে একটা হল সবর। সবরের অভাবে আরো অনেক ক্ষতি হয়, যেমন ঘরের ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়। যখন দেখে বাবামায়ের মধ্যে ঝগড়া, তখন এ ছেলেমেয়েও নষ্ট হয়। যে ঘরে বাবামায়ের মধ্যে মিল থাকে না, সে ঘরের ছেলেমেয়েকে মানুষ করা অনেক কঠিন। অমানুষ হয়ে যাবে। বেয়াদব হয়ে যাবে। তাদেরও মেজায খিটখিটে হবে। সন্তান বিপথগামী হওয়ার যে সমস্ত কারণ মনোবিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন তার মধ্যে একটা কারণ এটাও যে, তাদের বাবা মায়ের মধ্যে মিল থাকে না। সংসারে অশান্তি থাকে। তার প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে। ওই সন্তানের চরিত্রও নষ্ট হয়। মানসিক রোগ দেখা দেয়। আমরা সবাই সন্তানকে ভালোবাসি। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে কত কষ্ট সহ্য করি। এ সন্তান ভবিষ্যতের স্বপ্ন। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী নিজেরা সবর না করার কারণে ভবিষ্যতের সে স্বপ্ন ধ্বংস হয়ে যায়, স্বপ্ন পূরণ হয় না। সন্তান দিয়ে স্বপ্ন পূরণ করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অবশ্যই সবর করতে হবে। এ তো গেল স্বামী-স্ত্রীর কথা।

## বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

সবর দরকার সব জায়গাতেই। বাবা-মা এবং ছেলেমেয়ে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেটা আছে, এখানেও সবর দরকার। অনেক বাবা-মা সন্তানের আচরণে-ব্যবহারে সবর করে না। আবার অনেক ছেলেমেয়েও বাবা-মায়ের আচরণে সবর করে না। অন্য জায়গায় সবর করতে পারে, এখানে করে না। মা একটা কঠিন কথা বলল, বা বাবা একটা কঠিন কথা বলল, অমনি ছেলেমেয়ে মুখ ফোলায়। কী! আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করল! ব্যস, এখন খাবে না, ঘরে থাকবে না, কারো সঙ্গে কথা বলবে না। ঘরের শান্তি নষ্ট হওয়ার এটাও একটা কারণ। বাবা-মায়ের ব্যবহার ছেলেমেয়ে সহ্য করতে চায় না।

যে বাবা-মা তোমার জন্য এত কিছু করে, তার একটা গরম কথা তুমি সহ্য করতে পারবে না! তুমি কেমন সন্তান? সবর করে না। কথা তো

ছিল বাবামায়ের সবরকম কঠিন কথাগুলোও সে সহ্য করবে। কারণ আল্লাহ তাআলার পরেই বাবা মায়ের স্থান। কিন্তু না, বাবা-মায়ের কোনও কঠিন কথা ছেলেমেয়ে সহ্য করতে রাজি নয়। অনেক সময় ছেলেমেয়ের কল্যাণের স্বার্থেই ছেলেমেয়ের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে হয়। তার ভালোর জন্য। ছেলেমেয়ে সেটা বোঝে না। তার ভালোর জন্য বাবা-মা কঠিন আচরণ করল, সে তা বুঝল না; উল্টো বাবা-মায়ের পেছনে লেগে গেল। আর এ করে করে সে নিজের জীবন ধ্বংস করে দিল।

আবার এর বিপরীতও হয়, ছেলেমেয়ে তো বাবা-মায়ের কাছেই আবদার করবে। তার চাওয়া-পাওয়ার জায়গা তো এটা। অনেক সময় ছেলেমেয়ে কিছু আবদার করলে বাবা-মা ক্ষেপে যায়। তখন এ ছেলেমেয়ে বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভাবে– কেমন বাবা-মা! কোনও কথাই রাখে না, আবদার করলেও বোঝে না! ব্যস, বাবা-মা এবং ছেলেমেয়ের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। যদি বাবা-মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ের সুসম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ছেলেমেয়েকে কোনওদিন মানুষ করা যাবে না। ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য সবচে' বেশি দরকার হল ছেলেমেয়ের সাথে বাবা-মায়ের সুসম্পর্ক থাকা। কেবল শিক্ষক ছেলেমেয়েকে ভালো করতে পারবে না। কোনও সংশোধনকারী, কোনও মুরুব্বী ছেলেমেয়েকে ভালো করতে পারবে না, যদি ছেলেমেয়ের সঙ্গে বাবা-মায়ের সুসম্পর্ক না থাকে। খুব জরুরি জিনিস। এজন্য পাহাড়ের মতো ধৈর্যধারণ করতে হবে। বাবা-মা'কে পাহাড়ের মতো ধৈর্যশীল হতে হবে। আবার ছেলেমেয়েকেও মনে করতে হবে, আমার জগতের সবচে' বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী আমার বাবা-মা। এটা তো বাস্তব কথা। এ তো মিছে কথা নয়। বাবা-মায়ের মত শুভাকাঙ্ক্ষী জগতে আর কে হতে পারে! তো বাবা-মা যখন আমার প্রতি সবচে' বেশি শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহলে এই যে আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করল, নিশ্চয়ই এটাও শুভাকাঙ্ক্ষার কারণেই করেছে। কাজেই এটা মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

# বউ-শাশুড়ির মধ্যে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

এমনিভাবে সবর করতে হবে ভাইবোনের পারস্পরিক সম্পর্কেও। সবর থাকতে হবে শাশুড়ি এবং পুত্রবধুর পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর। আজকাল অধিকাংশ পরিবারে শাশুড়ি এবং ছেলের বউয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই। এটা জগতের একটা বড় সমস্যা। আলহামদুলিল্লাহ! যেখানে দীন আছে, দীনের বুঝ যেখানে আছে, সেখানে সম্পর্ক ঠিক আছে। যেখানে দীনের বুঝের অভাব, সেখানে শাশুড়ি এবং ছেলের বউয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। এখানেও সবর করতে হবে, বউ এবং শাশুড়ি দু'জনকেই। শাশুড়ি মনে করবে, আমার বউ অল্প বয়সের মানুষ, অভিজ্ঞতা নেই, সে কারণে ভুলত্রুটি হয়ে গেছে, কিংবা জ্ঞানের অভাবের কারণে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে। বউয়ের তো উচিত শাশুড়িকে মায়ের মতো মনে করা। কিন্তু যদি কখনো এমন হয় যে, মায়ের মতো ব্যবহার করল না; খারাপ ব্যবহার করল, তাহলে শাশুড়িকে বুঝতে হবে, কম বয়স, অভিজ্ঞতার অভাব, বুঝ কম, এজন্যই এমন ব্যবহার করে ফেলেছে। যখন বুঝ হবে তখন এমন আর করবে না। ছেলেমানুষ, বাচ্চা মানুষ, এ কথা মনে করে যদি ক্ষমা করে দেয়, তাহলে বউ মনে করবে, আমার শাশুড়ি তো আমার মায়ের মতোই দেখা যায়। তিনি যেমন তার মেয়েকে ক্ষমা করেন, আমাকেও তেমনি ক্ষমা করেন। অনেক শাশুড়ি আছে, মেয়ের দশটা দোষ ক্ষমা করে, কিন্তু বউয়ের একটাও ক্ষমা করতে রাজি নয়। মেয়েকে এবং ছেলের বউকে এক চোখে দেখে না। আলহামদুলিল্লাহ! দীন যাদের মধ্যে আছে তারা তো দেখে। কিন্তু দীনের বুঝ যাদের মধ্যে কম তারা এমন করে না; বরং সবসময় ছেলের বউয়ের দোষ ধরে। তাকে একটা পরীক্ষার মধ্যে ফেলে রাখে। কখন কী কাজ কীভাবে করে তা লক্ষ রাখে, অথচ মেয়ের দিকে লক্ষ রাখে না। আর এসব করে অশান্তি হয়ে যায়। কিন্তু শাশুড়ি যদি মনে করে, আমার ঘরে নতুন একটা মেয়ে আসল, আমার মেয়ের যেমন দোষ-ত্রুটি আমি ক্ষমা করে দিই, আমার মেয়ের ব্যবহারে যেমন আমি সবর করি, ঠিক ওইরকম তার ব্যবহারেও আমি সবর করব। ব্যস, তাহলে তো সহজ হয়ে যায়।

ঠিক ওইরকম ছেলের বউ যদি মনে করে, আমি বাড়ি থাকা অবস্থায় আমার মা তো আমাকে কত বকত! আমি তা সহ্য করতাম। কাজেই এখানে আমি এক নতুন মায়ের কাছে এসেছি। আমার এ নতুন মা'ও তো তেমনি বকতেই পারে। মা মেয়েকে বকা দেবে, এটা তো স্বাভাবিক কথা। এ চিন্তা করে সে যদি সবর করে, ব্যস, তাহলেই আর কোনও গণ্ডগোল থাকে না। তাহলে শাশুড়ি এবং ছেলের বউয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকবে। সুসম্পর্ক থাকে না এভাবে চিন্তা না করার কারণে, ধৈর্যের অভাবে। ধৈর্য ধরতে হবে ছেলের বউকেও এবং ধৈর্য ধরতে হবে শাশুড়িকেও। তাহলে ঘরে শান্তি থাকবে। সব জায়গাতেই ধৈর্য দরকার।

## চলার পথে ধৈর্যধারণ

সব জায়গায় ধৈর্য দরকার। কাজের লোকের সঙ্গে ব্যবহারে, প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যবহারে, সর্বত্র। মানুষের সঙ্গে আচার-আচরণ যেখানে হয়, পারস্পরিক সম্পর্ক যেখানে আছে, সব ক্ষেত্রেই। এমনকি কারো রিকশায় গেলাম, যানবাহনে উঠলাম, সেখানেও ধৈর্যের সঙ্গে থাকতে হবে। এমন হতেই পারে, রিকশার চালক বা বাসচালক এমন কোনও ব্যবহার করে বসেছে যে, মেজায গরম হয়ে যাওয়ার কথা, ওইখানে মেজায ঠিক রাখলে নিজের ইজ্জত ঠিক থাকবে। মেজায ঠিক থাকবে না, তো ইজ্জত হারাবে। ইজ্জত হারানো তো অনেক বড় ক্ষতি।

একবার এমন হল, রমাযানে এক মুরুব্বী এক রিকশায় যাচ্ছেন। মালিবাগ এলাকায়। তখন রিকশাচালক কী যেন বলেছে, আর অমনি সে লাঠি তুলেছে, রিকশাচালককে পেটাবে। এখন রিকশাচালক যদি তার সাথে ওইরকম ব্যবহার করে, তাহলে অবস্থা কী হবে? একবার বায়তুল মোকাররমে এরকম হল যে, যাত্রী জুতা হাতে নিয়েছে রিকশাচালককে পেটাবে, তাও জুতা দিয়ে। রিকশাচালক বলল, আপনি জুতা হাতে নিলেন আমাকে মারার জন্য, আমি যদি নিই? ব্যস, তার তো জুতা হাতে নেওয়ার দরকার নেই। কথাই যথেষ্ট। ইজ্জতটা থাকল কোথায়? সবরের অভাবে ইজ্জত হারাল। যদি সে সবর করত আর মনে

করত, রিকশাচালক বোঝে না বলে আমার সাথে এমন আচরণ করেছে, ব্যস, তাহলে তো ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেত। সবরও করল না, ইজ্জতটাও হারাল।

## গৃহকর্মীর সঙ্গে ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা

ঘরে এমন হয় যে, যারা কাজ করে তাদের সাথে কেউ সবর করে না, ধৈর্য ধরে না। ফলে তারা উল্টাপাল্টা করে। খলিফা মামুনুর রশীদ একবার মজলিস শেষে ডাক দিল, ইয়া গোলাম! হে গোলাম! গোলামকে ডাক দিলেন আর সে সামনে আসল। গোলাম এসে বলল, আপনি কী পেয়েছেন? একটু পর পর 'ইয়া গোলাম' 'ইয়া গোলাম' করেন। আমাদের বুঝি নাওয়া খাওয়া নেই, আমাদের বুঝি বিশ্রাম নেই, সারাক্ষণ যে ব্যস্ত করে রাখেন! মামুনুর রশীদ কে? আব্বাসীয় খলিফা। তার রাজত্ব কত বড়? আয়তনে বাংলাদেশের মতো একশোটার সমান হবে। বিশাল রাজত্ব তার। কত তার ক্ষমতা! তার সভায় যে সমস্ত লোক ছিল, তাদের লক্ষ্য করে মামুনুর রশীদ বললেন: দেখুন, কেমন ব্যবহারটা করছে আমার সাথে! ব্যবহারটা এমন করছে কেন জানেন? করছে এজন্য যে, এদের সবকিছু আমি হজম করি। এদের সব কিছুতে আমি ধৈর্য ধরি। তাই এরকম ব্যবহার করছে। তবে তারা আমার সাথে যতই এমন ব্যবহার করুক, আমার তো ধৈর্য ধরতেই হবে।[১০২] কারণ তারা যেরকম ব্যবহার আমার সাথে করছে ওরকম ব্যবহার যদি আমিও তাদের সাথে করি, তাহলে তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য থাকল কী? পার্থক্য কোথায়? আমি এত বড় সাম্রাজ্যের খলিফা! আমার ব্যবহার তাদের মতোই যদি হয়, তবে আমি আবার কী খলিফা হলাম! গোলামের মতো আমিও ব্যবহার করলে তো আমিও গোলাম হয়ে গেলাম। দেখুন, কী রকমের চিন্তা! এরকম চিন্তা তো আমরাও করতে পারি। কেউ যদি আমার সাথে কোনও দুর্ব্যবহার করে, তা যেই হোক,

---

১০২. দ্রষ্টব্য : আল-মুস্তাতরাফ ১/২৬০

আমাকে সবর করতে হবে। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করলাম। একজনের কাছ থেকে আমি মাছ কিনছি। কিনতে গিয়ে তার সঙ্গে আমার ঝামেলা লেগে গেল। এক পর্যায়ে ওই লোক একটা বাঁকা কথা বলল। এখন যদি আমি তার সাথে তার মতোই ব্যবহার করি, তাহলে কেমন হল? সেখানে তো আমার ইজ্জত থাকবে না। সে যদি আমাকে কোনও গরম কথা বলে ফেলে, তাহলে কি ইজ্জত থাকবে? থাকবে না।

## অধৈর্যের অজস্র ক্ষতি

ধৈর্য না থাকলে সব জায়গাতেই ক্ষতি হয়ে যায়। বাজারে ক্ষতি হয়। রাস্তায় ক্ষতি হয়। দোকানে ক্ষতি হয়। ঘরে ক্ষতি হয়। সব জায়গায় ক্ষতি হয়। সব রকমের ক্ষতি হয়। হয় ইজ্জত যাবে, না হয় টাকা যাবে, না হয় সময় যাবে, কিংবা স্বাস্থ্য যাবে। সব কিছুই যাবে। ধৈর্য না থাকলে সব রকম ক্ষতি হয়ে যাবে। ছেলেমেয়ে নষ্ট হবে। স্বামী স্ত্রী হারাবে। স্বামী যদি ধৈর্য না ধরে তাহলে স্ত্রী হারায়। দুইভাবে হারায়। এক তো হল এই, সে ঘরে হয়তো আছে কিন্তু তার মন পেল না। কবর পর্যন্ত সে তার মন পেল না। এভাবেই স্ত্রীর মন না পেয়ে সে কবরে গেল। স্ত্রী ঘরে আছে, কিন্তু সত্যিকারভাবে সে তাকে পেল না। আবার অনেক সময় এমন হয় যে, স্ত্রী বলেই বসে– তোমার ঘর আমি আর করব না। পরে বাবার বাড়ি চলে যায়, আর ফিরে আসে না। বলে– এ লোক খিটমিট করে সবসময়, আমার কোনও কিছুর মূল্য দেয় না, আমি এ ঘর করব না। ব্যস, সে বউ হারাল। আবার এমন হতে পারে যে, স্ত্রী স্বামী হারাবে। ঘরে যখনই স্বামী আসে, তার কোনও কিছুতেই ধৈর্য ধরে না। কোনও কিছুই সহ্য করে না। তো সে এ স্বামীর মন পাবে না। কিংবা এমন হতে পারে যে, এ স্বামী আরেক মেয়ের পেছনে ঘুরবে। এভাবে হয় স্ত্রী স্বামী হারাবে, কিংবা স্বামী স্ত্রী হারাবে। সবরকম ক্ষতির সম্মুখীন সে হবে। বাবা তার সন্তানকে পাবে না, কিংবা সন্তান তার বাবাকে পাবে না। বাবার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, দুআ সে পাবে না।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

আল্লাহর কালাম বলছে, এ চার গুণের কোনও এক গুণ যদি না থাকে, তাহলে সব রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে। আল্লাহর কালাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সবচে' বড় সত্য, সবচে' বেশি বাস্তব। এর চেয়ে বাস্তব, এর চেয়ে বেশি সত্য জগতে আর কিছু নেই। যে যত বেশি ধৈর্য ধরবে, সে তত বেশি লাভবান হবে।

## কথার পিঠে কথা না বলার ধৈর্য

একজন আমার সাথে কটু কথা বলল, আমি যদি চুপ থাকি, আমি যদি আমার মুখ বন্ধ রাখি, ব্যস, বেঁচে গেলাম। আর যদি মুখ ছাড়তে শুরু করি, তাহলে ইজ্জত হারাব। সব হারাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ صَمَتَ نَجَا

যে ব্যক্তি চুপ থাকে সে মুক্তি পায়।[১০৩]

চুপ থাকার জন্য ধৈর্য দরকার। যার ধৈর্য নেই সে চুপ থাকতে পারে না। চুপ থাকার জন্য এত বেশি ধৈর্য দরকার যে, এত ধৈর্য আর কোনও কিছুতেই দরকার নেই। জগতে সবচে' বেশি ধৈর্য দরকার হল চুপ থাকার মধ্যে। সবেচেয়ে বেশি মনোবল আর মানসিক শক্তি দরকার চুপ থাকার জন্য। ঠোঁট বন্ধ হতে চায় না। মুখ শুধু খোলার জন্য ছটফট করে। জিহ্বা যেন কেমন করে। কিছু বলতে চায়। দু কথা শোনাতে মন চায়। দু কথা শুনিয়ে তারপর বলে, হুম, দুই কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

যেখানে দু-চারজন মহিলা একত্র হয় কিংবা দু-চারজন পুরুষ একত্র হয়, সেখানে এ জাতীয় কথা হয়– 'দুই কথা শুনিয়ে দিয়েছি।' শুনিয়ে দেওয়াটাকেই বীরত্ব মনে করি আমরা। আসলে না শোনানোই বীরত্ব। সত্যিকারের বীরত্ব হল দুই কথা না শোনানো। দুই কথা শুনিয়ে দিয়েছি যে বলল, এর কারণ হল তার মধ্যে শক্তি নেই। তার মধ্যে মানসিক শক্তি নেই। ধৈর্যশক্তি নেই। শক্তির অভাব। এজন্যই সে দুই

---

১০৩. জামে' তিরমিযী : ২৫০১

কথা শুনিয়েছে। সে নিজ রাগ দমন করতে পারেনি। হেরে গেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

ওই ব্যক্তি বীর নয়, যে কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দেয়। মাটিতে আছড়ে ফেলে দেয়। প্রকৃত শক্তিমান বীর সে-ই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।[১০৪]

তো দুই কথা না শোনানোটা অনেক বড় ধৈর্যের বিষয়। মুখ বন্ধ করার ধৈর্য যাদের আছে, তাদের মতো বীরপুরুষ জগতে আর নেই। সবচে' বড় বীর সেই, যে নিজের মুখটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমাদের এ শক্তি দরকার। দরকার এ ধৈর্যশক্তি– মুখ বন্ধ রাখার ধৈর্য। এটা আমাদের দরকার। এটা যদি অর্জন করতে পারি, তাহলে দুনিয়াতেও শান্তি এবং আখিরাতেও মুক্তি। দুনিয়ায় শান্তি আর আখিরাতে মুক্তির জন্য মুখ বন্ধ করার মতো ধৈর্য অবশ্যই দরকার। আল্লাহ তাআলা এমন তাওফিক আমাদের সবাইকে দান করুন – আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



১০৪. সহীহ মুসলিম : ৬৮০৯



# ঈমান ও ইসলামের জন্য সত্যিকারের শুকর

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

এবং সেই সময়টাও স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে জেনে রেখো আমার শাস্তি অতি কঠিন।[১০৫]

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর মেহেরবানি যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে, তাঁকে খুশি করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে এ তাওফিক দিয়েছেন যে, আমরা নিজেদের সংশোধন করার চেষ্টায় মশগুল হতে

১০৫. সূরা ইবরাহীম : ৭

পারি। আমরা এখানে আসি কেবলই নিজেদেরকে সংশোধন করার জন্য। বক্তার নিজের উদ্দেশ্যও তাই– কীভাবে আমার সংশেধন হতে পারে, আমার ইসলাহ হতে পারে। যারা এখানে আসে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যও তাই। আমরা নিজেদের সংশোধন করতে চাই। আল্লাহ তাআলা যে আমাদের এ তাওফিক দিয়েছেন এটা আল্লাহ তাআলার খাস মেহেরবানি। আমরা সামান্য সামান্য কিছু সংখ্যক লোক এখানে বসতে পারছি। আরো কতজন জানে, শোনে, তারা তো বসছে না বা বসার আগ্রহ বোধ করছে না। এ আগ্রহ যে আমাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে, এটা আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এজন্য আমাদের শুক্‌র আদায়ের দরকার আছে।

আমি যে আয়াত পড়েছি সে আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, শুক্‌র আদায় করো।

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"যদি শুক্‌র কর, আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দেব।" তার মানে আমরা যখন যে নিআমতের শুক্‌র আদায় করব, আল্লাহ তাআলা সেই নিআমত আমাদের আরো বেশি দেবেন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিআমত দিয়েছেন কত, কারো পক্ষে হিসাব করে শেষ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

> তোমরা আল্লাহর নিআমতসমূহ গুণতে শুরু করলে, তা গুণতে সক্ষম হবে না। বস্তুত মানুষ অতি অন্যায়াচারী, ঘোর অকৃতজ্ঞ।[১০৬]

## সবচে' দামি নিআমত মুফতে পাওয়া

আল্লাহ আমাদেরকে যত নিআমত দিয়েছেন তার মধ্যে সবচে' বড় নিআমত হল ইসলামের নিআমত। আমাদেরকে তিনি মুসলিম বানিয়েছেন।

---

১০৬. সূরা ইবরাহীম : ৩৪

মুসলিম আমরা জোর করে হইনি, চেয়ে হইনি; আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় বানিয়েছেন। দুনিয়ায় আরো কত মানুষ আছে, তারা ইসলাম মানে না, তারা মুসলিম নয়। আমরা মুসলিম কেন? এটা কি আমাদের নিজেদের অর্জন? নিজেরা চেষ্টা করে, সাধনা করে মুসলিম হয়েছি? কক্ষনো নয়। আল্লাহ তাআলা দয়া করে মুসলিম বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম দিয়েছেন তাই মুসলিম হয়েছি। একদম মুফতে পেয়েছি। আমরা ইসলাম পেয়েছি বিনামূল্যে। ইসলাম এক নিআমত। আবার পেয়েছি বিনামূল্যে, এটা আরেক নিআমত। এটা যদি মূল্য দিয়ে পেতে হত, তখন!

সাহাবায়ে কেরাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যারা শিষ্য ছিলেন, তারা তো মূল্য দিয়েই পেয়েছিলেন। তাদেরকে ইসলাম পাওয়ার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে! জান দিতে হয়েছে। মাল দিতে হয়েছে, ইজ্জত দিতে হয়েছে, দেশ ছাড়তে হয়েছে। কত মূল্য তাদেরকে দিতে হয়েছে! আমরা পেয়েছি একদম মুফতে। মুমিন হওয়ার জন্য কোনও রকমের ত্যাগ আমাদেরকে স্বীকার করতে হয়নি। মুসলিম হওয়ার জন্য আমাদেরকে কিছু ছাড়তে হয়নি। এমন মুফতে পেয়েছি, বিনামূল্যে পেয়েছি, তারপরও শুক্‌র আদায় করি না। আর যারা ত্যাগ স্বীকার করে পেয়েছিলেন, জানমাল দিয়ে পেয়েছিলেন, তারাও মনে করতেন, এ বিশ্বাসই করতেন যে, আমরা ত্যাগ করে পাইনি; আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। এর জন্য তারা কত শুক্‌র আদায় করতেন! সবচে' বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকেও দীনের জন্য কত কষ্ট করতে হয়েছে! এত ত্যাগ স্বীকার করার পরও তিনি এটা বলেননি যে, আমি তো কত ত্যাগ স্বীকার করছি! আমার আর কী কাজ? এখন আমার পুরস্কার পাবার পালা। মোটেই নয়। বরং তিনি তো বলতেন–

أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

আমি কী শুক্‌রগুজার বান্দা হব না?[১০৭]

---

১০৭. সহীহ বুখারী : ১১৩০

তিনি মনে করতেন, আমার প্রতি এটা আল্লাহর দান। এ দীন ইসলাম, এ নবুওয়ত, এসবই আল্লাহ তাআলার দান। এজন্যই আমাদের কর্তব্য শুক্‌র আদায় করা। আমরা বিনামূল্যে পেয়েও শুক্‌র আদায় করছি না। তিনি এত কষ্ট করার পরও সারা জীবন শুকরিয়া আদায় করে গেছেন। আমরা তো জানি কত কষ্ট তিনি করেছেন।

## উহুদের যুদ্ধে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জখম হওয়া

উহুদের যুদ্ধে কত আঘাত তাকে সইতে হয়েছে! সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে, উহুদ যুদ্ধেই তিনি সবচে' বেশি কষ্ট করেছেন। এজন্য আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহুদে আপনার যে কষ্ট হয়েছিল, এরচেয়ে বেশি কষ্ট কখনো পেয়েছেন?

উহুদে শত্রুর আঘাতে তাঁর মাথায় যে লোহার টুপি ছিল সেটা ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তার কড়া তাঁর মাথার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। এমনিভাবে আঘাত লেগেছিল তাঁর মুখে। যে কারণে, তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে গিয়েছিল। দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। সে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, ওই জাতি কী করে সফল হতে পারে, যে জাতি তাদের নবীকে এভাবে রক্তাক্ত করতে পারে? এত আঘাত পেয়েছিলেন উহুদের ময়দানে, এত জখম তার হয়েছিল, শত্রুরা মনে করেছিল, তিনি বুঝি মারাই গেছেন। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এজন্য প্রচারও করা হয়েছিল, মুহাম্মাদ শহীদ হয়ে গেছে, মারা গেছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন এ কথা ছড়িয়ে পড়েছিল।

আহত অবস্থায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন পাহাড়ের একটা গুহায়। মুসলমান সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে উহুদে তো মুসলমানদের পরাজয় হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্যে সত্তর জন শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, সত্তর জন জখম

হয়ে ছিলেন। আর কী ভয়াবহ অবস্থা! এরপর যখন শত্রুরা ফিরে যায়, তখন ভয় ছিল যে শত্রুরা আবার আক্রমণ করতে পারে। এ চিন্তায় সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে নিয়ে উহুদের পাশেই একটা গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল, পরে সেখান থেকে নিয়ে রাখা হয় আরেক জায়গায়।

এত আঘাত পেয়েছেন, এত জখম হয়েছেন, যে সবাই মনে করেছে তিনি বুঝি শহীদ হয়ে গেছেন। এক সময় আবূ সুফয়ান চিৎকার করে ডাকল–

أَ فِيكُم مُحَمَّد؟

মুহাম্মাদ কী আছে বেঁচে?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাশে যারা ছিলেন তাদেরকে বললেন, কোনও আওয়াজ করো না। তারা মনে করেছে যে, তিনি বুঝি আর বেঁচে নেই। এরপর আবার ডাক দিয়েছে–

أَ فِيكُم أَبُو بَكْرٍ؟

তোমাদের মধ্যে আবূ বকর আছে?

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোনও আওয়াজ করো না। তারা মনে করেছে, তিনিও নেই। এরপর আবার ডাকল,

أَ فِيكُم عُمَر؟

উমর আছে কি?

ইনি তো উমর রাযি.। চিৎকার করে বললেন, আল্লাহ তোদের ধ্বংস করার জন্য নবীকে, তাঁকে, সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।[১০৮]

## তায়েফে তাঁকে যেভাবে কষ্ট দেওয়া হয়েছিল

যাহোক, উহুদে তাঁর যে কষ্ট হয়েছিল, সেটা ভয়াবহ কষ্ট! এজন্য আম্মাজান আয়েশা রাযি. প্রশ্ন করলেন, এর থেকে বেশি কষ্ট কি আপনি কখনো পেয়েছেন?

---

১০৮. সহীহ বুখারী : ৩০৩৯

বললেন, হ্যাঁ, আয়েশা! তোমার কওম তায়েফে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে সে কষ্ট এর চেয়েও বেশি ছিল।[১০৯] তায়েফে তিনি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলেন। মক্কার লোকে কথা শোনে না, কেউ ঈমান আনে না। তিনি হতাশ হয়ে গেছেন। শেষে অনেক আশা নিয়ে গেলেন তায়েফে। এখানকার লোক হয়তো ঈমান আনবে! সেখানে গিয়ে তিনি তিন ভাইকে দাওয়াত দিলেন– আবূ ইয়ালীল, মাসঊদ এবং হাবীব। আমর ইবন উমায়রের ছেলে এ তিনজন। এরা ছিল তায়েফের নেতা। তিনি এ তিনজনকে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না, উল্টো তায়েফের বালকদেরকে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিল। তিনি হতাশ হয়ে তায়েফ থেকে ফিরে আসছেন, আর ওই বালকেরা পেছন থেকে পাথর মারছে। তাঁর পা লক্ষ্য করে পাথর মারছে। অনবরত পাথর ছুড়ছে। আর তিনি ফিরে চলেছেন।

'সীরাতে ইবন হিশাম'-এ লেখা হয়েছে– এমনও হয়েছে যে, কখনো কখনো তিনি সইতে না পেরে পড়ে গেছেন। যখন পড়ে গেছেন, ওরা তখন হাসাহাসি করেছে। বালকেরা তো মনে করেছে, এ বুঝি এক পাগল। বালকেরা যদি পাগলের পেছনে লাগে, তাহলে কী করে? ওরা তো মনে করছে আমরা পাগলের পেছনে লাগলাম। এমনও হয়েছে যে, আর সইতে না পেরে পড়ে গেছেন। তখন ওরা সবাই মিলে ধরে তাকে দাঁড় করিয়েছে। এরপর তিনি আবার হাঁটা শুরু করেছেন। তারা আবার পাথর মারা শুরু করেছে। কত কষ্ট সয়েছেন! কী রকমের নির্যাতন করা হয়েছে!

এভাবে চলতে চলতে তিনি একটা খেজুর বাগানে এসে ঢুকলেন। সঙ্গে খাদেম যায়েদ। ওই খেজুর বাগানটা ছিল উতবা এবং শায়বা নামক দুই ভাইয়ের। উতবা এবং শায়বা হল রবীআর ছেলে। এরা মক্কার দুই নেতা। এরাও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোর শত্রু। তারাও পারলে জানে মেরে ফেলে। কিন্তু এবার তাদের মায়া লেগেছে। কারণ, হাজার হলেও তাদের বংশের লোক। তাদের এলাকার লোক।

---

১০৯. সহীহ মুসলিম : ১৭৯৫

কুরাইশ গোত্রের লোককে তায়েফের ছাকীফ গোত্র এভাবে নির্যাতন করবে এতে তাদের মায়া লেগেছে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই এলাকায় গিয়েছিলেন, এর আরো একটা কারণও আছে। তিনি শৈশব কাটিয়েছিলেন এ এলাকায়। তাঁর দুধ মা হালিমা সা'দিয়্যাহ ছাকীফ গোত্রের ছিলেন। তাঁর শৈশব এ এলাকায় কেটেছে। এটাও একটা আশা ছিল যে, শৈশব ওখানে কাটিয়েছি, সে হিসেবে আমি তো তাদেরও সন্তান। কিন্তু কাজ হয়নি। তারা সাড়া দেয়নি। উতবা এবং শায়বা যখন দেখল তাদের বংশের লোককে ছাকীফ গোত্রের লোকেরা এমন নির্যাতন করেছে, তাদের একটু মায়াই লাগল। ওই বাগানে তাদের গোলাম ছিল আদ্দাস। তারা এ গোলামকে বলল, যাও! এ খেজুরগুলো তাঁকে খেতে দাও। একটা পাত্রে করে কিছু খেজুর দিল এবং বলল, এ খেজুরগুলো তাকে নিয়ে খেতে দাও। আদ্দাস এগুলো নিয়ে এসে তাঁকে খেতে দিল।

## উতবা ও শায়বার গোলাম আদ্দাসের ঘটনা

তিনি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন। ক্লান্ত শরীর। খেজুর খেলে যদি একটু ক্লান্তি দূর হয়! বিসমিল্লাহ বলে খেজুর খাওয়া শুরু করলেন। আদ্দাস অবাক হয়ে গেল। আদ্দাস ছিল খৃষ্টান। সে অবাক হয়ে বলল, আপনি বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন? এ এলাকার কাউকেই তো বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করতে দেখি না! কত বছর যাবৎ আমি এ এলাকায় আছি, কাউকে বিসমিল্লাহ বলতে শুনিনি। আপনি আল্লাহর নামে খাওয়া শুরু করলেন?! তিনি প্রশ্ন করলেন– আদ্দাস! তুমি কোন এলাকার লোক? বলল, আমার বাড়ি হল নিনাওয়া। [আরবীতে বলে নিনাওয়া, ইংরেজিতে নিনেভা।] বললেন– তাই? তুমি ইউনুস ইবন মাত্তার এলাকার লোক? আদ্দাস আবারো অবাক হল। বলল, আপনি ইউনুস ইবনু মাত্তাকে চেনেন? আমি তো নিনাওয়ায় দশজন লোককেও দেখিনি, যারা ইউনুস ইবন মাত্তাকে চেনে। অথচ ইউনুস ইবন মাত্তা নিনাওয়ার লোক, কিন্তু সেই নিনাওয়ার দশজন লোকও তাকে চেনে না।

কারণ ইউনুস আলাইহিস সালাম নবী। কবে শত শত বছর আগে চলে গেছেন! তাকে তো এখন নিনাওয়ার লোকেরাই তো ভুলে গেছে। আপনি কীভাবে চেনেন? বললেন– তিনি আমার ভাই। কারণ তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন, আমিও আল্লাহর নবী।

এ কথা আদ্দাসের বিশ্বাস হয়ে গেল। কারণ– প্রথমেই চমক লেগে গিয়েছে যখন বিসমিল্লাহ বলে খেয়েছেন। এ তো নবুওয়াতী শিক্ষা। আল্লাহর নামে খাওয়া নবুওয়াতী শিক্ষা। এই নবুওয়াতী শিক্ষা এ উম্মী লোক কোথায় পেল? তারপর আবার ইউনুস আলাইহিস সালামকে চেনেন! এ তো কারো চেনার কথা নয়! আর উম্মী লোক কী করে চেনবে? কাজেই নিশ্চয়ই ইনি নবী হবেন।

সঙ্গে সঙ্গে আদ্দাস উঠে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কপালে চুমু খেলেন। হাতে-পায়ে চুমু খেলেন। এটাও ওই দুই ভাই লক্ষ করেছে। উতবা এবং শায়বা লক্ষ করেছে তাদের গোলাম মুহাম্মাদের হাতে-পায়ে-কপালে চুমু খেয়েছে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা গোলামকে ডেকে নিল এবং জিজ্ঞেস করল– তুমি এগুলো করলে কেন? সে বলল, ইনি একজন নবী।

তুমি কী করে জান যে, ইনি নবী।

বলল– কাহিনী হল এই এই। নবী ছাড়া কারো পক্ষে এসব জানা সম্ভব নয়।

আদ্দাস! সাবধান! এ তোমাকে জাদু করেছে। তোমাকে কিন্তু বেঈমান বানিয়ে ফেলবে। তোমার ঈমান শেষ করে দেবে। ওরা তো ঈমান মনে করে মূর্তিপূজাকে। মূর্তিপূজা করা, শিরক করা, দেব-দেবীতে বিশ্বাস করা, ওদের তো ঈমান সেটাই।

আদ্দাস কিন্তু খাঁটি মনেই ঈমান এনেছিলেন। আরো কয়েক বছর পরের কথা। যখন তার এ দুই মনিব বদরের যুদ্ধে যায়, তখন পা জড়িয়ে ধরেছিল। বলছিল– দয়া করে আপনারা যাবেন না।

কেন যাব না?

যদি যান, আমার ভয় হয়, আর ফিরে আসতে পারবেন না। কারণ ইনি নবী। সারা জগৎ মিলেও তাঁকে কিছু করতে পারবে না। আল্লাহ তাঁর পাশে আছেন।

একদম পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে আদ্দাস। কিন্তু তারা কথা শোনেনি। তারা বলল, সে তোমাকে জাদু করেছে! তুমি পাগল হয়ে গেছ! কিন্তু আদ্দাসের কথাই ঠিক হল। বদর যুদ্ধে উতবা-শায়বা দু'জনই নিহত হয়েছে, ফিরতে পারেনি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে এত কষ্ট করেছেন, যত কষ্ট আর কখনো করেননি। তিনি একটু এগিয়ে নাখলা নামক একটা জায়গায় গিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলেন। বললেন,

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي ، وَقِلَّةَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِي؟ إِلَى عَدُوٍّ يَتَجَهَّمُنِي ، أَمْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي ،

হে আল্লাহ! আমি দুর্বল। আমার শক্তি নেই। আমি অত কৌশলও জানি না। আল্লাহ, তুমি তো দয়াময়। তুমি দুর্বলদের রব্ব। আল্লাহ, তুমি আমার রব্ব। আল্লাহ, তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিচ্ছ? দূরের এমন লোকের হাতে ছেড়ে দিচ্ছ, যারা আমার উপর হামলা করে? নাকি এমন শত্রুর হাতে, যাকে তুমি আমার উপর আধিপত্য দিয়ে দিয়েছ?

إِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانًا عَلَيَّ ، فَلاَ أُبَالِي

হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার উপর নাখোশ না থাক, আমি কোনও কিছুর পরোয়া করি না

غير أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي

তবে আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা চাই। এ নিরাপত্তাই আমার জন্য বেশি কল্যাণকর।

তুমি আমাকে সব শত্রু থেকে, দুশমন থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও। এরপর লম্বা দুআ করলেন–

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَال اٰخرةِ

আমি তোমার নূরের আশ্রয় চাই, যে নূরের দ্বারা জগতের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সবকিছুর কল্যাণ তার দ্বারা সাধিত হয়।[১১০]

## জিনদের ইসলাম গ্রহণ

তিনি দুআ করলেন। এ দুআ আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে গেল। ঠিক ওই সময় একদল জিন এদিক দিয়ে যাচ্ছিল আর তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করছেন। শেষ রাতের তিলাওয়াত। এমনি আল্লাহর কালামের মতো মধুর জগতে তো আর কিছুই নেই। আল্লাহর কালামের মতো মাধুর্য, এত স্বাদ জগতে আর কোনও কিছুতে পাওয়া যায় না। আবার তিলাওয়াত করছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে। সময়টাও শেষ রাত। সবটাই এমন যে, মনে আছর করার মতো। ওই সময় একদল জিন এদিক দিয়ে যাচ্ছিল।

সেখানেও ঘটনা আছে। এর আগে জিন জাতি আসমানে যেতে পারত। কিন্তু যখন আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহী দিলেন, তাঁকে নবুওয়াত দিলেন, ওই সময় আসমানে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। এখন আর জিন জাতি আসমানে যেতে পারে না। জিনেরা পেরেশান হয়ে গেল। ব্যাপার কী? আমরা আগে প্রথম আসমানে যেতাম আর ওখানে কান পেতে শুনতাম। ফিরিশতারা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে তা শুনতাম। তখন এমন হত যে, ফিরিশতারা আমাদের তাড়িয়ে দিত। আবার কখনো লুকিয়ে শুনতামও।

---

১১০. তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর : ১৪৭৬৪

অনেক কিছু বুঝতাম আবার অনেক কিছু বুঝতাম না। যেটা বুঝতাম সেটা গণকদের এসে জানাতাম। গণকরা সেটা বলত আর সেটা সত্যে পরিণত হত। আবার গণকরা সে একটা সত্যের সাথে আরো নিরানব্বইটা মিথ্যা লাগাত। এভাবে গণকরা মানুষের মধ্যে রাজত্ব করত। এখন আমরা আসমানে যেতে পারি না। ব্যাপার কী?

এটা কি মানুষের কল্যাণের জন্য? নাকি মানুষের কোনও ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে? এজন্য তারা পুরো পৃথিবী চষে বেড়াতে লাগল। জিনরা তাদের প্রতিনিধিদল পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। তোমরা খুঁজে দেখো, জগতের কোথায় কী হচ্ছে। একদল জিন এদিক দিয়ে যাচ্ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতের আওয়াজ তাদের কানে পড়ে গেল। উড়ন্ত অবস্থায় তারা তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তারা নামল। নেমে তারা একটা গাছের আড়ালে থেকে মনোযোগ দিয়ে কুরআন শুনছিল। কুরআন শুনে তাদের মনে হয়ে গেল– এই সেই ঘটনা, যে কারণে আমাদেরকে আসমানে যেতে দেওয়া হয় না। কুরআন যাতে নিরাপদে নাযিল হতে পারে, জিন জাতি এর কোনও ক্ষতি করতে না পারে, এর মধ্যে কোনও কিছু মিশিয়ে দিতে না পারে, এর জন্য আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন। নিশ্চয়ই এ কালামের কারণেই। আল্লাহর এ কালামের কারণেই আমাদের আসমানে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কণ্ঠে কুরআনের তিলাওয়াত শুনে এত মুগ্ধ হল যে, তাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মে গেল যে– এটা আল্লাহর কালাম আর তিনি একজন নবী। তখন তারা সাতজন ছিল। সাতজনই ঈমান আনল। এরপর তারা তাদের এলাকায় ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে অন্যান্য জিনকে দাওয়াত দিল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۔

(হে রাসূল!) বলে দাও, আমার কাছে ওহী এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে অতঃপর (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরীক করব না।[১১১]

আমরা এক আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা মানুষকে হিদায়াতের পথ দেখায়। আমরা তাতে ঈমান এনেছি। তোমরাও ঈমান আনো। বিশাল এক ওয়াজ আছে এখানে, সূরা জিনে। সূরা আহকাফের শেষে আছে– জিনদের প্রতিনিধিদল দেশে গেল আর তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিল।

যাহোক, বলছিলাম এ কথা– যার প্রতি ওহী নাযিল হয়েছিল, তিনি এ ওহীর জন্য এবং ওহী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, দাওয়াত দেওয়ার জন্য কত কষ্ট করেছেন! কত কষ্ট তিনি করেছেন! এরপরও বলতেন–

আমি কি শুক্‌রগুযার বান্দা হব না! অথচ এটা আমরা পেয়েছি মুফতে, বিনামূল্যে। আমাদের তো ডাবল নিআমত। এক তো হল ঈমান-ইসলাম পেয়ে গেছি, আবার পেয়ে গেছি বিনা মূল্যে। আমাদের কত বেশি শুক্‌র আদায় করা দরকার? সাহাবায়ে কেরামও শহীদ হয়েছেন। জান দিয়েছেন। মাল দিয়েছেন। রক্ত দিয়েছেন। তারপরও তারা সারা জীবনই শুক্‌র আদায় করেছেন। কিন্তু আমাদের কী হল? মাগনা পেয়েও আমরা এর জন্য শুক্‌র আদায় করি না।

কেউ বলতে পারে– না, আমরা করি তো। কী বলেন আপনি? আমরা তো শুক্‌র আদায় করি! আমরা গর্ব করে বলি– আমরা মুসলমান। আমি ঈমানদার। এতেই তো শুক্‌র আদায় হল। আসলে এটা যথার্থ শুক্‌র আদায় না। এটা খানিকটা শুক্‌র আদায় হলেও হতে পারে। আসলে শুক্‌র তিন জিনিসের নাম।

---

১১১. সূরা জিন : ১-২

# ঈমান ও ইসলামের জন্য মন-মস্তিষ্কের শুক্‌র

একটা হল মনের উপলব্ধি। মনে এ কথা ভাবা যে, ইসলামের চেয়ে মহামূল্যবান নিআমত জগতে আর কিছু নেই। ইসলামের মধ্যেই মুক্তি। দুনিয়া ও আখিরাত এ দুই জায়গার সাফল্যই ইসলামের মধ্যে। এর ফলে মানুষের পার্থিব জীবন শান্তির হয়ে যায়, সুখের হয়ে যায়, শৃঙ্খলার হয়ে যায়, নিরাপদ হয়ে যায়, শান্তিময় হয়ে যায় এবং পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, জানে-মালে বরকত হয়। মোটকথা মানুষের জীবন একটা আদর্শ জীবন হয়। দুনিয়ার যত রকম সাফল্য, যত রকমের সৌন্দর্য, যত রকম মঙ্গল, ভালো যা কিছু সবই ইসলামের মধ্যে, ঈমানের মধ্যে। আর এটা তো দুনিয়ার দুই দিনের জীবনে। মরতে তো সকলকেই হবে। মরার পরে কবর আছে, হাশর আছে। এরপর জান্নাত-জাহান্নামের প্রশ্ন। এ সব জায়গার শান্তি ঈমানের মধ্যে নিহিত।

যে ব্যক্তি ঈমানদার হবে সে কবরে শান্তি পাবে। সে হাশরের ময়দানে আল্লাহর রহমত লাভ করবে। এরপর সোজা জান্নাতে চলে যাবে। আর ঈমান না আনলে সে যত ভালোই হোক না কেন, তার মুক্তি নেই। কাজেই ঈমানের মতো বড় নিআমত আর কিছু নেই। সবচে' বড় নিআমত দুনিয়ায় ঈমান ও ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন, আমি নিজের চেষ্টা-মেহনতে পাইনি। এটা আল্লাহ তাআলার দান। আল্লাহ তাআলা দয়া করে মায়া করে দিয়েছেন এ মহানিআমত– মনে মনে এটা ভাবা ও উপলব্ধি করা।

এর সঙ্গে যোগ হবে এই ভাবনা যে, এত বড় নিআমত যে আমি পেলাম, এতে আমার কোনও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি। পাওয়ার জন্য আমাকে কিছুই করতে হয়নি। একদম মাগনা। বিনামূল্যে আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন– মনে মনে এ কথাটা কল্পনা করা, মাঝেমধ্যে এটা চিন্তা করা। এটা হল শুক্‌রের প্রথম কথা। এটা যদি কেউ মনে মনে ভাবে, তাহলে সে মনের শুক্‌র আদায় করল। প্রথম শুক্‌র আদায় হয় মন দিয়ে। ব্যস, এটা মনের শুক্‌র হল।

## মুখের ও আমলের শুক্‌র

দ্বিতীয়ত, মুখের শুক্‌র। এই যা মনে মনে ভাবলাম, এটা মুখেও স্বীকার করা, তা যে ভাষাতেই হোক। আরবীতে হোক আর বাংলাতেই হোক, এ কথাটা মুখেও স্বীকার করা। এ কথাটা মনে মনে কল্পনা করব আর বলব, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া লাকাশ শুক্‌র। আল্লাহ, তোমার শুক্‌র যে, তুমি আমাকে এক মহানিআমত দান করেছ। এটা হল মুখের শুক্‌র। এক শুক্‌র হল মনের, আরেকটা হল মুখের।

আরেক হল আমলের শুক্‌র। আমলের শুক্‌র নানা রকম আছে। ওই কথা মনে করে আমি গরীবকে দশ টাকা দান করলাম, এটাও আমলের শুক্‌র হতে পারে। এটা মনে করে আমি দুই রাকাত নামায পড়লাম, এটাও হতে পারে। এ কথা মনে করে আমি রোযা রাখলাম তাও হতে পারে। কিন্তু এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল ইসলামকে মানা। যে ইসলাম নামক নিআমত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন সে ইসলাম মেনে চলা। ইসলামের সম্পর্ক আমাদের জীবনের সব কিছুর সঙ্গে। আমার জানের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে, মালের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে। জানের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন নামায পড়া, হজ্জ করা। এগুলোর সম্পর্ক জানের সঙ্গে। মালের সঙ্গে সম্পর্ক হল– আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ দিয়েছেন এর আয়-ব্যয় আল্লাহর হুকুম মোতাবেক করা, আল্লাহর হুকুমের বাইরে নয়। ইসলামের সম্পর্ক আছে আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে, আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে এবং জগতের সমস্ত মানুষের সঙ্গে; বরং সমস্ত মাখলূকাতের সঙ্গে। এদের সবার হক আমি আদায় করব। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করবে সে কথা ইসলাম বলে দিয়েছে। ভাই ভাইয়ের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, বোন ভাইয়ের সঙ্গে এবং ভাই বোনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তা বলে দিয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম যেমন ব্যবহার করতে বলেছে, সেরকম ব্যবহার করা। এগুলোকে বলে শুকরিয়া। ইসলামকে মানা, সবজায়গায় মানা।

ইসলামের মূলমন্ত্র আছে কুরআন মাজীদে। কাজেই কুরআন মাজীদ বেশি বেশি পড়া। কুরআন মাজীদ পড়া আল্লাহ তাআলার শুক্‌র। কিন্তু আফসোস, আমরা কুরআন মাজীদ পড়তে পারি না। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই পারে না। এটা এমনই একটা আফসোসের কথা যে, এত আফসোস জগতে আর কোনও কিছুর কারণেই হওয়ার কথা নয়। কারণ আমি-আপনি সকলেই বড় গাফেল। কুরআন পড়ার প্রতি মানুষের আগ্রহ নেই। কুরআনের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই। কী আজব অবস্থা আমাদের! কুরআন শুনে জিন জাতি মুগ্ধ হয়ে গেল। ইসলামের দাওয়াত কুরআন দিয়েই হয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকেই দাওয়াত দিতেন তাকে কুরআন শোনাতেন। আর কুরআন শুনেই মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। মদীনার লোকজন মক্কায় আসলো হজ্জের মওসুমে, আর তিনি তাদেরকে কুরআন শোনালেন, কুরআন শুনেই তারা মুসলমান হয়ে গেছে। উমর ফারূক রাযি. মুসলমান হয়ে গেলেন কী কারণে? কুরআন শুনেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

طٰهٰ ۝١ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٢ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٣

তোয়া-হা। আমি তোমার প্রতি কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে। বরং এটা সেই ব্যক্তির জন্য নসীহত, যে ভয় করে।[১১২]

এ ঘটনা তো আমরা জানি। তিনি গিয়েছিলেন কেন? গিয়েছিলেন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জগৎ থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। গিয়েছিলেন তো এজন্য যে, রাসূলের জান নিয়ে নেবেন। কিন্তু অন্যের জান নেবেন কি; কুরআন শুনে নিজের জানটাই দিয়ে আসলেন। জান নিতে গিয়েছিলেন আর কুরআন শুনে তার জানটাই দিয়ে আসলেন। এভাবেই তো ইসলামের দাওয়াত হয়েছে, কুরআনের দ্বারা।

## হযরত সা'দ ইবন মুআয রাযি.-এর ঘটনা

১১২. সূরা তোয়া-হা : ১-৩

আওস গোত্রের নেতা সা'দ ইবন মুআয রাযি. কুরআন শুনেই মুসলমান হয়ে গেলেন। সা'দ গিয়েছিলেন মুস'আব ইবন উমায়র রাযি.-এর কাছে আসাদ ইবন যুরারা রাযি.-এর বাড়িতে। যখন মদীনার লোকজন ঈমান আনল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দীন শেখানোর জন্য শিক্ষক হিসেবে পাঠালেন মুস'আব ইবন উমায়র রাযি.-কে। মুস'আব ইবন উমায়র রাযি. আসআদ ইবন যুরারা রাযি.-এর বাড়িতে লজিং থাকতেন। তিনি ওই বাড়িতে থেকে থেকে মানুষকে দীন শেখাতেন আর ইসলাম প্রচার করতেন। আসআদ ইবন যুরারা রাযি. ছিলেন আওস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ ইবন মুআয রাযি.-এর খালাতো ভাই। তিনি তখনো ঈমান আনেননি। লোকজন তাকে গিয়ে ধরল– আপনার খালাতো ভাই দেশটা শেষ করে দিল! তার রক্ত গরম হয়ে গেল। তিনি সোজা সেখানে চলে গেলেন। গিয়ে মুস'আব রাযি.-কে বললেন, আপনি আর কত দিন এ যন্ত্রণা আমাদেরকে করবেন? অনেক হয়েছে, এবার বন্ধ করুন। আমরা আর সহ্য করব না। আসআদ ইবন যুরারা রাযি. বললেন, ভাই! উনি কী বলেন একটু শোনেন। উনি কী বলেন শোনে দেখেন। তিনি শুনতে রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কী বলবেন বলুন। মুস'আব রাযি. পড়তে শুরু করলেন–

حٰمٓ ۝ وَ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ اِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ

হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি একে বানিয়েছি আরবী কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। প্রকৃতপক্ষে এটা আমার নিকট মূল গ্রন্থে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, হিকমতপূর্ণ কিতাব। আমি কি বিমুখ

হয়ে তোমাদের থেকে এ কিতাব প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?[১১৩]

তিনি সূরা যুখরুফ পড়তে লাগলেন। এ আওয়াজ সা'দ ইবন মুআযের অন্তরে যেই না ঢুকল, অমনি তার অন্তরে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বললেন, থামুন, এটা মানুষের কথা নয়; নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কালাম। এই বলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঈমান আনলেন। এরপর এলাকায় গিয়ে লোকজনকে ডাকলেন, বললেন, এরচেয়ে ভালো কিছু তোমাদের কাছে থাকলে আমাকে শোনাও। তারা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। বললেন, এমন ভালো কথার প্রতি ঈমান না এনে পারা যায়? উনি ঈমান আনলেন আর তাঁর দাওয়াতে গোত্রের সবাই ঈমান আনলেন।[১১৪] গোত্রের নেতা তো! এত বড় মানুষ! তাঁর যখন মৃত্যু হল তখনকার অবস্থা হাদীছে আছে–

اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

সা'দ ইবন মুআয যখন মারা গেল, তখন আরশ কেঁপে উঠেছে।[১১৫]

আল্লাহর আরশ কেন কেঁপেছে? এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। তার মধ্যে এক ব্যাখ্যা হল– খুশিতে যে, সা'দ তো এখন আমাদের কাছে চলে আসল। এ খুশিতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে। ইসলামের দাওয়াত তো হয়েছিল কুরআন দিয়ে। আর আফসোস হল এই, এখন যারা দাওয়াত দেয় তারাই কুরআন পড়তে পারে না।

আর আমার সবচে' বেশি আফসোস হল তাদের প্রতি, যারা তাবলীগের মেহনত করে। তাদের অধিকাংশের অবস্থা হল এই– তারা কুরআন পড়তে পারে না এবং কুরআন পড়ার প্রতি এদের আগ্রহ বড় কম।

---

১১৩. সূরা যুখরুফ : ১-৫

১১৪. বায়হাকী, দালাইলুন নুবুওয়াহ : ২/৩০৬

১১৫. সহীহ বুখারী : ৩৮০৩

কালকে তালীমের সময় সূরা ওয়াকি'আর ফযীলত বর্ণিত হয়েছিল। তখন যদি আমি যারা বসেছিল তাদের জিজ্ঞাসা করতাম– তোমরা সূরা ওয়াকি'আ পড়তে জান? জিজ্ঞেস করিনি। করলে অধিকাংশেরই উত্তর আসত– না, আমরা পারি না।

## দাওয়াত ও তাবলীগের বর্তমান অবস্থা

আমি আরো দেখেছি, যারা অনেক চিল্লা দিয়েছে এবং মুরুব্বী হয়ে গেছে, তারা পর্যন্ত কুরআনুল কারীম সহীহ করে পড়তে পারে না। এমনকি সহীহ করে ইকামতও দিতে পারে না। কেন এটা হবে? দাওয়াত ও তাবলীগ তো হয়েছিল মানুষকে কুরআনমুখী করার জন্য! সকলকে আলেম-উলামামুখী করার জন্য।

এবার আলকাউসার পত্রিকায় আমার একটা লেখা আছে। সেটা পড়ো। দাওয়াত ও তাবলীগ শুরুর কী উদ্দেশ্য ছিল সেটা ওখানে বলা আছে। তাবলীগের লোকজন সে উদ্দেশ্যের মধ্যে এখন নেই। একটা বিভক্তি হয়ে গেছে। সা'দ সাহেব এবং তার অনুসারী যারা আমাদের দেশে আছে, যেমন– ওয়াসীফ সাহেব, এদের কারণে তাবলীগের মধ্যে একটা মহাবিভক্তি শুরু হয়ে গেছে। এবং আফসোস হল এই যে, এরা মওদুদীবাদের শিকার হয়ে গেছে। সা'দ সাহেবের মতবাদ, এটা নব্য মওদুদীবাদ। মওদুদী সাহেব চেষ্টা করেছিলেন মানুষকে উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলতে। মওদুদী সাহেবের বইপত্র পড়লে দেখা যায় উলামাবিদ্বেষ তার মধ্যে ছড়ানো। আরো আছে নবী-রাসূলগণের সমালোচনা, সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা। সাদ সাহেবও তেমনি।

উলামায়ে কেরামকে মুহাব্বত করা ইশকে নবীর অংশ, হুব্বে নবীর অংশ। কেউ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসলে তার অবশ্যই উলামায়ে কেরামকে মুহাব্বত করতে হবে।

কারণ হাদীছে বলা হয়েছে– উলামায়ে কেরাম হল নবীর ওয়ারিছ।[১১৬] যার ওয়ারিছ তাকে মুহাব্বত করবে আর যারা ওয়ারিছ তাদেরকে মুহাব্বত করবে না, এটা হতে পারে? একজনকে মুহাব্বত করব আর তার ছেলেকে মুহাব্বত করব না, এটা কেমন হবে? যদি এটা ওই লোক শোনে যে, আমার ছেলেকে ভালোবাসে না; বিদ্বেষ রাখে, তাহলে সে এটা পছন্দ করবে না। যার ওয়ারিছ তাকে যদি মুহাব্বত করি, তাহলে সে ভালোবাসার দাবি ওয়ারিছকেও ভালোবাসা। আলেম-উলামা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিছ। তাদেরকে ওয়ারিছ কে বানিয়েছে? এটা কোনও ব্যক্তিবিশেষের ঘোষণা না; স্বয়ং নবীর ঘোষণা। কাজেই তাঁকে যে ভালোবাসে, উলামায়ে কেরামকে তার ভালোবাসতেই হবে। যদি উলামাকে ভালো না বাসে, তাহলে স্পষ্ট কথা সে নবীকে ভালোবাসে না, সে মুখে যত দাবিই করুক না কেন। আর কেউ নবীকে ভালো না বাসলে তার মুক্তি নেই। সুতরাং তোমরা সাবধান! তোমরা ওদের ফাঁদে পা দিয়ো না। তাহলে তোমাদের সব শেষ হয়ে যাবে।

## উলামা-বিদ্বেষের ভয়াবহ ক্ষতি

উলামায়ে কেরামের প্রতি যদি কেউ বিদ্বেষ করে, তাহলে সবচে' বড় ক্ষতি যেটা হবে, আল্লাহর সবচে' বড় আযাব যেটা নেমে আসবে সেটা হল এই– উলামায়ে কেরাম যে জিনিসের চর্চা করে, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। উলামায়ে কেরাম চর্চা করেন কুরআন ও হাদীছের। কুরআন হাদীছই তো ঈমান ও ইসলাম। উলামায়ে ইসলামকে আল্লাহ তাআলা এর চর্চাকারী বানিয়েছেন, এর সংরক্ষক বানিয়েছেন। যদি কেউ উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ করে, সে এ জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং মৃত্যুর সময় তার ঈমান নসীব হবে কি না খুব ভয় আছে। সুতরাং সাবধান! তোমরা কেউ ওই ফাঁদে পা দিয়ো না। যাহোক, কথা ছিল এই– যে ইসলাম আল্লাহ তাআলা আমাদের মুফতে দিলেন, সে ইসলাম নামক নিআমতের শুক্‌র আদায় করার তিন পদ্ধতি। এক হল

---

১১৬. জামে তিরমিযী : ২৬৮২

মনে মনে এ নিআমতের উপলব্ধি করা, আরেকটা হল মুখে স্বীকার করা আর তৃতীয় হল ইসলামের উপর চলা। যদি আমরা ইসলামের উপর চলতে শুরু করে দিই, তাহলে উত্তরোত্তর উন্নতি হতে থাকবে। যে আয়াত পড়েছিলাম–

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

এবং সেই সময়টাও স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা সত্যিকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তোমাদেরকে আরো বেশি দেব, আর যদি অকৃতজ্ঞতা কর, তবে জেনে রেখো আমার শাস্তি অতি কঠিন।[১১৭]

শুক্‌র আদায় কর যদি, আমি আরো বেশি বেশি দেব। একটা আমল করলে আল্লাহ তাআলা আরেকটা আমলের তাওফিক দেবেন। যত আমল করতে থাকবে তত বেশি আমলের তাওফিক হবে। আমরা কিন্তু এক জায়গায় বসে আছি, উন্নতি নেই। এটা কিন্তু ভালো না। এ লক্ষণটা খারাপ। এক জায়গায় বসে আছি মানে গতকাল আমলের যে জায়গায় ছিলাম আজকেও সে জায়গাতেই আছি। পরশু দিন যে আমল ছিল, গতকালও সে আমলটাই ছিল, আজকে আবার সেই। আমল বাড়ছে না। এ না বাড়ার লক্ষণ ভালো না। তার মানে হল, আমরা যে আমল করছি ওই আমলটা অভ্যাস হয়ে গেছে। পরিকল্পিত চর্চার জিনিস নেই; বরং হয়ে গেছে অভ্যাসের আমল। অভ্যাসের আমলও আমল বটে, কিন্তু তা সত্যিকারের প্রাণশক্তিবিশিষ্ট আমল না। সত্যিকারের আমল হয় এই উপলব্ধির সঙ্গে আমল করলে যে, আমি যে নামায পড়ছি এ নামায আমার প্রতি আল্লাহর হুকুম। নামায যদি না পড়ি তাহলে মুসলমান বলে নিজেকে দাবি করার সুযোগ থাকে না এবং এটা সবচে' বড় আমল। এ আমলটা এমন আমল যে, মুসলমান এবং অমুসলমানের

১১৭. সূরা ইবরাহীম : ৭

মাঝে পার্থক্য এ আমল দ্বারা হয়। এরপর নামায শুরু করার পর প্রত্যেকটা আমলই লক্ষ করা যে, আমি কিয়াম করছি, কিরাত পড়ছি, এসব আল্লাহর হুকুম। আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করছি। অভ্যাসের সিজদা নয়। অভ্যাসবশত নয়; চিন্তা করে করে সিজদা। রুকুর প্রতি ধ্যান থাকবে। সিজদার প্রতি ধ্যান থাকবে। ধ্যান করে করে রুকু করা, সিজদা করা। এভাবে চর্চা করা, সাধনা করা। যদি ওইভাবে আমরা আমল করি, তাহলে দেখা যাবে আরো বেশি আমলের উৎসাহ সৃষ্টি হচ্ছে। এর নামই তাওফিক। এক আমল করার পরে যদি আরেক আমলের প্রতি উৎসাহ জাগে, ওইটার নাম হল তাওফিক। আল্লাহ তাআলা যে বলছেন– তোমরা শুক্‌র করো, আমি আরো বেশি দেব, যদি আমরা সাধনার সঙ্গে আমল করতে শুরু করে দিই, তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরো বেশি বেশি আমল করার তাওফিক দেবেন। পরে দেখা যাবে, প্রত্যেকদিন উন্নতি হচ্ছে, এক জায়গায় বসে নেই। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে ইসলাম নামক মহা নিআমতের তিন পদ্ধতিতে শুক্‌র আদায়ের তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# মানুষের মর্যাদা তাকওয়ার মধ্যে

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

উপস্থিত ভাই ও বন্ধুগণ এবং মা, বোন ও কন্যাস্থানীয় নারীগণ!

আমি কুরআন মাজীদের এক আয়াত তিলাওয়াত করেছি। আয়াতটি সূরা হুজুরাতের। এ সূরায় সামাজিক নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। এখন কুরআন মাজীদের তরজমা-তাফসীর বের হয়ে গেছে। সহজ তাফসীরও বের হয়েছে। আমরা তা সংগ্রহ করে পড়তে পারি। কুরআন কারীম পড়ব, সঙ্গে তরজমাও পড়ব। বিশেষ করে যে সমস্ত সূরা আমরা বেশি বেশি পড়ি যেমন– সূরা ইয়াসিন, সূরা ওয়াকিআ, সূরা মুলক ইত্যাদি। ইনশাআল্লাহ এগুলো তরজমা-তাফসীরসহ পড়লে অনেক উপকার হবে। 'তাওযীহুল কুরআন' অনেকেই চেনে। হযরত শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের লেখা।

কুরআন মাজীদের সহজ তাফসীর। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী, ভাই মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেবের উদ্যোগে এর অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ হয়েছে। এখন বাংলাদেশে এ গ্রন্থ প্রচুর চলছে। নাম হলো 'তাওযীহুল কুরআন'– কুরআনে কারীমের সহজ তরজমা ও তাফসীর। এটা আমরা সংগ্রহ করি এবং এখান থেকে এই জরুরী জিনিসগুলো দেখে নিই। ইনশাআল্লাহ অনেক কাজে আসবে। তো সূরা হুজুরাতের এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে।[১১৮]

## সমস্ত মানুষ একই পিতামাতার সন্তান

প্রত্যেকেরই এক বাবা ও এক মা আছে। গোড়াতেও এক আদি মা এবং এক আদি পিতা আছেন। তাঁদের থেকেই মানবজাতির বিস্তার । সব কালেই আল্লাহ তাআলা এক বাবা এবং এক মায়ের মাধ্যমে দুনিয়ায় মানবসন্তান পাঠান। ব্যতিক্রম শুধু ঈসা আলাইহিস সালাম, যাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে কেবল মায়ের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। দেখানোর জন্যে যে, আল্লাহ তাআলা বাবা ছাড়াও পারেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি সৃষ্টি করেছি জগতের সমস্ত মানুষকে নারী এবং পুরুষের মাধ্যেমে । আর এই মানুষদেরকে বিভিন্ন গোত্র-বংশে বিভক্ত করেছি। দুনিয়াতে কত যে গোত্র, কত যে বংশ আছে! প্রত্যেকেই অন্যের পরিচয় জানতে চেয়ে তার নাম, গ্রাম, কোন বংশের লোক তা জিজ্ঞেস করে। বিয়ের সময় খোঁজে ছেলে কোন বংশের, মেয়ে কোন বংশের। সবারই একটা বংশ-পরিচয় আছে। চৌধুরী, তালুকদার, হাওলাদার, মল্লিক, মোল্লা নানা রকম বংশ আছে। তো আল্লাহ বলেন– আমি তোমাদেরকে নর ও নারীর দ্বারা সৃষ্টি করেছি

১১৮. সূরা হুজুরাত : ১৩

এবং বিভিন্ন গোত্র-বংশে বিভক্ত করেছি। এ বিভক্তির উদ্দেশ্য কেবলই একের কাছে অন্যের পরিচয়-পরিচিতি সহজ করা। নামের সাথে বংশ-গোত্র উল্লেখ করলে অন্যের পক্ষে চেনা সহজ হয়।

আল্লাহ তাআলার এই বিভক্তি, ভাগ, বণ্টন নানান রকম। আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ফর্সা সাদা করে। কিছু মানুষের আবার গায়ের রং লালচে। কিছু মানুষের গায়ের রং কালো। কিছু মানুষের গায়ের রং তামাটে। মানুষের গায়ের নানান রং আছে। একেক জনকে আল্লাহ তাআলা একেক রং দিয়েছেন। আবার কাউকে স্বাস্থ্যবান বানিয়েছেন, কাউকে দুর্বল। এটা একটা ভাগ। কাউকে শিক্ষিত বানিয়েছেন, কাউকে অশিক্ষিত। এ আরেকটা ভাগ। কাউকে গরীব বানিয়েছেন, কাউকে ধনী বানিয়েছেন। এটাও এক রকমের ভাগ। কাউকে বাংলাভাষী বানিয়েছেন, কাউকে অন্য ভাষার। এরকম আরো নানা শ্রেণীর মানুষ আছে।

## কে শ্রেষ্ঠ মানুষ

এই যে নানান রকমের মানুষ, নানান গোত্রের মানুষ, নানান ভাষার মানুষ, এর মধ্যে সেরা কে? এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? একেকজন এর একেকটাকে মাপকাঠি বানিয়ে নিয়েছে। যে ফর্সা সে মনে করে আমি সেরা। আমার গায়ের রং ফর্সা, দেখতে আমাকে সুন্দর লাগে, কাজেই আমি সবার চেয়ে সেরা। সে আর কাউকে পাত্তা দিতে চায় না। যে সুন্দরী সে মনে করে, আমি লাখের মধ্যে এক সুন্দরী। ওরা আর আমার কাছে কী? সে নিজেকে সেরা বানিয়ে নেয়। যার টাকা আছে সে মনে করে ওরা সব ফকির। ওদের কী দাম আছে? দাম আছে তো আমার। আমার টাকা-পয়সা আছে। যারা খুব বড়সড় চাকুরে, তারা মনে করে আমি খুব পদস্থ লোক। শুধু আমারই দাম। ওদের কী দাম? এদের স্ত্রীরা মনে করে আমার স্বামী বড় চাকুরী করে। ওই সমস্ত লোক পিওন। ওদের কী দাম? যদি কেউ বড় কোনও বংশের হয় তাহলে বলে– ওসব ছোট বংশের লোক বা ছোটলোক, আমি দামী। যদি কেউ দামী পোশাক পরে তখন সে মনে করে আমার পোশাক দামী, আমি কিছু

একটা হয়ে গেছি। অন্যের ছেঁড়া-ফাঁড়া পোশাক, সস্তা জুতা, এদের কী দাম আছে? আমাদের প্রত্যেকেরই এরকম একটা ভাবনা থাকে। দামী জামা-জুতা পরলে নিজে দামী হয়ে গেছি মনে করি। যার এ রকমের দামী জামা-জুতা নেই তাকে পাত্তা দিই না। এটা একটা নৈতিক রোগ। এই রোগ আমাদের অধিকাংশের মধ্যেই আছে।

পাত্তা না দেওয়ার কারণে অনেক সামাজিক বিশৃঙ্খলা হয়, সামাজিক অশান্তি হয়। যখনই আমি দামী জুতা ও দামী পোশাক না থাকার কারণে আরেকজনকে অবহেলা করি, সে আহত হয়। সে মনে কষ্ট পায়। সে যদি আমার আত্মীয় হয়ে থাকে, তাহলে তার মনে আমার প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। সে যদি আমার প্রতিবেশী হয়, তখন তার মন খারাপ হয়। আমাকে অহংকারী গণ্য করে ও পর মনে করে। এতে পরস্পরে আত্মকলহ দেখা দেয়। শান্তি, মিল-মিশ নষ্ট হয়ে যায়। এটা একটা রোগ।

বিভিন্ন কারণে আমরা প্রত্যেকে নিজেকে অন্যের চেয়ে সেরা গণ্য করি। এটা আমাদের একটা রোগ। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই রোগটা জানেন। তিনি সতর্ক করছেন– হে মানুষ ! তোমাদের মধ্যে এই রোগ আছে। এটা দূর করো। দামী টাকা-পয়সা দিয়ে হওয়া যায় না, দামী রূপ দিয়ে হওয়া যায় না, পোশাক দিয়ে দামী হওয়া যায় না, দামী শিক্ষা-দীক্ষা দিয়েও হওয়া যায় না এবং বড় চাকরির দ্বারাও দামী হওয়া যায় না; যদি দামী হতে চাও তাহলে তাকওয়ার গুণ অর্জন করো–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

আল্লাহর কাছে দামী সেই, যার তাকওয়া-পরহেযগারী আছে।[১১৯]

মুত্তাকী ও পরহেযগার ব্যক্তিই দামী। দামী হতে চাইলে তাকওয়ার গুণ অর্জন করো। আজকে আমাদের জন্য এটা এক গুরুত্বপূর্ণ সবক। আমরা যদি নিজেকে দামী বানাতে চাই, তাহলে ওই সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমি রূপসী, আমি সুন্দরী বলে দামী হয়ে যাব? আদৌ তা নয়। এই রূপের কোন মূল্যও আল্লাহর কাছে নেই।

---

১১৯. সূরা হুজুরাত : ১৩

তাকওয়া যদি আমার মাঝে না থাকে, তাহলে বড় চাকুরীজীবী হওয়া সত্ত্বেও আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। বড় চাকুরী আমাকে বাঁচাতে পারবে না। যদি তাকওয়া আমার মধ্যে না থাকে, তাহলে আমি যত শিক্ষিতই হই, তবুও শিক্ষা আমাকে বাঁচাতে পারবে না, আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কোনও কিছুই আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না, যদি আমার মধ্যে তাকওয়া না থাকে। বিদায় হজ্জের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন–

أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى

হে মানুষ! তোমাদের রব্ব একজন এবং তোমাদের আদি পিতাও একজন। জেনে রেখো, কোনও অনারবীর উপর আরবী ব্যক্তির কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরবী ব্যক্তির উপর অনারবী ব্যক্তিরও। কোনও কালো ব্যক্তির উপর লাল চামড়ার ব্যক্তির কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং শ্রেষ্ঠত্ব নেই লাল চামড়ার লোকের উপর কালো চামড়ার লোকেরও। একের উপর অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় কেবল তাকওয়ার দ্বারা।[১২০]

## তাকওয়া কাকে বলে

তাকওয়া কী জিনিস? তাকওয়া মানে হলো বাছ-বিচার করে চলা। তার মানে যেটা ক্ষতিকর সেইটা থেকে দূরে থাকা। মানুষ স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়। এর জন্য কী করে? যেসব জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা খায় না। যেই জিনিস খেলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তা কেউ খায় না। এই যে ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাকা, এটার নাম তাকওয়া। একজন লোক অসুস্থ,

১২০. মুসনাদে আহমাদ : ২৩৮৮৫

ডাক্তার তাকে বলে দিল– আপনি এইগুলো খাবেন না। কারো খুব বেশি গ্যাস হয়, ডাক্তার বলে দিয়েছে শাক খাওয়া যাবে না। এসব জিনিস না খাওয়া হলো স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তাকওয়া। শরীরকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্যে ক্ষতিকর জিনিস থেকে দূরে থাকা শারীরিক তাকওয়া। এই তাকওয়া যেমন শরীরের জন্যে আছে, তেমনি রূহের জন্যেও আছে, আত্মার জন্যে আছে, দীন ও ঈমানের জন্যেও আছে।

যেই জিনিস দ্বারা রূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নিজের দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ওই জিনিস থেকে দূরে থাকার নাম তাকওয়া। মিথ্যা কথা বললে নিজের দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। অন্যের গীবত করলে নিজের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই গীবত করা থেকে বেঁচে থাকা তাকওয়া। অন্যকে ঠকালে নিজের দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই ঠকানো থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। অহংকার করলে নিজের দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই অহংকার থেকে বেঁচে থাকা তাকওয়া। এ রকমের আরো যা-কিছু আছে, যেমন অন্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অন্যকে ছোট মনে করা, অন্যকে ভেংচি কাটা– লোকটা কীভাবে হাঁটে, কীভাবে কথা বলে, ওকে কেমন দেখা যায়, ওর নাকটা বোঁচা, ওর ঠোঁটটা চ্যাপটা, কেমন দেখা যায়, সে মানুষের সঙ্গে আচার-ব্যবহার জানে না ইত্যাদি, এসব বলে অন্যকে ব্যঙ্গ করা সাংঘাতিক গুনাহের কাজ এবং এর দ্বারা মানুষের ঈমান ও দীন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজেই এসব থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া।

এ সমস্ত জিনিস থেকে যে বেঁচে থাকে, তাকে বলে মুত্তাকী। দীন ও ঈমান যা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, তাকে বলা হয় মুত্তাকী। এই রকম লোকই আল্লাহ তাআলার কাছে দামী। সে দেখতে যেমনই হোক, এই গুণগুলো যদি তার মধ্যে থাকে, তবে সে মুত্তাকী। সে আল্লাহর কাছে দামী। যদিও সে একদম অশিক্ষিত, নিজের নাম দস্তখতও জানে না, কিন্তু কারো গীবত করে না, মিথ্যা কথা বলে না, কাউকে ঠকায় না, কারো উপরে জুলুম করে না, স্বামীকে অমান্য

করে না, মায়ের সঙ্গে বেয়াদবী করে না, ছেলেকে দীন থেকে দূরে রাখে না, সন্তানের হক আদায় করে, তবে সে মুত্তাকী।

আল্লাহর কাছে এমন তাকওয়াওয়ালা ব্যক্তিও দামী, যাকে আমরা একেবারে নিম্নবংশীয় মনে করি। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাইয়্যেদ ও কুরাইশ ছাড়া জগতের সব বংশই এক, তাতে যে যতই বাহাদুরী করুক না কেন। শ্রেষ্ঠ বংশ হলো কুরাইশ বংশ, যে বংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন। এ ছাড়া জগতের সব বংশ এক। এ সমস্ত বংশের মধ্যে এক বংশের উপর আরেক বংশের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যারা শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে তারা মহাভুলের মাঝে আছে। মনে করুন একজন লোক চামার। তার কাজ হলো চামড়া নিয়ে। সে জুতা বানায় বা সেলাই করে। কিংবা সে কামার। তার কাজ হলো লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে দা-বঁটি বানানো। আমরা মনে করি সে একেবারে নিচু শ্রেণীর লোক। তার কী মূল্য আছে? শুনুন একটা ঘটনা।

## জনৈক কামারের ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. খুব বড় বুযুর্গ ছিলেন। অনেক বড় মুহাদ্দিছ। অনেক বড় ফকীহ। অনেক বড় মুজাহিদ। অনেক বেশি ইবাদত-বন্দেগী, হজ্জ ও জিহাদ করেছেন। সব রকমের ভালো গুণ তাঁর মধ্যে ছিল। সবাই তাঁকে সম্মান করে ও ভালোবাসে। এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ.-এর মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখল। স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল– আল্লাহ আপনার সঙ্গে কী ব্যবহার করেছেন? আপনাকে আল্লাহ তাআলা কী মর্যাদা দিয়েছেন? তিনি সেই ব্যক্তিকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। জান্নাতবাসী করেছেন। তবে আল্লাহ তাআলা আরো বেশি মর্যাদা দিয়েছেন অমুক কামারকে। সে আমার প্রতিবেশী। তাকে আল্লাহ তাআলা আমার চেয়েও বেশি মর্যাদা দান করেছেন।

ওই লোকের তো মাথা খারাপ অবস্থা। কেননা আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. এর মতো লোক, সবাই যাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, একবাক্যে সবাই স্বীকার করে তার মতো বুযুর্গ আর হয় না, অথচ তাঁর চেয়েও আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদা পেয়ে গেল ওই কামার! তার তো বিশ্বাসই হতে চায় না। শেষে অনুসন্ধানে বের হল।

খুঁজতে খুঁজতে ওই লোকের বাড়ীতে গেল। গিয়ে ওই কামারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল। জিজ্ঞেস করল, আপনার স্বামীর এমন কী আমল ছিল, যে কারণে সে আল্লাহ তাআলার কাছে আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের চেয়েও বেশি মর্যাদা পেয়ে গেল? সে বলল, আমার স্বামী তো গরীব মানুষ ছিলেন। কাজকর্ম করতেন। কামারগিরি করতেন। সময় পেতেন না। আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক ধনী লোক ছিলেন। তিনি রাতভর তাহাজ্জুদ পড়তেন। আমার স্বামী সেটা পারতেন না। কাজকর্ম করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। রাত হলে ঘুমাতেন।

তার বড় আফসোস ছিল– আহা! আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রাতভর ইবাদত করে, আর আমি পারি না! বড় আফসোস করতেন যে, বেশি ইবাদত-বন্দেগী করতে পারেন না। তবে একটা কাজ তিনি এই করতেন– যখন আযান হতো তখন তিনি জামাতে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। আল্লাহ তাআলার হুকুম আছে, যখন নামাযের জন্য ডাকা হয় তখন সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে নামাযের দিকে ধাবিত হও। তো আমার স্বামী এই করতেন যে, আযান দিলে আর কোনও কাজ করতেন না। তখন মসজিদে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। এমনকি তিনি লোহায় বাড়ি দেওয়ার জন্যে যখন হাতুড়ি উঁচু করতেন ঠিক তখন যদি মুয়াজ্জিন বলে উঠত– 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', তখন তিনি সেই হাতুড়ি আর নিচে নামাতেন না। উপরে যে উঠিয়েছেন ওখান থেকেই পেছনে ছেড়ে দিতেন। ওই হাতুড়ি আর সামনে আনতেন না। এখন আর হাতুড়ি চালানো আমার কাজ না; এখন আমার কাজ নামাজে যাওয়া । ওই লোক বলল, হ্যাঁ বুঝে এসেছে, কীভাবে আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের চেয়ে তার মর্যাদা বেশি হলো। এর নাম হলো তাকওয়া।

## এক কথায় তাকওয়া হল আল্লাহর হুকুম পালনের নাম

আল্লাহর যখন যেই হুকুম এসে যায় সেই হুকুম পালনে যত্নবান হয়ে যাওয়া। এর বিপরীতে অন্য কিছুকে প্রাধান্য না দেওয়া। এর বিপরীতে অন্য কিছুকে প্রাধান্য দিলে তখন দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর যখন যেই হুকুম তখন তা পালন করাই দীন ও ঈমানের হেফাজত আর তা করাই তাকওয়া। এর বিপরীত কিছু করলেই দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেকেরই প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু না কিছু দায়িত্ব এসে যায়। কখনো আল্লাহপ্রদত্ত হুকুম মসজিদে যাওয়া। কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম মায়ের খেদমত করা। কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম এই যে, তুমি এখন কামাই-রোজগার করো। কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম– ছেলেমেয়েকে দীন শিক্ষা দাও। কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম হল প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে গেছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম– অমুকে অন্যায় কাজ করছে তাকে বাঁধা দাও। এভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যখন যে হুকুম আসে সে হুকুম পালনে যত্নবান হয়ে যাওয়ার নাম তাকওয়া। এর বিপরীত করলেই দীন ও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কাজেই এর বিপরীত কাজ থেকে বেঁচে থাকাই হল তাকওয়া।

আজকের সবক এই যে, আমরা নারী হই, পুরুষ হই, শিক্ষিত হই, অশিক্ষিত হই, ধনী হই, গরীব হই, অভিজাত বংশের হই আর সাধারণ বংশের হই, উচ্চপদস্থ হই আর নিম্ন পদের হই, যে যাই হই না কেন সর্বাবস্থায়ই তাকওয়ার গুণ অর্জনে সচেষ্ট থাকব। কখনও বংশ-গৌরব করব না, টাকার অহংকার করব না, শিক্ষার দেমাগ দেখাব না, রূপের দেমাগ দেখাব না; বরং মুত্তাকী হয়ে থাকব। যদি মুত্তাকী হতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ, দুনিয়ায় যে যাই মনে করুক না কেন, আল্লাহ তাআলার কাছে আমি অনেক দামী হয়ে যাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# আল্লাহর স্মরণেই সুখ ও সফলতা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فاذكروني اذكركم و اشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم.

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ এবং আমার মা-বোনেরা !

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অনেক বড় মেহেরবানী, তিনি আমাদেরকে পবিত্র রমাযানে রোযা অবস্থায় ফরয নামায আদায় শেষে দীনি আলোচনার মজলিসে হাজির থাকার তাওফিক দান করেছেন। দীনি আলোচনার মজলিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মজলিস। যে মজলিসে দীন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, আল্লাহ জাল্লা শানুহু সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং আল্লাহকে পাওয়ার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হয় এরকমের মজলিসকে ফিরিশতারা চারদিক থেকে বেষ্টন করে রাখে। দীনের আলোচনা মসজিদের বাইর থেকেও শোনা যায়। মাইক লাগিয়ে দোকানে বসেও শোনা যায়। দোকানে বসে হয়তো শুনল, কিন্তু সে মাহফিলের মজলিসে নেই, যিকিরের মজলিসে নেই, তাহলে যে বরকত মজলিসে থাকলে পাওয়া যেত তা সে পাচ্ছে না। ফিরিশতারা যিকিরের

মজলিস বেষ্টন করে রাখে। আল্লাহ তাআলা সেখানে তাঁর খাস রহমত নাযিল করেন। আর আল্লাহর কাছে যারা আছেন অর্থাৎ ফিরিশতারা, সেখানে আল্লাহ এদের কথা উল্লেখ করেন– দেখো, আমার বান্দারা বসে বসে আমার সম্পর্কে আলোচনা করছে। এমনকি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণাও শুনিয়ে দেন। তো এই বরকত থেকে তারা বঞ্চিত হলো। এ বরকত লাভের জন্যে উচিত দীনের কথা মজলিসে এসে শোনা।

## আল্লাহকে স্মরণ কীভাবে করা যায়

যাহোক, আমি কুরআন মাজীদের এক আয়াতের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করেছি। এতে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আমাদেরকে হুকুম দেন– اذكروني "তোমরা আমাকে স্মরণ করো", اذكركم। "আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব।" আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হচ্ছে– তোমরা আমাকে স্মরণ করো। আল্লাহর স্মরণ মুখেও হতে পারে, মনে মনেও হতে পারে। আর দুইটা যদি একসাথে হয়ে যায় তাহলে তো نور على نور। মনেও আল্লাহ তাআলার স্মরণ আছে আর মুখেও তাঁর নাম উচ্চারণ করছি। দুটি অঙ্গ ব্যবহৃত হলো। বস্তুত যখন মুখ ব্যবহৃত হয় তখন কেবল দুটি অঙ্গ না; আরো বহু অঙ্গ কাজে লেগে যায়। মুখের সঙ্গে দাঁত, জিহ্বা, ঠোঁট, গাল, চোয়াল, এরপর কান। যে আওয়াজটা করি সেটা কানেও পৌঁছে যায়। অনেক অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এটা আল্লাহ তাআলার কত বড়ই না নিআমত যে, এক যিকিরের মধ্য দিয়ে বহু অঙ্গ কাজে লাগছে।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর কথা। তাঁর নাম শুনেছেন? শোনা উচিত। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর শায়খ, পীর-ভাইও বটে। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর আসল শায়খ ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.। আর হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ওফাত হয়ে গেলে তখন তিনি আবার নতুন করে বাইআত হলেন হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে। হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. ছিলেন হযরত হাজী সাহেব রহ.-এর

প্রধান খলীফা। একবার তাকে কিছু লোক বলল, হযরত, যিক্‌র তো করি কিন্তু মন যে বসে না! ধ্যান আসে না। মুখে মুখে বলি কিন্তু সেদিকে মন থাকে না! হযরত বললেন, দেখো! আল্লাহর যিক্‌রে তোমার একটা অঙ্গ কাজে লাগছে, এর জন্য শুক্‌র আদায় করো। ধ্যান আসছে না কিন্তু মুখ তো ব্যবহার হচ্ছে! আল্লাহ দেখছেন, তোমার মুখ আল্লাহর যিক্‌র করছে। এটা কম কী! এর জন্য শুক্‌র আদায় করো।

আমরা অনেকেই পেরেশান যে, মন বসে না। আরে, এখন মন নিয়ে অত অস্থির হয়ো না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো ব্যবহৃত হচ্ছে। এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর কাজে লাগছে। আল্লাহর যিক্‌র করছে, সিজদা করছে, রুকু করছে, এটা তো কম কথা নয়। এ জন্য শুক্‌র আদায় করা উচিত। কত মানুষ আছে, যারা কোনওটাকেই আল্লাহর কাজে ব্যবহার করছে না। সিজদা করছে না, রুকু করছে না। আর তোমার মাথা আল্লাহর সামনে ইবাদতে মাটিতে গড়াচ্ছে। এর জন্য শুক্‌র আদায় করো।

মুখে যিক্‌র করলে মুখ তো আল্লাহর কাজে লাগল। আর এটা আল্লাহর বড় পছন্দ। আল্লাহর যিক্‌র করলে আল্লাহ বড় খুশি হন। তিনি বলছেন, اذكركم " আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো।" আল্লাহ যদি আমাদের স্মরণ রাখেন তাহলে আমাদের আর কী দরকার আছে? সারা জাহানের মালিক যদি স্মরণ রাখেন, তা কত বড় সৌভাগ্য! আমি একজন ক্ষুদ্র সৃষ্টি। আমার কাছে একটা পিঁপড়া যা, আল্লাহর কাছে তো আমি তার চেয়েও ছোট। তাই না? পিঁপড়ার চেয়ে আমি কত বড় আর পিঁপড়ার তুলনায় আমি কত ক্ষমতাবান? অথচ আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ সারা জাহানের মালিক। সারা জাহান তিনি সৃষ্টি করেছেন। সারা জাহান কত বড়? এই পৃথিবীর চেয়ে সূর্য ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সূর্য মহাশূন্যে একটা বিন্দু।

মহাশূন্যে সূর্য এবং তার চেয়ে কত বড় বড় নক্ষত্র আছে! তাহলে মহাবিশ্ব কত বড়? এ মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ তাআলা। এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা। এই মহাবিশ্বের যিনি মালিক, তাঁর সামনে আমি তো পিঁপড়ার চেয়েও ছোট, পিঁপড়ার চেয়েও ক্ষুদ্র। সেই

মালিক যদি বলেন যে, বান্দা তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাকে স্মরণ রাখব, এটা আমার জন্য কত বড় সৌভাগ্যের কথা! তাই যত বেশি সম্ভব আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত। বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করা উচিত।

## একটি মূল্যবান যিক্‌র

একটা চমৎকার যিক্‌র। বুখারী শরীফের শেষে আছে। এই যিক্‌রটা আমরা মুখস্থ করে ফেলি-

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِه ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْم

বড় চমৎকার যিক্‌র। এই যিক্‌র সম্পর্কে হাদীছে বলা হয়েছে–

كَلِمَتَان خَفِيْفَتَان فِي اللِّسَانِ

দুটি কথা মুখে বড় হালকা, উচ্চারণ সহজ।

ثَقِيْلَتَانِ فِي المِيْزَان

দাঁড়িপাল্লায় বড় ভারী।

অনেক ওজন সেখানে। হাশরের ময়দানে যখন দাঁড়িপাল্লা কায়েম করা হবে, বান্দার আমল ওজন করা হবে, সেখানে এটা অনেক ভারী হবে।

حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰن

আর দয়াময় আল্লাহর কাছে বড় প্রিয়।

দুটি কথা । সেই দুটি কথার একটা হলো–

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِه

সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী

আর দ্বিতীয় কথা–

سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْم

সুবহানাল্লাহিল আযীম

তো আমরা সব সময়, যখনই সময় ও সুযোগ হয়, কাজকর্ম থাকে না, তখন মুখে আল্লাহর যিক্‌র করতে থাকব। আল্লাহ তাআলার যিক্‌র আল্লাহর কাছে বড় প্রিয়। বড় পছন্দ। আর বিশেষ করে আমার মতো তুচ্ছ, আমার মতো ক্ষুদ্র ও হীন বান্দা যদি আল্লাহর যিক্‌র করে তাহলে আল্লাহর কাছে সে বড় দামী হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে এই বান্দার দাম, ওজন অনেক বেড়ে যায়। কাজেই যখনই সুযোগ হয় তখনই পড়ব–

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْم

## সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ

আল্লাহকে স্মরণ করা। এক তো মুখে, আরেক হলো মনে মনে। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করার মানে আমি যখন যে হালতে থাকি তখনি মনে আল্লাহর ধ্যান রাখব। যখন যে কাজ করি তখনি আল্লাহর স্মরণ রাখব। তাঁকে স্মরণ রাখব আমার সবটা অবস্থায়। আমি যদি ধনী হই তাহলে ধনী অবস্থায়, যদি গরীব হই তবে গরীব অবস্থায়, যদি সুস্থ হই তাহলে সুস্থতার অবস্থায়, যদি অসুস্থ হই তাহলে অসুস্থতার অবস্থায়, যদি আমি দেখতে সুন্দর হই তাহলে সে অবস্থায়, আর যদি দেখতে সুন্দর না হই তাহলে সে অবস্থায়। যত রকমের অবস্থা বান্দার হতে পারে, সে সমস্ত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করব ও স্মরণ রাখব এবং এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকব যে, এ অবস্থা আল্লাহর দান। আমার জন্যে এ অবস্থা আল্লাহর পছন্দ। আমার এই অবস্থাটা আমি তৈরি করিনি। অন্য কেউ করে দেয়নি। আমার এই অবস্থাটা আল্লাহ তাআলাই আমাকে দিয়েছেন। এটা অনেক বড় যিক্‌র, অনেক বড় স্মরণ । এই স্মরণ ও যিক্‌র যে করতে পারবে, তার দুনিয়ার জীবন জান্নাতের জীবনে পরিণত হবে। দুনিয়ার জীবন মহাসুখের জীবন হয়ে যাবে। সুখ-শান্তি আল্লাহর যিক্‌র ও স্মরণেই লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

শোনো হে! মনের শান্তি আল্লাহর যিক্‌রেই হাসিল হয়।[১২১]

---

১২১. সূরা রা'দ : ২৮

# সুখী না হওয়ার মূল কারণ

দুনিয়ার জীবনে আমরা যে পেরেশান ও অসুখী হই, এর একটা বড় কারণ আল্লাহকে স্মরণ না রাখা। আমাদের নজর থাকে অন্যের দিকে। নিজের অবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট না। কেবল দেখি আমার কী নেই আর অন্যের কী আছে। আমার কী আছে সেটা দেখি না। অন্যের কী আছে সে জন্য লালায়িত হই। আমাদের মনের দুঃখ-কষ্টের এটা সবচেয়ে বড় কারণ। যখন দেখি আরেকজন লোক সুন্দর, তার গায়ের রং ফর্সা, তখন মনে মনে আফসোস করি– আহা! আমি কালো, অথচ ওর গায়ের রংটা কী সুন্দর! ব্যস, মন খারাপ হয়ে গেল। দেখি– অমুকের মাথায় কত চুল, আহা! আমার মাথায় চুল নেই! ব্যস, মনটা খারাপ হয়ে গেল। দেখি– অমুকের কী সুন্দর স্বাস্থ্য, কী চমৎকার শরীর, আর আমি কেমন হ্যাংলা পাতলা! আমি এত মোটা! ব্যস, মনটা খারাপ হয়ে গেল। অমুকের কত টাকা-পয়সা, কিন্তু আমার নেই। তার মনে যা চায় কিনতে পারে, কিন্তু আমার মনে যা চায় কিনতে পারি না। আমার কাছে তো টাকা নেই! মনটা খারাপ হয়ে গেল। অমুকের কী সুন্দর বাড়ি! কত বড় বাড়ি! বিশাল বাগান বাড়ি! আর আমার ছোট একটা ঘর কিংবা ঠিকানাই নেই, ভাড়া থাকি। কষ্ট করে থাকি। বস্তিতে থাকি। ছোট্ট একটা রুমে থাকি। ব্যস, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আমাদের মনের এরকম যত দুঃখ-কষ্ট, তার প্রধান কারণ আল্লাহকে স্মরণ না রাখা। অর্থাৎ আমার কী নেই সেটা দেখি আর অন্যের কী আছে তার সাথে নিজেকে তুলনা করি, অথচ আমাকেও আল্লাহ কত দিয়েছেন আমি সেদিকে তাকাই না। সেদিকে যদি তাকাতাম তাহলে সবসময় মন আনন্দে, খুশিতে ভরা থাকত যে, আল্লাহ আমাকে কত দিয়েছেন! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا، إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা যদি আল্লাহর নি'আমতসমূহ গুণতে শুরু কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১২২]

---

১২২. সূরা নাহল : ১৮

প্রত্যেককেই আল্লাহ অসংখ্য অগণ্য নিআমত দান করেছেন, তা সে যত গরীবই হোক না কেন। কাজেই প্রত্যেকেই যদি চিন্তা করে আল্লাহ আমাকে কত দিয়েছেন, তাহলে আনন্দের সীমা থাকবে না। সে শুক্‌র আদায় করে শেষ করতে পারবে না। প্রত্যেককেই আল্লাহ এত দিয়েছেন যে, তা চিন্তা করলে আনন্দে মন ভরে যাবে। সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি.-কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল যে, আমি গরীব না ধনী? তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, প্রত্যেক দিনের যে খাবার, সেটা কি তোমার জোটে? সে বলল, হ্যাঁ, প্রত্যেক দিন যা খাবার দরকার তা আমার হয়ে যায়। জমা থাকে না বটে, কিন্তু রোজ আমি খেয়ে-পরে থাকি, না খেয়ে থাকি না। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. বললেন– আচ্ছা তাই যদি হয়, অর্থাৎ তুমি যদি রোজ খেয়ে-পরে থাক, কোনও দিন তোমার অনাহারে দিন না কাটে, তাহলে তুমি ধনী। তারপর জিজ্ঞেস করলেন– আচ্ছা তুমি কি বিবাহ করেছ? সে বলল, জী, আমি বিবাহ করেছি। আমার স্ত্রী আছে। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাযি. বলেন– তাহলে তো তুমি রাজা। তুমি রোজ খেতে পার আবার তোমার স্ত্রী আছে, তাহলে তো তুমি রাজা। তারপর সে বলল, আমার চলাফেরার জন্যে একটা গাধাও আছে। আমি ওর পিঠে চড়ে চলাফেরা করতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো মহারাজ। বড় বাদশাহ।

এক হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, নিজ ঘরে নিরাপদ থাকে এবং তার কাছে চলতি দিনের খাবার থাকে, তবে তাকে যেন সমগ্র বিশ্ব দিয়ে দেওয়া হলো।[১২৩]

১২৩. জামে তিরমিযী : ২৩৪৬

আমাদের তুলনায় সাহাবায়ে কেরাম কত গরীব ছিলেন! তাদের এতো আফসোস ছিল না। আমরা তাদের মতো অত গরীব নই। কিন্তু আমাদের কেবলই আফসোস। হাজার থাকলেও যেই জিনিসটা নেই সেটা নিয়েই আফসোস করি আর মনে মনে কষ্ট পাই।

## গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না

অনেক লোককে দেখা যায় গায়ের রং কালো হওয়ার কারণে আফসোস করে যে, আহা, আমি কালো। কি আশ্চর্য কথা! কালো হওয়ার কারণে কেন মানুষ আফসোস করবে? কালো আর সাদায় কী আসে যায়? সাদা-কালোর কী লাভ-ক্ষতি? এইটা একটা অহেতুক আফসোস। দুনিয়ার কোন মানুষটা কালো হওয়ার কারণে আটকে রয়েছে? এমন কেউ আছে যে, ওই মেয়ে কালো, তাই তার বিয়ে হয়নি? অসম্ভব! বিয়ে না হলে তার কারণ অন্য কিছু, কালো হওয়া নয়।

আল্লাহ তাআলার বণ্টন বড় চমৎকার। আল্লাহ তাআলা যাকে কালো বানিয়েছেন, লক্ষ করে দেখবেন তার চেহারা বড় সুন্দর। আর যাকে ফর্সা বানিয়েছেন তাকে ফর্সা তো বানিয়েছেন, কিন্তু কালো লোকটার মতো তার চেহারা এত সুন্দর না। তুলনা করে দেখেন! এটা নিশ্চিত। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থা এই যে, যার রংটা কালো তার চেহারাটা বেশি সুন্দর, আর যার চেহারা বেশি সুন্দর নয় তার রংটা ফর্সা। আল্লাহ তাআলা এভাবে ভাগ করেছেন। দুইজনকে দুইটা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কবিতা আছে–

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক....
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ"।

গ্রামের লোক তাকে কালো বলে কিন্তু আমি বলি কৃষ্ণকলি। ফুলের কলি। কালো গোলাপ। এ হলো কালো গোলাপ। হযরত বিলাল হাবশী রাযি. কালো ছিলেন। কিন্তু এই কালো গোলাপের যে মূল্য, কে কোথায়

তা পাবে? সারা জগতের লোককেও এক পাল্লায় রাখলে তাঁর সমান হবে না। কাজেই আমার গায়ের রংটা কালো– এই আফসোস লোকে কেন করবে? কালোতে কী আসে যায়? নিজেকে দামী বানানোর চেষ্টা করো। তুমি কেমন মানুষ সেটাই আসল জিনিস। এক লোক ফর্সা আর সেই রং নিয়ে সে অহংকার করে। ও তো জাহান্নামে যাবে। ওর কী মূল্য আছে? যদি গায়ের রং ফর্সা হওয়ার কারণে সে অহংকার করে, তবে সে অহংকার তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

মানুষের একটা ভুল ধারনা যে, মনে করে ফর্সা হলেই সে সুন্দর, এবং বলে অমুকে সুন্দর। মানে কী? গায়ের রং ফর্সা। ফর্সা হলেই সুন্দর হয় নাকি? ফর্সা না হয়েও সুন্দর হতে পারে। কারো পাঁচ বোন। লক্ষ করে দেখবে, এর ভেতর সবচেয়ে যে সুন্দরী সে কালো। যে-কেউ দেখবে, সে বলবে এই কালো মেয়েটাই বেশি সুন্দরী। অথচ গায়ের রং কালো। কি আশ্চর্য! তুমি গায়ের রং কালো হওয়ার জন্যে আফসোস কর! শুক্‌র আদায় করো যে, তুমি কালো কিন্তু তোমাকে আল্লাহ কী সুন্দর বানিয়েছেন! সেইসঙ্গে আরো কত জিনিস তোমাকে দিয়েছেন। তোমাকে চোখ দিয়েছেন, তোমাকে নাক দিয়েছেন। আফসোস করে বলে আমার নাকটা বোচা। আরে নাকটা বোচা, কিন্তু তুমি যে নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিতে পার, তার শুক্‌র আদায় করেছ কোনদিন? নাক দিয়ে তুমি ঘ্রাণ নিতে না পারলে কত পচা-বাসি খেতে। নাকের কাছে খাবার নিলেই ধরে ফেলা যায় খাবারটা তাজা না বাসি। যদি সেই অনুভূতি না থাকত, তাহলে পচা খেতে আর পেটটা খারাপ হয়ে যেত। কাজেই শুক্‌র আদায় করো, মনে আনন্দ পাবে। ওই সমস্ত বাজে চিন্তায় মন খারাপ করতে নেই।

## টাকা–পয়সা দিয়ে দামী হওয়া যায় না

কেউ বলে– আমার টাকা নেই, অমুকের টাকা আছে। অমুকের টাকা আছে তাতে কী হয়েছে? ওই টাকা নিয়ে সে তো জাহান্নামেও যেতে পারে! আর টাকা না থাকা সত্ত্বেও তুমি জান্নাতে যেতে পার। হযরত বিলাল হাবশী রাযি. গরীব ছিলেন। হযরত যায়দ ইবন হারিছা রাযি.

গরীব ছিলেন। হযরত জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাযি. গরীব ছিলেন। কতো সাহাবী গরীব ছিলেন! তাতে কী হয়েছে? এর বিপরীতে আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব কতো ধনী ছিল। আবু লাহাব ও তার স্ত্রী সম্পর্কে কুরআন মাজীদে কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে–

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصْلٰى
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّ امْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ
مَّسَدٍ ۝٥

আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে। তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনও কাজে আসেনি। অচিযে সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও, কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়। গলদেশে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়।[১২৪]

ওরা ধনী ছিল, কিন্তু জাহান্নামে যাবে। কাজেই তোমার টাকা নেই তাতে আফসোসের কী আছে? তুমি শুক্‌র আদায় করো যে, আল্লাহ তোমাকে ঈমান দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাকে মুসলমান বানিয়েছেন। মুসলমান বাবা–মায়ের ঘরে আল্লাহ তোমাকে জন্ম দিয়েছেন। এর শুক্‌র আদায় করো। মনে সুখ পাবে। কারূন ধনী ছিল, তাতে কী আসে যায়? ধনী হওয়া সত্ত্বেও সে জাহান্নামী।

কেউ বলে, অমুকের কত ক্ষমতা, আর আমার কথা কেউ শোনে না। আরে, ওই ক্ষমতার কারণে তো সে জাহান্নামেও যেতে পারে! ফেরাউন কত ক্ষমতার মালিক ছিল! কত বড় বাদশাহ ছিল ফেরাউন! এত বড় বাদশাহ ছিল যে, রাজত্বের অহমিকায় নিজেকে নিজে খোদা দাবি করেছিল যে, আমিই খোদা। এই ক্ষমতায় কী লাভ, যে ক্ষমতা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়? লাভ তো নেইই, বরং সে ক্ষমতা মানবজীবন ব্যর্থ করে দেয়।

---

১২৪. সূরা লাহাব

তোমার বাড়ি ছোট আর অমুকের বাড়ি খুব বড়। তুমি বস্তিতে থাক, তাতে কী আসে যায়? কত লোক আছে, যাদের বস্তিটুকুও নাই। রেলস্টেশনে থাকে। লঞ্চঘাটে থাকে। রাস্তার মোড়ে থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখো রাস্তার মোড়ে মোড়ে, ব্রীজের নীচে ঘুমায়। রাত কাটে সেখানে। আর মশার কামড় তো আছেই। অথচ তুমি বস্তিতে থাক। সেখানে মশারি টানিয়ে কী আরামের ঘুম দিচ্ছ! কিংবা দেখো তোমার চেয়ে ধনী এক লোক, সে আলিশান বাড়িতে থাকে। আর সে কত দামী দামী ট্যাবলেট খায়, তবুও ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। সারারাত ছটফট করে। তার ঘুম আসে না। আর বস্তির ভেতরে তুমি নিশ্চিন্ত ঘুমাচ্ছ। ফ্যানও নাই, গরম, কিন্তু কী চমৎকার নাক ডেকে ঘুমাচ্ছ! আল্লাহ তাআলা তোমাকে ঘুমের নি'আমত দান করেছেন। কী সুখ তোমার! আর ও সেই সুখ থেকে বঞ্চিত। সে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে থাকে। লাভ কী! ঘুম হয় না। সারারাত ছটফট করেই তার কাটে।

মানুষের এসব বেহুদা জিনিসের দিকে নজর দেওয়া উচিত না। ঈমান ও নেক আমল না থাকলে, টাকা, রূপ, ক্ষমতা, এসব বড় ফালতু জিনিস। আল্লাহ তাআলার কাছে এসবের কোনওই মূল্য নেই। আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্য হলো মানুষের ঈমান ও আমলের। যার ঈমান ও আমল আছে, আল্লাহ তাআলার কাছে সে দামী। টাকা না থাকলেও দামী। রূপ না থাকলেও দামী। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ لا يَنْظُرُ إِلى صُوَرِكُمْ وَ اَجْسَامِكُمْ وَ لكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَ اَعْمَالِكُم

আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরত ও অর্থ-সম্পদ দেখেন না; তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।[১২৫]

১২৫. সহীহ মুসলিম : ২৫৬৪

আরেক হাদীছে আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ যর রাযি.কে লক্ষ করে বলেছিলেন–

فَإِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ ، إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى

তুমি কোনও ফর্সা ও কালো লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নও, যদি না তাকওয়া দ্বারা তার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পার।[১২৬]

কুরআন মাজীদেও ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقٰكُمْ ، إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী।[১২৭]

## হযরত বিলাল হাবশী রাযি.–এর এত মর্যাদা কেন

বিলাল হাবশীর রূপ ছিল না। হাবশার মানুষ। কালো। কিন্তু তাতে কী? ঈমান ও তাকওয়ার কারণে তিনি দামী হয়ে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মি'রাজের সফরে বেহেশতে গেলেন, তখন বিলালের পায়ের আওয়াজ শুনলেন। হাঁটার আওয়াজ শুনলেন। জিজ্ঞেস করলেন– বিলাল, তুমি এমন কী আমল কর যে, জান্নাতে আমি তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম? বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখনই ওযু করি তখন শুকরিয়া হিসেবে দুই রাকাত নামায পড়ি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এটা সেই নামাযেরই বরকত।[১২৮]

কালোতে কিছু আসে যায় না। চেহারায় কিছু আসে যায় না। টাকা-পয়সাও কিছু না। কিছুই না এগুলো। এসব দ্বারা প্রকৃত দামী হওয়া যায় না। দামী হতে পারব তখন, যখন নিজের আমলকে ভালো করতে

---

১২৬. মুসনাদে আহমাদ : ২১৪০৭

১২৭. সূরা হুজুরাত : ১৩

১২৮. মুনযিরী, আততারগীব ওয়াততারহীব : ৩১৪

পারব। নিজের আখলাক-চরিত্রকে ভালো করতে পারব। আমরা যদি আল্লাহর যিক্‌র করি, দামী হয়ে যাব। যদি ঠিকভাবে নামায পড়ি, দামী হয়ে যাব। যদি সত্য কথা বলি, দামী হয়ে যাব। যদি মানুষকে না ঠকাই, দামী হয়ে যাব। আর তখনই প্রকৃত সুখ হাসিল হবে। কারো কাছে প্রচুর টাকা আছে। কোটি কোটি টাকা। কত টাকা তার হিসাবও নাই। কিন্তু সে পরের দুঃখে কাঁদে না। অন্যের দুঃখে তার চোখে পানি আসে না। তাহলে তার মতো হীন আর কেউ হতে পারে না। যতই টাকা থাকুক, অন্যের দুঃখে যদি সে না কাঁদে, তার কোনও দাম নেই; সে পশুরও অধম। আর খুঁজে দেখুন তার মনে প্রকৃত সুখও নেই।

## কুকুরকে পানি পান করিয়ে মুক্তি লাভ

এক লোক একটা কুকুরকে পানি পান করাল। একটা কুকুরের দুঃখে তার মন কেঁদেছিল। একটা কুকুর পিপাসায় ছটফট করছে। ওই কষ্ট দেখে তার মন কেঁদেছে। এজন্য নিজের পায়ের চামড়ার মোজা খুলে কুয়া থেকে পানি তুলে সেই কুকুরকে পান করিয়েছে। আল্লাহর কাছে দামী হয়ে গেছে, যে কারণে আল্লাহ তাকে বেহেশত দিয়ে দিয়েছেন। একটা কুকুরের কষ্টে যদি কারো মন কাঁদে আর এতে সে দামী হয়ে যায়, তাহলে মানুষের কষ্টে কারো মন কাঁদলে সে কেন দামী হবে না, তাতে তার টাকা-পয়সা নাই থাকুক, তার স্বাস্থ্য বা রূপ নাই থাকুক? যদি মানুষের দুঃখে কাঁদে, তবে সে আল্লাহর কাছে দামী । আল্লাহর কাছে নিজেকে দামী বানানোর উপায় এটাই– নিজের ঈমান-আমল বাড়াব। আর তখনই মনে সুখ আসবে।

আমল বলতে যেমন নামায পড়া বোঝায়, তেমনি আরো অনেক কিছুই আছে। নামায তো অবশ্যই পড়তে হবে। রোযা রাখতে হবে। যাকাত দিতে হবে এবং অন্য সমস্ত আমল ভালোভাবে করতে হবে। যার যে হক আছে, সমস্ত হক আদায় করতে হবে। বান্দার হক আদায় করতে হবে। বান্দার হক আদায় না করলে দামী হওয়া যায় না। আমাদের বড় অবহেলা বান্দার হকের ব্যাপারে। স্ত্রী হয়ে থাকলে স্বামীর হক এবং স্বামী হয়ে থাকলে স্ত্রীর হকও আদায় করতে হবে।

# স্ত্রীর হক আদায়ে অবহেলা

আমরা স্বামীরা স্ত্রীর হক কতটুকু আদায় করেছি? যদি হক আদায় না করে থাকি, তাহলে স্ত্রী আমাকে যতই দাম দিক, আমি প্রকৃত দামী নই। কারণ স্ত্রীর হক আদায় করা হচ্ছে না। স্ত্রীর হক বলতে তার মাহর দিতে হবে। তাতে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। নগদ না দিয়ে পরে দিলে বলতে হবে– তুমি আমার নিকট এত টাকা পাবে, তা দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। এমনিভাবে সে যে কাজকর্ম করে, এর জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এটাও তার হক। স্ত্রী রান্না-বান্না করে খাবার হাজির করে দেয়। ঘর পরিষ্কার রাখে। ঘরের হেফাজত করে। এজন্যে তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো, এটা তার হক। কয়জন স্বামী আছে, যারা স্ত্রীর এই কৃতজ্ঞতা আদায় করে যে, তুমি কত কষ্ট করে রান্না-বান্না করছ! আহা, সারাদিন কত কষ্ট করে রান্না-বান্না কর। আমাকে খাবার খাওয়াও। আমার তো উচিত ছিল এই কষ্টে তোমার সঙ্গে শরীক হওয়া। কিন্তু আমি তা করিনি। তুমি একা একাই সব করেছ। এই সহানুভূতিটুকুই কজন স্বামী জানায়? জানায় না। বরং খাবার পছন্দমতো না হলে সে জন্য স্বামী গরম হয়ে যায়। এই নিয়ে স্ত্রীকে খোঁটা দেয়। এই সমস্ত স্বামী আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবে।

এ সমস্ত কাজে তার দোষ তো ধরবেই না; বরং তার কাছে স্বামী কৃতজ্ঞ থাকবে। তার শুকরিয়া জানাবে। স্ত্রীর হক হচ্ছে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা। মারামারির তো প্রশ্নই আসে না। যেই স্বামী স্ত্রীকে পেটায়, ওই স্বামী চরম অকৃতজ্ঞ ও জালেম। স্বামীদের সাবধান হতে হবে। কিছুতেই স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা যাবে না। গায়ে হাত তোলা তো যাবেই না, দুর্ব্যবহারও করা যাবে না। কথায় কথায় তাকে খোটা দেওয়া, খোটা দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া অবশ্যই জুলুম । এটাও করা যাবে না। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের সঙ্গে বসবাস করো।[১২৯]

---

১২৯. সূরা নিসা : ১৯

ভালো ব্যবহারের সঙ্গে বসবাস করো– এটা আল্লাহর হুকুম। এটা ফরয। নামাযও পড়তে হবে। স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহারও করতে হবে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। ভাইবোনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এই সমস্ত হক আদায় করতে হবে। তা না হলে টাকা, বাড়ি, গাড়ি ও ক্ষমতা কোনও কাজে আসবে না; বরং এই সব নিয়ে সে দোযখে চলে যাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে স্ত্রীর ও অন্যান্য সকল মানুষের হক আদায় করার তাওফিক দান করুন।

## স্বামীর হক আদায় অবশ্যকর্তব্য

স্ত্রীদেরও কর্তব্য স্বামীকে মেনে চলা। আজকাল অনেক স্ত্রী স্বামীকে মানতে চায় না। বরং সে চায় স্বামী তার কথায় চলুক। তারা আজকাল ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদেরকে দেখে দেখে শিখছে যে, বউ স্বামীকে চালাবে। বউয়ের কথায় স্বামী চলবে। এইটাও তাদের একটা দোষ। আল্লাহ তাআলা স্বামীকে আমীর বানিয়েছেন। স্বামীর আনুগত্য করা, স্বামীর হুকুম মানা স্ত্রীদের উপর ফরয। স্বামীকে মানবে। তবে তার মানে এই না যে, স্বামীকে মানার কারণে সে নীচ হয়ে গেল আর স্বামী বড় হয়ে গেল। কে বড় কে ছোট, এটা আখিরাতে ধরা পরবে। সে স্বামীকে মানছে কিন্তু স্বামী তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। ফলে স্বামী আল্লাহর কাছে ছোট, আর স্বামীকে মানার কারণে সে আল্লাহর কাছে বড়। স্বামীকে মানার কারণে সে আল্লাহর কাছে দামী হয়ে যাবে, আর স্বামী যেহেতু তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে তাই সে আল্লাহর কাছে ছোট ও ক্ষুদ্র হয়ে যাবে এবং এর জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

এমন হতেই পারে যে, আখিরাতে ওই স্বামী স্ত্রীকে ধরবে– আহা! তুমি দুনিয়ায় আমার হুকুম মেনেছিলে, আল্লাহর হুকুম মেনেছিলে। এখন তুমি জান্নাতে যাচ্ছ আর আমি তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে করে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে গেছি। তুমি তো আমার স্ত্রী ছিলে। আহা! তুমি এখন আমাকে ফেলে বেহেশতে যাবে! তুমি আমার জন্য একটু সুপারিশ করো!

এমন হতেই পারে যে, বেহেশতে যাওয়ার জন্যে স্ত্রীকে সুপারিশ ধরতে হবে, জান্নাতে যাওয়ার জন্যে স্বামীকে স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হতে হবে। কাজেই স্বামীর হুকুম মানাতে ছোট হয়ে যাবে না; বরং স্বামীর হুকুম মানল বলেই সে আল্লাহর কাছে দামী হয়ে গেল। তাই আল্লাহর কাছে দামী হওয়ার জন্য স্ত্রীদের কর্তব্য স্বামীর হুকুম মানা। স্বামীকে নিজের হুকুমমতো চালানো ঠিক নয়। তাতে আল্লাহর অবাধ্যতা হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তাআলা নিয়ম করেছেন– স্ত্রী স্বামীর হুকুমে চলবে। কিন্তু আমাদের মহিলারা মনে করে, স্বামীর হুকুমে চললে তো আমি ছোট হয়ে যাব। এটা একটা ভুল ধারনা।

কারো হুকুম মেনে চলা কেবলই দুনিয়ার নিয়ম-শৃঙ্খলা। আমরা সরকারের হুকুমে চলছি, এজন্যে কি আমরা ছোট হয়ে গেছি? রাস্তায় ড্রাইভার যখন গাড়ী চালায়, তখন ট্রাফিক তাকে থামিয়ে দেয়। ট্রাফিক হাত তোলে আর গাড়ী থামিয়ে দেয়। ওই গাড়ীর ভিতরে হয়তো এক মন্ত্রী আছে। এখন ট্রাফিক তাকে থামিয়ে দিল। ট্রাফিকের হুকুম সে মেনেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডাক্তারের হুকুম মানে না? কিন্তু ডাক্তারের হুকুম মানার কারণে কি সে ছোট হয়ে গেছে? এটা একটা শৃঙ্খলা, যা না হলে সে সুস্থ থাকবে না।

এরকমই পারিবারিক সুস্থতা ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে স্বামীর হুকুম মানলে। এটা একটা নিয়ম। এজন্য কেউ ছোট বড় হয়ে যায় না। মানুষ বড় হয় তাকওয়ামতো চললে আর ছোট হয়ে যায় তাকওয়াবিহীন জীবনযাপন করলে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দীন মানার এবং বোঝার তাওফিক দান করুন।

তো মূলকথা যেটা বলছিলাম সেটা হলো এই– অন্যের দিকে না তাকিয়ে আমার নিজের কী আছে সেদিকে যেন তাকাই। আমার কী আছে সেদিকে যদি তাকাই, তাহলে আমি দুনিয়ার জীবনে সুখী হতে পারব এবং তখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ করা হবে। তখন আল্লাহও আমাকে স্মরণ করবেন। আর আল্লাহ যদি আমাকে স্মরণ রাখেন, ব্যস তাহলে আমার মতো ভাগ্যবান জগতে আর কেউ নেই,

তাতে আমার জগতে কিছুই না থাকুক। কিছু না থেকেও আমি প্রকৃত ধনী হয়ে যাব। আমার জীবন সফল হয়ে যাবে। আর গরীবি হালের মধ্যেও সুখ ও আনন্দে আমার মন ভরে যাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে তাঁর হুকুমমতো চলার তাওফীক দিন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# কবর-হাশর ও জান্নাতের জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

"এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে, যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের প্রতি কোনও জুলুম করা হবে না।"[১৩০]

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ! আমার মা ও বোনেরা!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়ায় অল্প একটা সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন। সময় বড় কম। যে ব্যক্তি খুব দীর্ঘায়ু পায়, অনেকদিন

---

১৩০. সূরা বাকারা : ২৮১

বাঁচে, সে বড়জোর একশ কি আরো দু-চার বছর বাঁচে। না হয় ষাট-সত্তর বছরের মধ্যেই মানুষ দুনিয়া থেকে চলে যায়। অনেকে শৈশবে মারা যায়। কেউ যুবক বয়সে মারা যায়। কেউ বৃদ্ধ হতে পারে। কেউ জানে না যে, সে আসলে কখন মারা যাবে। যদি অনেকদিন বাঁচে, তবুও সময় বড় কম। স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সময় চলে যায়। প্রত্যেকে নিজের অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখুক কোথা থেকে সময়টা কীভাবে চলে গেল। ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর চলে গেছে। কীভাবে গেছে? কোথা থেকে গেছে? মনে হয় যেন স্বপ্ন। শৈশবের দিনগুলো চোখে ভাসে। এর মাঝখান দিয়ে কীভাবে এত বছর চলে গেল? এভাবে সবটা সময় চলে যাবে। তারপর আছে কবর।

মৃত্যুর পর তিনটা জায়গা। এক হল কবর। আরেক হল হাশরের ময়দান। তারপর চিরসুখের জান্নাত বা চিরদুঃখের জাহান্নাম।

## কবরের কঠিন কাল

কবরের জীবন অনেক লম্বা। দুনিয়ায় আমরা যারা বাঁচি, বড়জোর একশ বছরই বাঁচলাম। কিন্তু কবরের জীবন শত শত বছরের। হাজার হাজার বছরের জীবন। যতদিন পর্যন্ত হাশর না হয়, ততদিন পর্যন্ত কবরে থাকতে হবে। মাটির কবর। অন্ধকার কবর। কারো জন্য তা জান্নাতের বাগান হবে, কারো জন্য হবে জাহান্নামের গর্ত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ

> অর্থাৎ কবর জান্নাতের বাগানসমূহের মধ্য হতে একটি বাগান হবে অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের মধ্য হতে একটা গর্ত।[১৩১]

যদি নেক কাজ নিয়ে যাওয়া যায়, ভালো আমল নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে এ মাটির কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। জান্নাতের

---

১৩১. জামে' তিরমিযী : ২৪৬০

নিআমত সেখানে পাওয়া যাবে। জান্নাতের বিছানা সেখানে বিছিয়ে দেওয়া হবে। জান্নাতের খাবার পৌঁছানো হবে। তখন তো সুখের ভেতরই দিন কাটবে। যখন হাশর হবে তখন মনে হবে, সামান্য একটা সময়ই এ কবরে থেকেছিলাম। এত তাড়াতাড়ি এ সময়টা পার হয়ে গেল?! সুখের সময় খুব তাড়াতাড়ি পার হয়। কিন্তু যদি নেক আমল নিয়ে না যাওয়া হয়, তখন এ কবর জাহান্নামের টুকরা হয়ে যাবে। ছোট্ট একটা কবর তখন আরো ছোট্ট হয়ে যাবে। এবং সে ছোট্ট কবরে জাহান্নামের আগুন পৌঁছানো হবে। সাপ-বিচ্ছু পৌঁছানো হবে। এমন সাপ, এমন বিচ্ছু, যা আগুনে মরে না, আগুনে পোড়ে না। সে এক কঠিন জীবন। ওই কঠিন জীবন সহজে শেষ হতে চাবে না। কবরের দিনগুলো সহজে কাটতে চাবে না। কারণ কষ্টের সময় সহজে কাটে না। এত লম্বা শত শত হাজার হাজার বছর কীভাবে কাটবে?

## হাশরের বিভীষিকা

এক তো হল কবর। এরপর আছে হাশর। হাশরের ময়দানেও শত শত হাজার হাজার বছর কাটবে। মানুষ অস্থির হয়ে পড়বে। এ ময়দানে কোটি কোটি মানুষ। গাদাগাদি ঠাসাঠাসি মানুষ। প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে আর বলতে থাকবে– নাফসী! নাফসী! হায় হায়! আমার কী হবে?! নবী রাসূলগণও বলবেন,

اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ

আল্লাহ আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও।[১৩২]

কঠিন একটা সময় হাশরের ময়দান। কী হবে বিচারে? যখন আসামির বিচার হয়, বিচারক রায় শোনাবে যখন, তখন আসামির পক্ষের-বিপক্ষের সমস্ত মানুষ উৎকণ্ঠায় থাকে, কী রায় যেন হয়! সময় কাটতে চায় না, কখন রায় হবে, কখন বিচার হবে।

---

১৩২. সহীহ বুখারী : ৮০৬

ওখানে হবে আল্লাহর আদালত। ওইখানে কী রায় হবে তার জন্য সবাই অপেক্ষা করবে। সহজে বিচার কাজ শুরু হবে না। সবাই পেরেশান হবে যে, কখন বিচার হবে। মাথার উপর থাকবে উত্তপ্ত সূর্য। কোথাও কোনও ছায়া পাওয়া যাবে না, আরশের ছায়া ছাড়া। কিন্তু সে আরশের ছায়ায়ও সবাই জায়গা পাবে না। বিশেষ নেককার যারা, তারাই জায়গা পাবে। আর বাকি সবাই প্রচণ্ড রোদের ভেতর থাকবে। ঘামতে থাকবে। ঘামের ভেতর ভাসবে। শত শত হাজারো বছর কেটে যাবে। সবাই অস্থির হয়ে পড়বে। বিচার তো হোক!

ছোটাছুটি করবে। নবীদের কাছে যাবে। আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। সবাই তাঁকে বলবে, আপনি আল্লাহকে বলুন– বিচারের কাজ যেন শুরু হয়ে যায়। এখনো টিকিট কাউন্টার খুলেনি, কখন খুলবে, কখন লোক আসবে, কখন টিকিট দেবে, পেরেশান হয়ে পড়ে সবাই। যদি টিকিট দেওয়া শুরু হয় তখন মনে হয়– না, একটু পরে আমার পালা আসবে। কিন্তু টিকিট দেওয়া যদি শুরু না হয়, আমার পালা কখন আসবে এই অস্থিরতা বিরাজ করে। মানুষ পেরেশান হয়ে যায়। এজন্য বেশি দেরি হলে সবাই ভাঙচুর শুরু করে দেয় যে, এখনো কেন টিকিট দিচ্ছে না। কিন্তু ওখানে কে কী ভাঙচুর করবে? তাই ছোটাছুটি করবে। নবীদের কাছে যাবে।

আদম আলাইহিস সালাম কে গিয়ে বলবে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনি প্রথম মানুষ। কী পেরেশানিতে আমরা আছি দেখুন। আপনি আল্লাহকে বলুন, সুপারিশ করুন যেন তিনি বিচারের কাজ শুরু করে দেন। এভাবে একেক নবীর কাছে যাবে। কেউ রাজি হবে না। সবশেষে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় পড়ে যাবেন এবং তাঁর সুপারিশে বিচারের কাজ শুরু হবে। ওইটা এক-দুই ঘন্টার বিষয় নয়; শত শত হাজারো বছরের বিষয়।

কবরে শত শত হাজার হাজার বছর। হাশরের ময়দানে হাজারো বছর। এরপর বিচার যখন হবে তখন রায় পক্ষে হবে অথবা বিপক্ষে হবে।

যার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে সে জান্নাতে যাবে। জান্নাতে গেলে তার আর কোনও দুঃখকষ্ট নেই। অনন্তকাল সুখের ভেতর কাটবে। আর যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না, তাকে অনন্তকাল দুঃখকষ্টের ভেতরে জাহান্নামে থাকতে হবে। জান্নাতেও কোনও মৃত্যু নেই। জাহান্নামেও কোনও মৃত্যু নেই। অনন্তকাল থাকতে হবে। তো তিনটা জায়গা। এক হল কবর। এরপর হল হাশর। আর সবশেষে জান্নাত বা জাহান্নাম। সর্বশেষ ঠিকানা। কেউ আমরা জাহান্নামে যেতে চাই না। কেউ চাই না, হাশরের ময়দানে উত্তপ্ত রোদের মধ্যে থাকি। কঠিন অবস্থার মধ্যে থাকি। আমরা সবাই চাই হাশরের ময়দানে যেন আল্লাহর আরশের নিচে জায়গা পাই। কেউ চাই না, আমার কবর জাহান্নামের টুকরো হয়ে যাক। সবাই চাই আমার কবর যেন জান্নাতের বাগিচা হয়ে যায়। ওই তিন জায়গায় সুখ পাওয়ার জন্যই এ দুনিয়ার জীবনটা। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সময়টা দিয়েছেন এজন্য যে, বান্দা চেষ্টা করে করে ওই তিন জায়গার সুখ অর্জন করতে পারে।

## দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত সময় আখিরাতের প্রস্তুতিকাল

বলেছিলাম, কবরও অনেক লম্বা সময়ের। হাশরও অনেক লম্বা সময়ের। জান্নাত-জাহান্নাম অনন্ত কালের। তার বিপরীতে দুনিয়া অনেক ছোট্ট, অতি সংক্ষিপ্ত। এ সংক্ষিপ্ত সময় আবার কীভাবে যেন কেটে যায়। ঘুমের ভেতর কেটে যায়। স্বপ্নের ভেতর কেটে যায়। হাতে সময় বড় কম। বড়ই কম। এ সময় তিন জায়গার সুখ অর্জন করতে হবে। তাহলে এ সময়ের কী গুরুত্ব? এ সময় কতটা মূল্যবান? আমরা এ সময়ের মূল্য বুঝছি না। এ সময়টা আমরা হেলাফেলায় নষ্ট করি। অথচ এ সময়টাকে কাজে লাগানোর উপরে নির্ভর করে কবরে আমার কী হাল হবে, হাশরে কী হাল হবে এবং শেষ ঠিকানা জান্নাত হবে না জাহান্নাম। যে সময়ের উপর নির্ভর করে তিন জায়গার সফলতা সে সময়টাকে কী করে আমরা হেলায় নষ্ট করতে পারি? কেবল হেলায় নষ্ট করি? নষ্ট করি গুনাহর মধ্যে। আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে নষ্ট করি। এখনো সময় আছে সতর্ক হয়ে যাওয়ার। কবরের ডাক যখন চলে

আসবে, তখন আর কোনও সুযোগ থাকবে না। আজরাইল যখন সামনে এসে যাবে, তারপর আর কোনও সুযোগ থাকবে না। আজরাইল যে-কোনও সময়ই সামনে এসে যেতে পারে। কেউ জানে না কখন আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ

যখন তাদের সে সময় আসে, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পেছনেও যেতে পারে না এবং এক মুহূর্ত আগেও না।[১৩৩]

এসে যখন যাবে, তখন আর কোনও সময়-সুযোগ দেওয়া হবে না। আফসোস করবে। আল্লাহ বলেন–

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَآ أَخَّرْتَنِيْٓ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী) ব্যয় করো, এর আগে যে, তোমাদের কারো মৃত্যু এসে যাবে আর তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে কিছু কালের জন্য সুযোগ দিলে না কেন, তাহলে আমি দান-সদাকা করতাম এবং নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।[১৩৪]

আল্লাহ তাআলা আরো জানান–

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

যখন কারো নির্ধারিত কাল এসে যাবে তখন আল্লাহ তাকে কিছুতেই অবকাশ দেবেন না। আর তোমরা যা-কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবহিত।[১৩৫]

---

১৩৩. সূরা ইউনুস : ৪৯

১৩৪. সূরা মুনাফিকূন : ১০

১৩৫. সূরা মুনাফিকূন : ১১

আল্লাহ বলবেন–

أَوَ لَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ، فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

আমি কি তোমাদেরকে এমন দীর্ঘ আয়ু দেইনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং এখন মজা ভোগ করো। কেননা এমন জালেমদের কোনও সাহায্যকারী নেই।[১৩৬]

তোমাদেরকে এ বয়স দিয়েছিলাম, যে বয়সে সতর্ক ও সচেতন হতে চাইলে তা হতে পারতে। উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে তা গ্রহণ করতে পারতে। কিন্তু অবহেলায় কাটিয়েছ। তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছিল। তোমাদের কাছে নবী রাসূল এসেছিল। নবী রাসূলের পক্ষ থেকে উপদেশদাতাগণ তোমাদের উপদেশ দিয়েছিল। সতর্ককারীগণ তোমাদেরকে সতর্ক করেছিল। জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছিল। কান দাওনি, আর এখন আফসোস করছ যে আরো কেন সময় দিলে না!

এ অল্প সময় কিন্তু অনেক মূল্যবান। এ সময়টাকে যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে কত অর্জন হতে পারে! একবার সুবহানাল্লাহ বলতে কতটুকু সময় লাগে? এক সেকেন্ড? এক সেকেন্ডেরও কম। একবার সুবহানাল্লাহ বলতে এক সেকেন্ডেরও কম সময় লাগে। একবার আলহামদুলিল্লাহ বলতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। অথচ এর এত ফযীলত যে বলা হয়েছে–

تَمْلأُ الْمِيزَانَ

দাঁড়িপাল্লা ভরে যায় পুণ্যে আর নেকীতে।[১৩৭] এক সেকেন্ডের আমল। অথচ কত নেকী এর দ্বারা পাওয়া যায়।

---

১৩৬. সূরা ফাতির : ৩৭

১৩৭. সহীহ মুসলিম : ২২৩

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ

'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ' দাঁড়িপাল্লা ভরে ফেলে।[১৩৮]

এত ছাওয়াব, এত পুণ্য অর্জন হয় মাত্র এক সেকেন্ডের কাজে। মাত্র এক সেকেন্ড। অথচ এমন শত শত হাজার হাজার সেকেন্ড আমরা নষ্ট করি ফালতু কথার ভেতর, গুনাহের কথার ভেতর, গীবতের ভেতর। আর তার দ্বারা দাঁড়িপাল্লার পাপের দিকটা ভরে ফেলি। দাঁড়িপাল্লার দুই দিক– একটা নেকীর দিক, আরেকটা পাপের দিক। নেকীর দিকটা ভরে নেক কাজের দ্বারা আর পাপের দিকটা ভরে পাপের কাজের দ্বারা। আর এ পাপ কাজ তো করছি প্রতিনিয়ত। আর এভাবেই সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। মোমের মতো সময় গলে যাচ্ছে। যে সময় চলে যায়, তা কি আর কোনওদিন ফিরে আসে?

## চলে যাওয়া সময়ে কার কী অর্জন

এই যে আজকের এ মঙ্গলবার, এই যে মাগরিবের পরের সময়টা যাচ্ছে, আর কোনওদিন তা ফিরে আসবে না আমার জীবনে। আমার জীবনে এ মঙ্গলবার ব্যস একটাই। মঙ্গলবার আরো আছে, সেটা অন্য তারিখের মঙ্গলবার। আঠারো সালের জুলাইয়ের তিন তারিখের মঙ্গলবারের মাগরিবের পরের সময় এই একটাই। জীবনে দ্বিতীয়বার কারো আসবে না। যে মুহূর্তটা চলে যায়, যে সেকেন্ডটা চলে যায়, ওটা একটাই। ওইটা আর কোনও দিন আসবে না। এ সময়ের যে কাজটা ছিল, এ যে সময়টা চলে গেল, এ কাজটা করা হল না। আর তো কোনও দিন করা যাবে না। কারণ এর পরে যে সময়টা আসবে, সে সময়টাতে তো আরেকটা কাজ আছে। সে সময় তো সে সময়ের কাজ করব। এ সময়টা যে কাজ করলাম, এ সময়টা যে চলে গেল, এটা চলেই গেল বিনা অর্জনে। কোনও দিন আর ফিরে আসবে না। এ সময়টা আমার জীবন থেকে ক্ষয় হয়ে গেল নিষ্ফল। কিংবা পাপের ভেতর ক্ষয় হয়ে গেল।

---

১৩৮. প্রাগুক্ত

আমরা কখনো চিন্তা করি না। জীবনের এ মূল্যবান সময় নিয়ে কখনো ভাবি না। বিনা অর্জনে কিংবা পাপের ভেতর দিয়ে কেটে যায়। তা নিয়ে কোনও আফসোস করি না। টাকা-পয়সার বেলায় কী করি? ঠিকই আফসোস করি। একটা টাকা যদি খামোখা খরচ হয়, আফসোস হয়, আহা! একটা টাকা এমনিতেই চলে গেল! এর বিনিময়ে আমি কিছুই পেলাম না! কারো একটা টাকা এমনভাবে ছিড়ল যে, আর কোনও দোকানদার নেয় না। কিংবা একটা টাকা আগুনে পুড়ে গেল। পানিতে পড়ে গেল, তা তোলার আর কোনও সুযোগ নেই। কিংবা এমন কিছু কিনল, যা কোনও কাজে লাগবে না, ফেরতও দেওয়া যাবে না। পচা ফল কিনল। এ ফলটা খাওয়াও গেল না। আবার এ টাকাটা ফেরতও পাওয়া গেল না। কত আফসোস হয়! আহা! আমার পঞ্চাশ টাকা জলে গেল, এর বিপরীত আমি কিছুই পেলাম না! না খাবারটা খেতে পারলাম আর না টাকাটা ফেরত পাব। এ নিয়ে কত আফসোস হয়। কিন্তু এর চেয়েও কত মূল্যবান সময়। যে সময়কে মূল্যবান কাজে ব্যবহার করে আমার কবরের সুখ, হাশরের ময়দানের নিরাপত্তা এবং চিরসুখের জান্নাত লাভ করতে পারি। সে সময়টাকে এভাবে কাটাই যে, তা নিয়ে আমার কোনও আফসোস নেই। আপনি আমি প্রত্যেকেরই এই অবস্থা।

## প্রয়োজন নিজের হিসাব নেওয়া

অন্যের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। প্রত্যেকের নিজের দিকে তাকানো উচিত। আমার দশাটা কী! আমার হালটা কী! নিজেকে খুব ভালো মনে হয়। আমি বড় ভালো। কিন্তু হিসাব নিলে দেখা যাবে, আমার মতো খারাপ আর কেউ নেই। প্রত্যেকে যদি নিজের হিসাব নেয়, তাহলে বুঝতে পারবে, আমার মতো খারাপ জগতে আর কেউ নেই। অহংকার করি, বড়াই করি। রাস্তায় হাঁটি আর ভাবি আমি কী যেন! বাস্তব হল এই– আমার মতো খারাপ আর কেউ নেই। হিসাব নেই না তো এজন্য খুব আহ্লাদের মধ্যে আছি। হিসাব নিলেই কিংবা নেক লোকের সাথে নিজেকে তুলনা করলেই বোঝা যাবে আমি কী!

আমি বটতলা বাজার থেকে এক রিকশায় চড়ে আসলাম। বাজার নিয়ে আসলাম। আমি রিকশাচালককে বিশ টাকা ভাড়া দিলাম। রিকশাচালক চলে গেল। কিছুক্ষণ পর দরজায় আওয়াজ হল। বের হয়ে দেখি সে রিকশাচালক। এ রিকশাচালক আমাকে বলল, আপনি আমাকে কত টাকা দিয়েছেন? আমি বললাম, বিশ টাকা দিয়েছি। রিকশাচালক বলল, আমি তখন লক্ষ করিনি। আপনি দিয়েছেন আর আমি নিয়ে গেছি। নিয়ে গিয়ে দেখি বিশ টাকা। আমি আবার ফেরত এসেছি। আপনি বিশ টাকা কেন দিলেন? আমার ভাড়া হল দশ টাকা। আমি কোনও দাম ঠিক করে নেইনি। দূরের হলে আমি দাম ঠিক করি। দাম ঠিক করেন নেওয়া উচিত। কিন্তু এটুকুতে আমি দাম ঠিক করি না এজন্য যে, আমার নিয়তই থাকে একটু বেশি দেব। এমনিতে তো বটতলা থেকে এখানে ভাড়া দশ টাকাই হওয়ার কথা। কিন্তু আমি বিশ টাকাই দিই। তো সে বলল, ভাড়া দশ টাকা। আপনি বিশ টাকা কেন দিলেন? দশ টাকা ফেরত নেন। আমি বললাম, আমি এ অতিরিক্ত দশ টাকা খুশি হয়েই তোমাকে দিয়েছি। আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তোমাকে দিয়েছি। এটা তোমার জন্য হালাল। ও বলল, ভাড়া যা, তার চেয়ে বেশি নেওয়াটা হালাল না। আমি এটা নেব না। আর আমি কিছুতেই এ দশ টাকা তাকে গছাতে পারিনি। আমি তার কাছে পরাজিত হয়েছি। অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক বলেছি– তোমার জন্য এটা হারাম না, কিন্তু সে কিছুতেই নিল না। শেষপর্যন্ত সে রাগ করে বলল, আপনি কি আমাকে হারাম খাওয়াবেন? শেষে কী আর করব! আমি আর তাকে দশ টাকা দিতে পারিনি। তখন আমার নিজেকে নিজের কাছে বড় হীন, তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে হয়েছে। এ লোকের কাছে আমি কী! এ লোক হালালের বিষয়ে এত সচেতন! তার জন্য এটা হালালই ছিল, কারণ আমি তো খুশি মনেই দিয়েছি, কিন্তু সে মনে করছে– এটা তো ভাড়ার টাকার চেয়ে বেশি। এটা সে নেয়নি। আমার কাছে মনে হল– সে তো ফিরিশতা। তার সামনে আমি কী? যদি নিজের হিসাব করি, ভালো লোকের সঙ্গে নিজেকে মিলাই, তখন বোঝা যাবে আসলে আমি কী।

নিজেকে বড় ভালো মনে হয়। আসলে তো এ জাতীয় লোকই জান্নাতী। আমরা রিকশাচালককে পাত্তা দিই না।

আল্লাহওয়ালা বলতে আমরা বুঝি যে, হুজুর হতে হবে, পাগড়ী থাকতে হবে, লম্বা দাড়ি থাকতে হবে, আলখাল্লার মতো গায়ে কিছু থাকতে হবে। তাহলেই মনে করি আল্লাহওয়ালা। এগুলো অবশ্যই জরুরি। কিন্তু প্রকৃত আল্লাহওয়ালা কে? আল্লাহর ভয় যার মধ্যে আছে সেই আল্লাহওয়ালা। দুনিয়ার মুহাব্বত যার ভেতর নেই; আখিরাত নিয়েই যার চিন্তা, সেই আল্লাহওয়ালা।

একবার এই ওযুখানার সামনে এক লোককে দাঁড়ানো দেখলাম। তার গায়ের জামাটা কেমন! পরতে পরতে পেছনটা একদম কোমরের কাছাকাছি চলে এসেছে। ছেঁড়া-ফাঁড়া পুরনো জামা। বারবার মসজিদের দিকে তাকাচ্ছে। এত বড় মসজিদ! তার কাছে ভালো লাগছে। সে মুগ্ধ হয়ে বারবার মসজিদের দিকে তাকাচ্ছে। নিতান্তাই গরীব মানুষ। তার জামাটা দেখে আমার মনে হল, আমার কত জামা! কত ভালো ভালো জামা! আর এ লোকটা এমন জামা গায়ে দিয়ে আছে! তাকে ফকীর মনে হয়নি আমার। আমি তাকে বললাম, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আমার একটা জামা আপনাকে দিতে চাই। সে লোক বলল, আমি ভাই জামা দিয়ে কী করব? আমার তো জামা আছে। অথচ তার গায়ের জামাটা একেবারে পরার উপযুক্ত না। আমাদের এখানে একজনও নেই যে, এ জামা পরতে রাজি হবে। কিন্তু সে বলল, আমার তো জামা আছে। আমি তো তাকে বেশ কয়েকবার অনুরোধ করলাম, কিছুতেই সে রাজি হয়নি। তার একটাই কথা– আমার আছে, আরেকটা দিয়ে কী করব? আমি তাকে দিতে পারিনি। এই তো আল্লাহওয়ালা। আর আমাদের লোভ যেন মেটেই না। চাহিদার কোনও শেষ নেই। রাক্ষুসে ক্ষুধা। কোনও কিছুতেই আমাদের চাহিদা মেটে না। নিজেকে ভালো আমরা কী করে মনে করি! লোভী তো আমরা। আর এ লোকই হল আল্লাহওয়ালা। হালালের বিষয়ে অটল আর দুনিয়ার কোনও আকর্ষণ তার ভেতর নেই।

## জাহান্নামের খাসলত

'আরো চাই', 'আরো চাই', যা কিনা জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

সেই সময় স্মরণ রাখো, যখন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি ভরে গেছ? সে বলবে, আরো কিছু আছে কি?[১৩৯]

এ তো জাহান্নামীদের খাসলত। জাহান্নাম বলবে– আরো আছে?

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে বলবেন, তোর কি ক্ষুধা মিটেছে?

জাহান্নাম বলবে–

هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

আরো আছে? আরো চাই। তার ক্ষুধা মেটেনি। আমাদের ক্ষুধা ওই রকমই। আরো চাই। আরো চাই।

জান্নাতের বিষয়টা বিপরীত। জান্নাত هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ বলবে না; বরং এখানে আল্লাহ বলবেন,

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

এবং তারা (অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ) তাতে পাবে এমন সবকিছু, যা তারা চাবে এবং আমার কাছে আছে আরো বেশি কিছু।[১৪০]

## জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলবেন

জান্নাতে অকল্পনীয় নিআমত আল্লাহ তাআলা দান করবেন। জান্নাতী জান্নাতে যাবে এবং সে মনে করবে– অনেক পেয়ে গেছি। আল্লাহ

---

১৩৯. সূরা কাফ : ৩০

১৪০. সূরা কাফ : ৩৫

বলবেন, আরো চাও। জান্নাতী বলবে, আল্লাহ, কী চাব? আমার সব চাহিদা মিটে গেছে। আল্লাহ বলবেন–

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

আমার কাছে আরো আছে।

আমি তোমাকে আরো দিতে চাই। রাক্ষুসে ক্ষুধা জান্নাতের নয়। কাজেই জান্নাতী মানুষ যারা হবে তাদের মধ্যে জাহান্নামী ক্ষুধা থাকবে না। তারা বলবে, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা যথেষ্ট। আমার যথেষ্ট আছে। তার মানে এই নয় যে– দুনিয়ায় কেউ কামাই-রোজগার করবে না। সে কামাই করবে। সে কামাই করবে নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। সে নিজ চাহিদা দমন করবে। কামাই করবে এজন্য যে, কামাই করে করে তার দ্বারা পুণ্য অর্জন করবে। সে গরীব দুঃখীর মুখে হাসি ফোটাবে। আল্লাহর পথে খরচ করবে, সেজন্য কামাই করবে। মুমিনের কামাই নিজের পেট ভরার জন্য নয়। আমরা কী মুমিন হয়েছি! মুমিন ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। সে কালের যারা মুনাফিক ছিল, আমাদের চরিত্র তাদের সাথেই বেশি মেলে। মুমিন যারা ছিলেন তাদের অবস্থা এমন ছিল না যে, কামাই করবেন নিজের ক্ষুধা মেটানোর জন্য। তারা কামাই করতেন মানুষের জন্য। কামাই করব মানুষের জন্য। আর যা পাই সেটাকেই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করব। রাক্ষুসে ক্ষুধা আমাদের মধ্যে থাকবে না। এটা জাহান্নামের খাসলত। আমরা দুনিয়ায় নিজ চাহিদা দমন করব। এর পুরস্কার আল্লাহ আখিরাতে দেবেন এবং বলবেন–

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

আল্লাহ বলবেন, তোমাকে আমি আরো দিতে চাই। আর যারা অনন্ত চাহিদা মেটাতে চাইবে তাদের উদ্দেশ্যে জাহান্নাম বলবে–

هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ

আমি আরো চাই। এটা হল জাহান্নামের খাসলত। যারা জাহান্নামী তাদের মধ্যে এ খাসলত থাকবে। যারা নেককার মুমিন, আমরা যারা জান্নাত চাই, আমাদের মধ্যে কেন এ খাসলত থাকবে? কিন্তু এ খাসলত

যখন আমার মধ্যে আছে, এ অবস্থায় আমি কী করে ভাবতে পারি যে, আমি বড় ভালো? নিজেকে বড় ভালো মনে হয়। না, নিজের আমলের খতিয়ান নেওয়া উচিত। দোকানী প্রত্যেকদিন হিসাব করে, কত টাকা বিক্রি হল আর এর ভেতর কত টাকা লাভ হল। রোজ হিসাব করে। মাসে একবার তো করেন। আমার কী পুঁজি এখানে খাটালাম আর কী লাভ হল। আমরা করি না। মানে যারা জান্নাত চাই, তারা কিন্তু করছি না। বড় আশ্চর্য, জান্নাত যারা চায়, জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জীবনের কোনও হিসাব নেই! তারা ঘুমের ভেতর কাটাচ্ছে। এ ঘুমের ভেতর দিয়ে জান্নাত পাওয়া কী সম্ভব? এ তো এক অবাস্তব কল্পনার মধ্যে আমরা আছি।

## অবিরাম যাত্রা কবরের দিকে

আমাদের এ ঘুম ভাঙ্গা উচিত। সতর্ক হওয়া উচিত। সময় খুব বেশি নেই। যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সময় কিন্তু কম। যে-কোনও সময় ডাক পড়ে যাবে। আজরাইল হাজির। আজরাইল তো পেছন পেছন ছুটছে। আমিও সামনে চলছি। চলছি আমার কবরের দিকে। আমার মৃত্যুর দিকে চলছি। আর পেছনে পেছনে আজরাইল আসছে। চোর চুরি করার পর পালায় আর তাকে ধরার জন্য পেছন থেকে লোকজন ধাওয়া দেয়। চোর দিশা না পেয়ে এক গলির ভেতর ঢোকে। কিন্তু এমন এক গলিতেই ঢোকে, যে গলির মাথা বন্ধ। ওখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই। যেই না গলির মাথায় পৌছে গেল, অমনি পেছনে যারা ধাওয়া করছিল তারা তাকে জাপটে ধরল। কোথায় যাবে চান্দু! ঠিক ওই অবস্থাই আমাদের। আমরা ছুটছি। প্রত্যেকদিন আমরা সামনের দিকে চলছি। বয়স ত্রিশ-চল্লিশ-পয়তাল্লিশ হচ্ছে। সামনে চলছি। চলতে চলতে একটা সময় এমন আসে, এরপর আর সামনে দিন নেই। আর কোনও মুহূর্ত নেই। পেছনে আজরাইল আসছে। একসময় জায়গামতো এসে গেল। এখন আর তুমি কোথায় যাবে? যে-কোনও সময় মৃত্যু আমাদের এসে যাবে। তার জন্য সতর্ক হওয়ার দরকার। সতর্ক হওয়ার মানে হল দুইটা বিষয়। এক হলো,

আল্লাহ তাআলা কিছু কিছু কাজ আমাকে করতে বলেছেন। আর দ্বিতীয় হলো, কিছু কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। যে কাজগুলো করতে বলেছেন সেগুলো করা। আমাদের শুধু অবহেলা আর আলস্য। আল্লাহ নামায পড়তে বলেছেন কে না জানি! সত্য কথা বলতে বলেছেন, আমরা কে না জানি! মানুষকে ধোঁকা দিতে নিষেধ করেছেন, কে না জানি! গীবত করা নিষেধ, মিথ্যা বলা নিষেধ, এটা কে না জানি। হালাল খাওয়া ফরয, আমরা কে না জানি! হারাম খাওয়া জায়েয নেই, এটা আমরা সবাই জানি। কী কী করতে আল্লাহ বলেছেন তাও জানি। আর কী কী করতে নিষেধ করেছেন তাও জানি। কাজ এ দুটো। যা করতে আল্লাহ বলেছেন, মনোযোগ সহকারে তা করা। আর যা করতে নিষেধ করেছেন, সতর্কতার সঙ্গে তা থেকে বিরত থাকা। উপায় একটাই– প্রত্যেকদিন হিসাব করা। প্রত্যেকদিন যদি হিসাব করতে থাকি যে, করণীয় কাজ আমি কতটুকু করছি আর যা বর্জনীয় তার থেকে কতটুকু বিরত থাকছি, ইনশাআল্লাহ এক সময় আসবে, যখন অভ্যাস হয়ে যাবে এবং তখন সমস্ত নেক কাজ সহজ হয়ে যাবে। সমস্ত পাপ কাজ ছাড়াও সহজ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হায়াতে বরকত দান করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





# আল্লাহর পথে দান-খয়রাত

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– মুমিন ব্যক্তি কৃপণ হতে পারে না। একজন লোক মুমিনও হবে আবার সে কৃপণ, এটা হতেই পারে না। কিন্তু আজকাল তো এটাই হচ্ছে। আজকাল তো আমরা দেখছি– একজন লোক মুমিন আবার কৃপণও। সে কে? আমি নিজে। আমরা প্রত্যেকেই তো এ অবস্থাতেই আছি। কৃপণ বললেই আমরা তাকাই ধনী লোকের দিকে। মনে করি, দান-সদাকা করবে তো ধনী লোকে। কাজেই ধনী লোক যদি দান-সদাকা না করে তাহলে সে কৃপণ। এটা একটা ভুল কথা। দান-সদাকা কেবল ধনীই করবে,

গরীব নয়, এটা ইসলামী কথা না। কুরআন মাজীদ কেবল ধনীকেই দান-সদাকা করতে বলেনি। ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর জন্য অর্থ) ব্যয় করে এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ এরূপ পুণ্যবানদেরকে ভালোবাসেন।[১৪১]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছেও আমরা এ শিক্ষা পাই না যে, কেবল ধনী লোকই দান করবে। আমরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনী যদি দেখি, তাদের আখলাক-চরিত্র, তাদের আমল যদি লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব সেখানে কেবল ধনী সাহাবীরাই নয়; বরং গরীব সাহাবীরাও দান করতেন।

আসলে ইসলাম সকলকেই আপন আপন সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী দান করতে বলে। এবং ছাওয়াবটাও হবে দানের পরিমাণ অনুযায়ী নয়; বরং সামর্থ্য অনুপাতে। প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কী পরিমাণ দান করল সেটাই হল লক্ষণীয়, অঙ্ক কী সেটা নয়। তার ক্ষমতার কত অংশ দান করল, তার যা সম্পদ আছে তার কত অংশ সে আল্লাহর পথে খরচ করল, সে হিসাবেই ছাওয়াব হবে। কাজেই এক টাকার ছাওয়াব এক কোটি টাকার থেকেও বেশি হতে পারে। এক কোটি টাকার মালিক, সে তার সম্পদের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ দিয়েছে। আর যে দশ টাকা দিয়েছে সে তার সম্পদের একশ ভাগের এক ভাগ দিয়েছে। তাহলে শতাংশ অনুযায়ী সে বেশি দিল। সুতরাং ওই এক লক্ষ টাকার দাতার চেয়ে এ দশ টাকার দাতা বেশি ছাওয়াব পাবে। সুতরাং দানশীল হওয়া বা বখিল হওয়া কেবল ধনী লোকের বিষয় নয়; এটা ধনী-গরিব সকলেরই বিষয়। তাই

---

১৪১. সূরা আলে ইমরান : ১৩৪

আমাদের কর্তব্য, আমরা নিজ নিজ তাওফীক অনুযায়ী দান করব এবং নিজে নিজের বিচার করব।

যখনই বখিল শব্দটির উচ্চারণ হয়, তখন নিজের দিকে তাকাব। যখনই দানশীলতার কথা আসে তখন নিজের হিসাব নেব যে, আমি আমার জীবনে আমার ক্ষমতা অনুযায়ী কী পরিমাণ দান করেছি। নিজেই নিজের হিসাব নেব, অন্যের হিসাব নেওয়া নয়। মনে রাখতে হবে, ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জন করার বিষয়টাকে নিজের ভোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেনি। তুমি কামাই করবে কেবল নিজের ভোগের জন্য, এমন নয়। ইসলাম সে কথা বলে না। তুমি কামাই করো, জান্নাত লাভের জন্য। তোমার যে অর্থ আছে, সে অর্থ-সম্পদ জান্নাত লাভের জন্য ব্যয় করো। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

> বস্তুত আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে –এর বিনিময়ে।[১৪২]

আল্লাহ তাআলা মুমিনের জান এবং মাল দুটোই মুমিনের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। মুমিনের জানও জান্নাতের বদলে, তার মালও জান্নাতের বদলে। জান-মাল কোনওটাই দুনিয়ার ভোগের জন্য নয়। তাহলে দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে এই– আমার সম্পদ আমার ভোগের জন্য নয়। এটা আল্লাহ তাআলা কিনে নিয়েছেন। এর বদলে আমি জান্নাত পাব। তাই জান্নাত পাওয়ার যত খাত আছে, সমস্ত খাতে আমি অর্থখরচ করব। এ দৃষ্টিভঙ্গি যদি থাকে, তাহলে নিজে যেটা খাব সেটা জান্নাতে যাওয়ার জন্যই হবে, নিজের ছেলেমেয়েকে যা খাওয়াব তাও জান্নাতের জন্য হবে এবং যা অন্যান্য নেক কাজের জন্য খরচ করব তাও জান্নাতের জন্য হবে।

---

১৪২. সূরা তাওবা : ১১১

সম্পদকে নিজের ভোগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করলে চলবে না; বরং নেক কাজের যত খাত আছে সমস্ত খাতেই তা বণ্টন করতে হবে। তাতে আমার পক্ষে যতটুকুই করা সম্ভব হয়। সাহাবায়ে কেরাম কী করেছেন? এক সাহাবী এসে বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে দান-সদাকা করতে বলেছেন। আমার কিছুই ছিল না। আমি পুরোদিন খেটে ইহুদীর বাগানে পানি দিয়েছি। তাতে আমি দুই দিরহাম পেয়েছি। সে দুই দিরহামের এক দিরহাম আমি ঘরের খরচের জন্য রেখেছি, আর এক দিরহাম আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। দুই দিরহাম মাত্র। সে দুই দিরহাম আজকালকার হিসাব অনুযায়ী কী আর হবে? ধরলাম একশ টাকাই হল। সেই একশ টাকার পঞ্চাশ টাকা নিজের ঘরে রেখে এসেছেন, আর বাকি অর্ধেক অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য নিয়ে এসেছেন।

আমরা হলে বলব– সারাদিন কুলিগিরি করেছি দান-সদাকা করার জন্য? আমার খাওয়াই জোটে না, আবার দান-সদাকা! আমরা তো এভাবেই চিন্তা করি। আমার নিজের খাবারই জোটে না, আবার দান-সদাকা! তারা উপার্জনই করতেন এজন্য যে, কীভাবে আল্লাহর পথে খরচ করা যায়।

## হযরত উলবা ইবন যায়দ আনসারী রাযি.-এর ঘটনা

এ বিষয়ে অনেক চমৎকার চমৎকার হাদীছ আছে। সম্ভবত হযরত উলবা ইবন যায়দ ইবন আমর আল আনসারী রাযি.-এর ঘটনা। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জিহাদের জন্য মাল চাইলেন, তখন সাহাবায়ে কেরামকে দান করতে বললেন। কিন্তু ওই সাহাবী বাড়ি গিয়ে দেখেন কিছুই নেই। আল্লাহর পথে খরচ করবেন এমন এক দিরহামও তার কাছে নেই। তিনি রাত জাগলেন। আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলেন– হে আল্লাহ! আপনার রাসূল জিহাদের জন্য টাকা খরচ করতে বলেছেন। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি তো আমাকে কোনও সম্পদ দেন নাই। আমি আপনার পথে কী খরচ করব? এরপর আল্লাহ তাআলাকে লক্ষ্য করে বলেন– হে আল্লাহ! আপনার যত বান্দা আমাকে যতভাবে কষ্ট দিয়েছে, কেউ আমাকে গালি দিয়েছে, কেউ

আমার নিন্দা করেছে, গীবত করেছে, কেউ আমাকে কোনওভাবে ঠকিয়েছে, মোটকথা যেই আমাকে কোনওরকম কষ্ট দিয়েছে, আমি সবটাই ক্ষমা করে দিলাম এবং হে আল্লাহ! আর আজকের জন্য এটাই তোমার পথে আমার দান।

ভোরবেলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পরে বসলেন, এরপর ডাক দিলেন– আজকে রাত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে খরচ করেছে সে কোথায়? রাত্রে তো কেউ খরচ করেনি। কেউ সাড়া দিচ্ছে না। দ্বিতীয়বার আবার ডাক দিলেন, আজ রাতে আল্লাহর পথে যে খরচ করেছে সে কোথায়? এবারও কোনও সাড়া শব্দ নেই। যারা যা দান করেছে তা তো দিনের বেলা দান করেছে, রাত্রে তো কেউ করেনি। তৃতীয়বার আবার ডাক দিলে ওই সাহাবী মনে করলেন, আমার কথাই বলা হচ্ছে কি না? রাত্রে তো আমি আল্লাহ তাআলাকে লক্ষ্য করে এ কথা বলেছিলাম। ওই সাহাবী এগিয়ে আসলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকে রাত্রে আমি আল্লাহকে এই এই কথা বলেছি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সুসংবাদ নাও। আল্লাহ তাআলা তোমার ওই কথাকে আল্লাহ তাআলার পথে দান হিসেবে লিখে দিয়েছেন।[১৪৩] চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর পথে দান কতভাবে হতে পারে? আল্লাহ তাআলার পথে দান করার জযবা সাহাবায়ে কেরামের কেমন ছিল তাও দেখুন। একটা টাকাও নেই বলে পেরেশান, আল্লাহর পথে কী দান করবেন। শেষে আল্লাহকে লক্ষ্য করে ওই কথা বললেন– আমি এটাকেই তোমার পথে দান করলাম।

ওই রকম গরীব তো আমাদের মধ্যে কেউ নেই। তারপরও কেউ যদি থাকেও, তাহলে তার জন্য সুযোগ রয়ে গেছে যে, সে যদি এ কথা বলে– হে আল্লাহ! আমাকে যে যেভাবে কষ্ট দিয়েছে আমি সবটাই মাফ করে দিলাম এবং এ ক্ষমাকে আমি তোমার পথে দান হিসেবে পেশ করলাম, তুমি কবুল করে নাও, তবে এর দ্বারাও আল্লাহর পথে দান-খয়রাতের ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

---

১৪৩. আলইসাবাহ, উক্ত সাহাবীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

## আবূ যামযাম এর ঘটনা

এ প্রসঙ্গে আরো এক হাদীছ আছে। একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আবূ যামযামের মতো হতে পারে না? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ যামযাম কে? বললেন, তোমাদের আগের উম্মতের ভেতরে একজন লোক ছিল আবূ যামযাম নামে। সে প্রত্যেকদিন ভোরবেলা উঠে বলত– হে আল্লাহ! আমাকে যে যতভাবে কষ্ট দিয়েছে, আমি সব ক্ষমা করে দিলাম, তুমি এ ক্ষমাকে কবুল করে নাও।[১৪৪] আল্লাহর কাছে ক্ষমালাভের কত সুন্দর উপায়! এতে একদিকে আল্লাহর রাস্তায় দান-সদাকা করারও সুযোগ পাওয়া যাবে, আবার আল্লাহর কাছে ক্ষমাও পাওয়া যাবে। আমাদের তো দরকার ওইটাই। আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়াই তো আমাদের দরকার । এমন কী আমল আছে, যা আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমার জন্য পেশ করতে পারি? এমন একটা আমল সম্পর্কেও আমরা কেউ দাবি করতে পারি, যার কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাব? এমন কোনও আমল সম্পর্কে এ দাবি করতে পারি? আমাদের আমল তো রিয়ায় ভরা। আমাদের আমলের ভেতর ইখলাস কতটুকু আছে? এমন একটা আমল সম্পর্কে দাবি করা যাবে না যে, আমার এ আমলের ভেতর রিয়া ছিল না, মানুষকে দেখানোর কোনও মানসিকতা ছিল না। এ দাবি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। সে দাবি যদি করতে না পারি, তাহলে কোনও আমল সম্পর্কে এ আশা করাও কঠিন। এমনিতে তো আমরা আশাবাদী যে, আল্লাহ আমাদের আমল কবুল করবেন। কিন্তু এ দৃঢ় বিশ্বাস যে, অবশ্যই কবুল হয়ে গেছে, এটা করা সম্ভব না। তাই যদি না হয়, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাব কী দিয়ে?

হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর মতো মানুষ, তাঁর নেকী কী পরিমাণ আছে বলে ভাবা যায়! তাঁর ছাওয়াব কত বেশি ছিল, এ জগতের

---

১৪৪. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৮৮৭

কোনও যন্ত্র আছে যা দিয়ে মাপা যাবে? এক আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. ছাড়া জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে বলতে পারে আমার নেকী তার সমান হবে? নবীগণের কথা আলাদা। নবীগণের পরে এক আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-কে বাদ দিলে জগতে আর কে আছে এমন, যে বলতে পারে আমার নেকী উমর ফারূক রাযি.-এর সমান! সারা জগতের মানুষের নেকী এক পাল্লায় দিলেও তো সমান হতে পারবে না।

সেই উমর ফারূক রাযি.-এর মতো মানুষ কাঁদতেন আর বলতেন– আহা! আমি যদি একটা খড়কুটো হতাম! তিনি বলতেন– যদি এতটুকু হয়, আমি কিছু পেলামও না, আর আমার দায়ও কিছু থাকল না, সমান সমান, তাহলেই আমার জন্য অনেক। আমার পাপ-পুণ্য সমান সমান হয়ে গেল– এমন যদি হয়, হে আল্লাহ! তাহলেই তো আমার জন্য অনেক! ভাবুন তো দেখি! এত নেকী, এত কামাই করা সত্ত্বেও তিনি বলছেন– যদি সমান সমান হয়ে যায় সেটাই অনেক পাওয়া!

এ অবস্থায় আমরা কিসের ভরসা করতে পারি? কোনও ভরসা নেই। কাজেই আমাদের আমল সব বাদ। শুধু আল্লাহ গাফূরুর রাহীমের কাছে আমি ক্ষমাটাই চাই। কোন হিসাবনিকাশ নয়; তোমার কাছে ক্ষমাই চাই হে আল্লাহ! সাহাবায়ে কেরাম, আল্লাহওয়ালা বুযুর্গানে দীন সবাই ওই কথাই বলতেন। কাজী নজরুলের একটা বড় চমৎকার কবিতা এ প্রসঙ্গে আছে। সেখানে এ কথা আছে– হিসাব চাই না আল্লাহ! তোমার কাছে ক্ষমাই চাই। তুমি আমার কাছে হিসাব নেবে হে আল্লাহ! আমি সেটা চাই না। আমি এটা চাই– হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো। তো আল্লাহর কাছে ক্ষমাই তো আমাদের দরকার। যদি মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে ক্ষমা পাওয়া যায়, তাহলে এটা তো সহজ পথ।

আবূ যামযাম প্রত্যেকদিন ভোরে এ কথা বলতেন– হে আল্লাহ! আমাকে যে যেভাবে কষ্ট দিয়েছে, আমি সব ক্ষমা করে দিলাম। প্রত্যেকদিন ভোরে এ কথা বলতেন। আমরা যদি এটা করতে পারি, তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা ক্ষমা পেতে পারি। উলবা ইবন যায়দের যে ঘটনা শোনালাম, ওইভাবে আমরা দান-সদাকা করার ছাওয়াবও পেতে পারি।

আল্লাহর পথে দান-সদাকা করতেই হবে। এক হাদীছে বলা হয়েছে–

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদিও একটা খেজুরের একটা অংশ হয়, তার মাধ্যমে।[১৪৫]

আল্লাহর পথে খরচের কিছু নেই, অথচ জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে। কীভাবে বাঁচবে? ওই একটা খেজুর তোমার ঘরে আছে। সে খেজুরের অর্ধেক তুমি খাও আর অর্ধেক আল্লাহর পথে খরচ করো। একটা খেজুরের অর্ধেক খেয়ে কী হবে? সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর জীবনে তো এমনও হয়েছে যে, একটা খেজুরই আছে, ব্যস।

## হযরত আবূ হুরায়রা রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. একদিন ঘর থেকে বের হলেন। খাবার কিছু নেই। প্রচণ্ড ক্ষুধা। মসজিদে গেলেন। দেখলেন সেখানে আরো অনেক লোক। তারা জিজ্ঞেস করলেন– আবূ হুরায়রা! কেন এসেছ? বললেন, ক্ষুধা। ক্ষুধার যন্ত্রণায় এসেছি। তারা বলল, আমরাও তো ক্ষুধার যন্ত্রণায় এখানে এসেছি। ঘরে কোনও খাবার নেই। সবাই ক্ষুধার্ত। শেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সবাই গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কেন এসেছ? সবাই বললেন, ক্ষুধা। তাঁর ঘরে একটা ঝুড়ি ছিল। তিনি ঝুড়ি বের করলেন। তাতে কিছু খেজুর আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে দুই-দুইটি দিলেন। ক্ষুধা মেটানোর একমাত্র ব্যবস্থা এই। একেকজনকে দুইটা করে খেজুর দিলেন। মাত্র দুইটা খেজুর। আবূ হুরায়রা রাযি. সেখান থেকে একটা খেজুর খেলেন, আরেকটা খেজুর কোঁচড়ে ঢোকালেন। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখে পড়ে গেল। জিজ্ঞেস করলেন, আবূ হুরায়রা! একটা খেজুর খেলে, আরেকটা যে লুকালে? ব্যাপার কী? বললেন, আমার তো এ দুইটা জুটেছে। কিন্তু ঘরে আমার

১৪৫. সহীহ বুখারী ১৪১৭,৬০২৩

মা সম্পূর্ণ না খেয়ে আছেন। এই একটা খেজুর তার জন্য রেখেছি। বললেন, আবূ হুরায়রা! দুটোই খেয়ে ফেলো। তোমার মা'কেও দুইটা দেওয়া হবে।[১৪৬]

এমন হয়েছে 'সীফুল বাহ্‌র' এর যুদ্ধে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ রাযি. একটা করে খেজুর দিলেন সকলকে। পরবর্তীতে তিনি যখন এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন সবাই জিজ্ঞেস করে– মাত্র একটা খেজুর! সে একটা খেজুরে আপনাদের সারাদিন হত? উনি বললেন– যেদিন ওই একটা খেজুরও জোটেনি সেদিন বুঝেছি যে, ওই একটা খেজুরের কী মূল্য! খেজুর সব শেষ হয়ে গেল। সারা দিনে আর একটা খেজুরও জোটে না। বলা হল– তাহলে? সেদিন কী করেছিলেন? বললেন– কী আর করব? খেজুরের বিচি চুষতাম আর পানি খেতাম। এভাবে দিন কাটাতাম।[১৪৭] এ অবস্থাতেও তারা জিহাদ করেছেন। আজকালকার যুদ্ধের মতো নয়। আজকালকার যুদ্ধ তো কাপুরুষতা। সারা দুনিয়ার সবচে' কাপুরুষ জাতি হল আমেরিকা। তারা চুরি করে করে যুদ্ধ করে। আসমানে উঠে এমন জায়গা থেকে বোমা মারে, যেন কেউ তাদের নাগালে না পায়। ভয়– যদি মরে যাই। কিন্তু সেকালের যুদ্ধ ছিল সামনাসামনি। বীরত্ব তো সেকালেই ছিল। সামনাসামনি যুদ্ধ করতেন সারাদিন না খেয়ে কিংবা একটা খেজুর খেয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

> জাহান্নাম থেকে বাঁচো, যদি আল্লাহর পথে একটা খেজুরের একটা অংশ দিয়েও হয়।

তার মানে তোমার কাছে যদি আর কিছু না থাকে, কেবল একটা খেজুর থাকে, তাহলে সে খেজুরের অর্ধেক তুমি খাও আর অর্ধেক আল্লাহর পথে খরচ করো। তুমি যত গরীবই হও না কেন, তোমার যে সম্পদ আছে, যাই আছে, তা তোমার একার ভোগের জন্য নয়। যা আছে,

---

১৪৬. তবাকাতে ইবনে সা'দ ৪/৩২৮

১৪৭. আলবিদায়া ওয়াননিহায়া, মাকতাবাতুল মা'আরিফ, বৈরুত, ৪/২৭৬

তার কিছু তুমি খাবে আর কিছু আল্লাহর পথে খরচ করবে। খরচ করতেই হবে।

## তাহলে জান্নাতে যাবে কিসের দ্বারা?

এক সাহাবী একদিন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গায়ে জোর কম। রক্ত দেখলেই ভয় পাই। কাজেই জিহাদ করা আমার পক্ষে অনেক কঠিন। আবার আমি এত গরীব মানুষ যে, আল্লাহর পথে খরচ করব এমন কিছুই আমার নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَا صَدَقَةَ، وَلَا جِهَادَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟

তুমি জিহাদও করবে না আবার দান-সদাকাও করবে না। তাহলে জান্নাতে যাবে কী দিয়ে?[১৪৮]

আমরা আমাদের নিজ নিজ অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে কেবল ভোগের কথাটাই ভাবি। আমি গরীব মানুষ! আল্লাহর পথে কী খরচ করব? মুমিনের কথা এটা হতে পারে না। মুমিনের তো মনের ভেতর বেদনা থাকবে। কীভাবে আল্লাহর পথে খরচ করব, সে যন্ত্রণা তার থাকবে। নিজ ক্ষুধার চেয়েও বেশি যন্ত্রণা তার থাকবে আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য। আমাদের সে যন্ত্রণা নেই। আল্লাহর পথে খরচ আমরা করতেও চাই না। আমাদের প্রত্যেকেই মহাকৃপণ! খরচ করতে গেলেই আমাদের কষ্ট লাগে। ওই যে বলা হয়– জান যদি চাও, জান দেব, কিন্তু টাকা যদি চাও সেখানে কথা আছে। আল্লাহর পথে টাকা খরচ করতে বড় কষ্ট লাগে আমাদের। জান্নাতে যেতে চাইলে এ মানসিকতা ছাড়তে হবে। দু হাতে লুটাতে হবে। আল্লাহর পথে দু হাতে খরচ করতে হবে। নিজে খাওয়ার চেয়ে দান করাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ নিজে খেলে সেটা তো গেল। নিজে যা খেলাম তা তো শেষ। এ তো মলমূত্র হয়ে শেষ।

---

১৪৮. বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান : ৩০২৫

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, আয়েশা! কী আছে? বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটা ছাগল জবাই করা হয়েছিল। তার সামনের রানটা রেখে দেওয়া হয়েছে। আর সব আল্লাহর পথে খরচ করেছি। কেবল ওই একটা রান আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আয়েশা! আল্লাহর পথে যা খরচ করা হয়েছে সেগুলোই আছে আর এ রানটাই নেই। এই যে রান রাখলে, এটা ছাড়া আর সবই আছে।[১৪৯]

## আখিরাতের ব্যাংকে কার কী পরিমাণ জমা হয়েছে?

আমাদের হিসাব অন্যরকম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী হিসাব শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা কী হিসাব করি? আমাদের সব উল্টে গেছে। আমরা হিসাব করি, আমাদের ব্যাংকে কত টাকা জমা আছে। আমার আলমারিতে কত টাকা জমা আছে। আমার হিসাবের খাতায় কতটুকু জমা আছে। আমরা এ হিসাব করি। মনে করি, যেটা ব্যাংকে আছে সেটা জমা আছে। যেটা আলমারিতে আছে, মনে করি এটা আছে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, এটাই নেই; বরং আল্লাহর পথে যেটা দিয়েছ সেটাই আছে। আল্লাহ তাআলা তো সে কথাই বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে। এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা-কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত।[১৫০]

আল্লাহকে ভয় করো! আর প্রত্যেকে এ জিনিসটা চিন্তা করে দেখো, আগামী দিনের জন্য তুমি কী সঞ্চয় করেছ। আগামী দিনের জন্য তুমি

---

১৪৯. জামে তিরমিযী : ২৪৭০

১৫০. সূরা হাশর : ১৮

কী রেখেছ সেটা চিন্তা করো। সে আগামী দিন হলো মৃত্যুর পরের দিন। ওই দিনের জন্য কী করেছ? হিসাবটা তো এভাবে করতে হবে। কামাই-রোজগার করব কেন? আখিরাতের কামাইয়ের জন্য, খাওয়ার জন্য নয়। হ্যাঁ, খেতে তো হবে। দুনিয়ায় বাঁচতে হলে খেতে তো হবে। এটা দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার নিয়ম। কিন্তু আমার কামাই-রোজগারের উদ্দেশ্য এটা হবে না। এটা হল ঠেকার কাজ। যেটা ঠেকার কাজ, সেটা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। ঠেকার কাজ তো ঠেকা সারার জন্য। যে ব্যক্তি বাথরুমে ঢোকে, সে কি বাথরুমে ঢোকার জন্য দুনিয়ায় পয়দা হয়েছে? ওটা কি তার জীবনের লক্ষ্য? ওটা তো ঠেকার জন্য। ঠিক ওইরকম, পেট ভরা, খাওয়া, এটা তো ঠেকার জিনিস। আমার জীবনের লক্ষ্য তো জান্নাত কামাই করা। আমি জান্নাতে যেতে চাই। আর জান্নাতে যেতে চাইলে তার জন্য উপায় হল আল্লাহর পথে জানমাল খরচ করা, আখিরাতের ব্যাংকে জমা করা। আল্লাহ বলছেন–

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

আল্লাহ মুমিনের জন্য জান্নাত রেখেছেন আর তার বদল হল মুমিনের জান এবং মাল– এই দুই জিনিস।[১৫১] জান খরচ করতে হবে আল্লাহর পথে। জান খরচ করা মানে যদি আল্লাহর পথে শহীদ হতে হয় তাও হওয়া। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। এর বাইরেও আছে। রোযা রাখি, সেখানেও তো জানের কষ্ট আছে। নামায পড়তেও জানের কষ্ট আছে। হজ্জ করতেও জানের কষ্ট আছে। এর বাইরেও আছে। যেমন কোনও রোগী দেখতে গেলাম। তো রোগী দেখতে গেলে কী ছাওয়াব হয়? রোগী দেখতে গেলে সেখানেও তো জানের কষ্ট আছে। যে ব্যক্তি রোগী দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহর রহমতের সাগরে ডুব দিতে থাকে। এভাবে সে ডুব দিয়ে দিয়ে নিচে নামছে আর নামছে। এরপর গিয়ে রোগীর পাশে যেই না বসে, অমনি সে যেন আল্লাহর রহমতের সাগরে পুরোপুরি ডুবে গেল।[১৫২] এটা মিশকাত শরীফে আছে। কী

১৫১. সূরা তাওবা : ১১১

১৫২. মুসনাদে আহমাদ : ১৪২৬০

চমৎকার হাদীছ। যখনই রোগী দেখতে থাকে তখনই সে আল্লাহর রহমতের সাগরে নামতে থাকে। আর গিয়ে যখন রোগীর কাছে বসে, তখন যেন সে আল্লাহর রহমতের সাগরে পুরোপুরি ডুবে যায়। এ সবই আল্লাহর পথে জান খরচ। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, এটা আল্লাহর পথে জান খরচ। কারো মাথায় বোঝা তুলে দেওয়া, এটা আল্লাহর পথে জান খরচ। কারো মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে দেওয়া, এটাও আল্লাহর পথে জান খরচ।

## একজনের খাবারে দু'জনের চলে

এমনিভাবে আল্লাহর পথে মালও খরচ করতে হবে। যা আছে তাই। ধনী হওয়া শর্ত নয়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে শিক্ষা দিয়েছেন–

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ

একজনের খাবার দুজনের চলে।[১৫৩]

ঘরে আজকে পাঁচজনের খাবার রান্না করা হয়েছে। তার মানে এর দ্বারা দশজনের চলবে। এ সময় যদি মেহমান হাজির হয় তাহলে কেন বিরক্ত হও? মাত্র পাঁচজনের খাবার রান্না করেছি, তিনজনের খাবার রান্না করেছি, এর মধ্য দিয়ে একটা লোক এসে গেল, এখন খাওয়াব কী তাকে! আমরা বিরক্ত হই– মেহমানের জন্য তো কিছু তৈরি করিনি। খাওয়ার সময় কোনও ক্ষুধার্ত লোক দরজায় গেল। রান্না হয়েছে তিনজন কি চারজনের খাবার। তো বলে– মাফ করো। কেন মাফ করবে? তাকে দেওয়ার মতো খাবার কি ঘরে নেই? অতিরিক্ত খাবার তো রান্না হয়নি, তোমাকে দেব কোত্থেকে, এ হলো আমাদের চিন্তা, মানসিকতা। আমাদের মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের হিসাব-নিকাশ নষ্ট হয়ে গেছে। ওই যে কথা বললাম শুরুতেই যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী হিসাব শিক্ষা দিয়েছেন আর আমরা কী হিসাব করি! কেন বিরক্ত হও? চারজনের খাবার যখন রান্না হয়েছে,

---

১৫৩. সহীহ মুসলিম : ৫৪৮৯

এ দিয়ে তো আটজনের চলবে। মাত্র একজন ফকির এসেছে। কেন বিরক্ত হও? তুমি তো আরো তিনজনকে দিতে পারবে! একজন মেহমান এসেছে। কেন বিরক্ত হও? তুমি তো আরো চারজনকে খাওয়াতে পারবে। যদি চারজন এসে যায়, তাহলেও তো এর দ্বারাই চলবে। শোনো,

طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِيْ لِلإِثْنَيْنِ

একজনের খাবার দিয়ে দুইজনের চলে

তুমি কেন ধরে নিয়েছ যে, চারজনের রান্না হয়েছে, এটা আমরা চারজনই খাব, এতে আর কাউকে ভাগ বসাতে দেব না? এটাই তো বখিলি। এটাই তো কৃপণতা, যে কৃপণতার হাদীছ এতক্ষণ পড়া হল। এটাই কৃপণতা যে, তোমার খাবারে তুমি আরেকজনকে ভাগ বসাতে দেবে না। বরং তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে, তোমার দুয়ারে একজন ক্ষুধার্ত মানুষ এসে হাজির আর বলছে– মা! খাবার দাও। তুমি শুক্‌র আদায় কর যে, তোমার ঘরে খাবার আছে, ওই লোকের খাবার নেই। সে তোমার কাছে এসে খাবার চেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এ অবস্থাতে রেখেছেন যে, তোমার কাছে এক ক্ষুধার্ত এসে খাবার চাইতে পারে। তোমার তো শুক্‌র আদায়ের সুযোগ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন এক অবস্থাতে রেখেছেন যে, আমি তাকে খাবার দিতে পারছি, সে আমার কাছে খাবার এসে চেয়েছে। অথচ এ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

## কে বড় দানবীর?

আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর রাযি. অনেক বড় দানবীর ছিলেন। অনেক বড় দাতা ছিলেন। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। এক বাগানে লক্ষ করে দেখলেন বাগানের মালী রুটি খাচ্ছে আর তার সামনে একটা কুকুর। সে ওই রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজে একবার খাচ্ছে, আরেকবার কুকুরকে দিচ্ছে। একবার নিজে খাচ্ছে, একবার কুকুরকে খাওয়াচ্ছে। দেখে উনি অবাক হলেন। এমনও কেউ করে নাকি? এক লোকমা নিজে

খায় আরেক লোকমা কুকুরকে দেয়! এ করে করে রুটিটা খেল। এরপর তিনি কাছে গিয়ে তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

আচ্ছা, আমি দেখলাম– রুটি ছিঁড়ে তুমি একটু খাচ্ছ, ওই কুকুরটাকে একটু খাওয়াচ্ছ। ব্যাপারটা কী বলো তো?

আমি খাচ্ছিলাম এমন সময় এ কুকুর এসে হাজির। সে ক্ষুধার্ত। আমার দিকে তাকাল। এক ক্ষুধার্ত জীবের চোখ আমার চোখে পড়ল। তখন আমার খুব লজ্জা লাগল। আমি খাব আর সে খাবে না তা কী করে হয়। এজন্য দুজনে ভাগাভাগি করে খেলাম। দেখুন কী বলছে– এক ক্ষুধার্তের চোখ আমার চোখে পড়েছে। তাকে না দিয়ে খাব আমার খুব লজ্জা লেগেছে।

জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কার গোলাম?

বলল, মুসআব ইবন যুবায়রের।

তো উনি মুসআব ইবন যুবায়র রহ.-কে গিয়ে ধরলেন। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.-এর ছেলে মুসআব। বললেন, ভাই! আমি তোমার গোলামকে কিনতে চাই। বললেন, ঠিক আছে, কিনবে কী! আমি তোমাকে গোলামটা এমনিই দিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি কিনেই নিলেন। তারপর বাগানটাও কিনলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আসওয়াদ! আমি তো তোমাকে কিনেছি।

আসওয়াদ বলল, আল্লাহ তাআলা এ কেনায় আপনাকে বরকত দান করুন।

আমি কিন্তু বাগানটাও কিনেছি।

এ বাগানেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে বরকত দান করুন।

আসওয়াদ! আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

আসওয়াদ! এ বাগানটা আমি তোমাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম।

আমি কবুল করলাম এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

এটা আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর রাযি.-এর ঘটনা। কেমন দানশীল ছিলেন! হাজার হাজার দিরহাম মূল্যের সম্পদ কতক্ষণের মধ্যে আল্লাহর পথে দিয়ে দিলেন। ব্যস, ওই গোলাম স্বাধীন হয়ে গেল আর বাগানের মালিকও হয়ে গেল। তারপর কী ঘটল লক্ষ করুন।

আসওয়াদ এবার তাকে বলল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এ বাগানটা আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলাম।

আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর স্তম্ভিত। তিনি ভীষণ নাড়া খেলেন। তারপর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর নিজেকে বলছেন– আব্দুল্লাহ! তুমি খুব দানশীল, না! তুমি মনে করে থাক যে, তুমি অনেক বড় দানশীল! সত্যিকারের দানশীল তো এই আসওয়াদ।[১৫৪] তুমি সারা জীবনে অনেক দান করেছ বটে, তবে তোমার সর্বস্ব দান করনি। আর এ গোলাম আজকে মাত্র আজাদ হল। জীবনে কোনওদিন মালিকানা কী জিনিস তা বোঝেনি। কারণ গোলাম তো নিজেই নিজের মালিক নয়। সে মালের মালিক কী করে হবে? আজকেই সে প্রথম কিছুর মালিক হল। এইমাত্র এত মূল্যবান বাগানের মালিক হল। আর দেখো, এ মালিকানাটা সে একদিনও ভোগ করল না। মালিকানা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে এটাকে আল্লাহর পথে খরচ করল। এ হল আল্লাহর পথে দান।

## কারো কাছে কিছু চাওয়া প্রকারান্তরে তাকে মর্যাদা দেওয়া

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. বলেন, যখন কেউ আমার কাছে এসে কিছু চায়, তখন আমি মনে করি– আমি তার ইচ্ছা পূরণ করে তার যা উপকার করি, ওই লোক আমার কাছে চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার আমাকে করল। কেউ যখন আমার কাছে চায় এবং আমি তাকে দিই, এ দেওয়ার দ্বারা আমি তার যা উপকার করলাম, তারচে'

১৫৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইবরাহীম আল-হারবীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

সে যে আমার কাছে চাইল এর মাধ্যমে সে আমাকে আরো অনেক বেশি কিছু দিল। কারণ–

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উৎকৃষ্ট।[১৫৫]

সে আমার কাছে আসলো, আমার কাছে চাইল, আর আমার হাতকে উপরে রাখার সুযোগ করে দিল। সে যদি না চাইত তাহলে আমার হাত উপরে রাখতে পারতাম না। এভাবে সে তো আমাকে বেশি দিলো। সে আমার কাছ থেকে নিল, তাই তার হাত নীচে। আর আমি দিলাম, তাই আমার হাত উপরে। আমাকে এ সুযোগ করে দিয়ে সে তো আমার চেয়ে বেশি দিল। দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন! আমাদের মন খারাপ হয়ে যায় কেউ আসলে। দিতে চাই না। অথচ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, তারা দিতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য গণ্য করতেন। এ ক্ষেত্রেও আরো অনেক মূল্যবান শিক্ষা আছে।

ইয়াস ইবন মুআবিয়া রহ.-এর ঘটনা সম্ভবত। যে-কেউ তার কাছে এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে বলতেন- লিখে দাও। আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন– আমার কাছে কারো কিছু চাওয়ার হলে মুখে চাইবে না, লিখে দিবে। কারণ মুখে চাইলে তোমার ইজ্জত নষ্ট হল। মানুষের ইজ্জত অনেক মূল্যবান জিনিস। তুমি চেয়ে সেই ইজ্জত কেন নষ্ট করবে? তোমার এ মুখ মানুষের কাছে চাওয়ার জন্য নয়। কাজেই মুখে কিছু চাবে না। তোমার যা দরকার তা একটা চিরকুটে লিখে দিয়ো। মুখে চাইতে হবে না।

## মেহমান আসলে মন খারাপ করো না

বলছিলাম- ঘরে যখন খাবার রান্না হয় আর এ অবস্থায় মেহমান আসে, তবে কোনও দিন মন খারাপ করতে নেই। বরং শুক্‌র আদায় করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তার ঘরে মেহমান পাঠিয়েছেন। আল্লাহ

১৫৫. সহীহ বুখারী : ১৪২৭, ১৪২৯

তাআলা তার দরজায় এক ক্ষুধার্তকে হাজির করছেন। আর সে ক্ষুধার্তকে কিছু খাওয়ানোর সুযোগ, তাওফিক আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন। শুক্‌র আদায় করা দরকার। এতে ঘরের খাবারে টান পড়বে না। বরং সুন্দর একটা কথা আছে– মেহমান যদি কারো ঘরে খায়, তাহলে সেই ঘরে বরকত নাযিল হয়। আর যে খায় সে তো তার খাবারই খায়। একজন আরেকজনেরটা খায় না। একজনের রিযিক আরেকজন খেতে পারে না। তোমার ঘরে এসে যদি কোনও মেহমান খায়, তাহলে তো তোমার লাভ। লাভ এই– সে তো খেল তার খাবারই, তোমার খাবার খায়নি। তার রিযিক খেয়েছে। তোমার দস্তরখানে কিন্তু খেয়েছে। এতে লাভ হল এই যে, তোমার ঘরে বরকত নাযিল হল। মেহমানের অসিলায় তুমিও বরকত পেলে। সাথে দুনিয়ার সুনাম তো আছেই। যদিও তুমি সুনামের জন্য করবে না, কিন্তু সুনাম তো হয়ই। কারো ঘরে যদি মেহমান খায়, তাহলে অতিথিপরায়ণ ও মেহমাননাওয়াজ হিসেবে তার সুনাম হয়ে যায়। আর সেসঙ্গে বরকত হয়। আখিরাতে যে ছাওয়াব তা তো পাবেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْ اٰخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

যে আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।[১৫৬]

অতিথি আসলে তাকে সম্মান করো। বিরক্ত কেন হও? হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করে নাও। ইজ্জতের সঙ্গে তাকে বসাও। নিজ হাতে তাকে সেবা করো। ঘরে যে খাবার আছে সে খাবার তার সামনে পেশ করো। ভয় করো না। হাদীছে এসেছে–

طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِيْ للإثْنَيْن

একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

যে হাদীছগুলো পড়া হল, সে হাদীছগুলোর উপর আমল করার তাওফিক আল্লাহ তাআলা দান করুন। ব্যস, আমার পকেটে যা আছে,

---

১৫৬. সহীহ বুখারী : ৬১৩৭

আমার কাছে যা আছে, আমি তাই আল্লাহর পথে খরচ করব। ধনী হওয়ার অপেক্ষা নয়; বরং আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই পুণ্য অর্জন করব, নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। কেননা হাদীছে জানানো হয়েছে, দান-খয়রাত দ্বারা জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছেন–

اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

একটা খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

আমি জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين





# সহজে নেকী অর্জনের উপায়

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

গত মঙ্গলবারে আমাদের আলোচনায় এ কথা এসেছিল যে, দুনিয়া অল্পদিনের। এরপর কবর আর তারপর হাশর। তারপর জান্নাত বা জাহান্নাম। কবর অনেক লম্বা দিনের। দুনিয়ার চেয়েও অনেক বেশি দিন কবরে থাকতে হবে। হাশরের ময়দানও দুনিয়ার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। তারপর জান্নাত ও জাহান্নাম তো অনন্তকালের, কোনও শেষ নেই। দুনিয়া যখন অল্পদিনের আর ওই তিনটা জায়গা যেহেতু অনেক লম্বা, তাই আমার মূল চেষ্টা তো হওয়া উচিত এই যে, ওই তিন জায়গায় কীভাবে শান্তি হবে, কবরে কীভাবে শান্তি পাব, হাশরের ময়দানে কীভাবে আল্লাহর আরশের ছায়ায় জায়গা পাব, তারপর বিচার শেষে, যাতে জাহান্নামে না যাই; বরং জান্নাতে যেতে পারি। সমস্ত

মুমিনের চিন্তা তো এটাই হবে। কাজেই সে দুনিয়া নিয়ে বিভোর, দুনিয়ার স্বপ্নে মত্ত কীভাবে থাকতে পারে?

তার কাজ হবে আখিরাতের জন্য কামাই করা। দুনিয়ায় যা আছে সবই আখিরাতের কাজে ব্যয় করা। টাকা থাকলে সে টাকা ব্যবহার করবে আখিরাতের কাজে। গায়ের শক্তি ব্যবহার করবে আখিরাতের কাজে। তার বিদ্যা বুদ্ধি সবই সে খরচ করবে আখিরাত কামাই করার জন্য। আমরা দুনিয়ার টাকা-পয়সা কামাই করি। মনে করি, যত টাকা হবে তত শান্তি পাব। এখন যুবক বয়সে যত কামাই করব, বৃদ্ধ বয়সে তত শান্তি পাব। যারা বিদেশে আছে, তারা সেখানে অনেক কষ্ট-মেহনত করে উপার্জন করে সে টাকা দেশে পাঠায়। সে ভাবে, দেশে যত টাকা জমা হবে, ততই তার ভবিষ্যতে শান্তি হবে। মনে করে, বেশি টাকা হলে দুনিয়ার ভবিষ্যত জীবনে আরাম হবে, শান্তি হবে। ওই রকম আমাদের কবর আছে, হাশর আছে তারপর জান্নাত। সে তিন জায়গায় শান্তি তো আমরা পাব তখনই, যখন ওইখানকার টাকা-পয়সা আমরা বেশি কামাই করব। অর্থাৎ আখিরাতের টাকা। আর আখিরাতের টাকা হল নেকী, ছাওয়াব। যার যত বেশি ছাওয়াব হবে, যে যত বেশি পুণ্য-নেকী কামাই করতে পারবে, আখিরাতে শান্তি, কবরে শান্তি এবং হাশরের ময়দানে আরাম সে তত বেশি পাবে। পাপের চেয়ে যার পুণ্য বেশি হবে, গুনাহের চেয়ে যার নেকী বেশি হবে, সে কবরে-হাশরে সব জায়গায় শান্তি পাবে। তাই আমাদের সকলের ধ্যান-জ্ঞান ও চেষ্টা মেহনত এটাই হওয়া উচিত যে, কীভাবে বেশি বেশি নেকী কামাই করা যায়।

আমরা বড় অবহেলা করি। বড় গাফলতি করি নেকীর ব্যাপারে। ভবিষ্যত জীবনের টাকা-পয়সা নিয়ে তো আমাদের মাথা ব্যথা আছে, চিন্তা-ফিকির আছে এবং আছে চেষ্টা-মেহনত। কিন্তু আসল ভবিষ্যত আখিরাত। সে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমাদের চরম অবহেলা। নেহাত গাফলতির ভেতরে আমরা সময় নষ্ট করছি। অথচ আখিরাতের নেকী, আখিরাতের টাকা কামাই করা খুব সহজ। অতি সহজে, অতি আসানিতে বিপুল পরিমাণ আখিরাতের কামাই হতে পারে। একটু লক্ষ করলেই, একটু নজর দিলেই হয়ে যায়। যেহেতু আখিরাত নিয়ে

আমাদের কোনও ধান্দা নেই, তাই সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা নেকী কামাই করছি না। সাহাবায়ে কেরাম সবসময় নেকীর চিন্তা করতেন। তাদের ধান্দা ছিল আখিরাত। ফিকির ছিল একটাই– কবরে কী করে শান্তি হবে, হাশরের ময়দানে কীভাবে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ায় জায়গা পাওয়া যাবে এবং সবশেষে কত সহজে জান্নাত লাভ করা যাবে। এটাই ছিল তাদের চেষ্টা। কীভাবে ছাওয়াব কামাই করা যায়, সে চিন্তা তাদের সবসময় থাকত।

## হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর বাজারে যাওয়া

বাজার সবচে' খারাপ জায়গা, সেটা আমরা সবাই জানি। বাজার সবচে' খারাপ জায়গা। সাহাবায়ে কেরাম সে বাজারে যেতেন নেকী কামাই করার জন্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর ঘটনা আছে। তিনি তার এক ছাত্রকে নিয়ে রোজ বাজারে যেতেন। ওই ছাত্র সকাল বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত আর তিনি ওই ছাত্রকে নিয়ে বাজারে যেতেন। কিন্তু কিছুই কেনাকাটা করতেন না। বাজারে সবাই মালামাল কিনতে যায়, কিন্তু তিনি রোজ বাজারে যাচ্ছেন, অথচ কিছুই কিনছেন না। একদিন ওই ছাত্র ভোরবেলা তার কাছে গেলে তিনি বললেন– চলো বাজারে যাই। ওই ছাত্র বলল, হযরত! আপনি কেন বাজারে যান? আপনাকে কোনওদিন দেখলাম না বাজার থেকে কিছু কিনতে। বাজারে যান, কিছুক্ষণ থাকেন আর চলে আসেন। কোনও কিছু কিনতে কখনোই দেখি না। শুধু শুধু কেন বাজারে যাওয়া? বসুন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যে সমস্ত হাদীছ শুনেছেন, আমাদেরকে তা শোনান। সময়টা কাজে লাগল। আপনি হাদীছ বলেন, আমি শুনি। আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বললেন– ওহে পেটুক! (ওই ছাত্রের পেট বড় ছিল) তুমি মনে করছ বাজারে কেনাকাটা করতেই যাই। আমি তো বাজারে যাই–

مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ

অর্থাৎ সালামের জন্য।[১৫৭]

---

১৫৭. মুওয়াত্তা মালিক, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ২/৯৬১

আসসালামু আলাইকুম বললে দশ নেকী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললে বিশ নেকী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বললে ত্রিশ নেকী। আমি বাজারে যাই আর যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই বলি– আসসালামু আলাইকুম। অথবা সে আমাকে সালাম দেয়। আমি জবাব দিই। বাজারে যাই নেকী কামাই করতে। আমরা বাজারে যাই মাল কিনতে, আর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বাজারে যেতেন নেকী কিনতে। যেহেতু তাদের চিন্তাই ছিল আখিরাত, ফিকির ছিল আখিরাত, তাই বাজার খারাপ জায়গা হওয়া সত্ত্বেও সেখানেও নেকী খুঁজতেন। কোনওভাবে যদি নেকী ছুটে যেত, আফসোস করতেন। আক্ষেপ করতেন। আমাদের টাকাপয়সা কম হলে আক্ষেপ করি। আর তাদের যদি কোনও কারণে নেকী কামাই কম হত, কোনও এক নেকীর কাজ ছুটে যেত, আক্ষেপ করতেন।

## কত কত কীরাত নেকীই না হারালাম!

আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর আরেক ঘটনা। একবার হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হাদীছ বললেন– 'যে ব্যক্তি কারো জানাযায় শরীক হয় তার এক কীরাত নেকী কামাই হয়।' এক কীরাত বলতে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ বোঝায়। যারা হজ্জে গিয়েছেন, উমরায় গিয়েছেন, তারা উহুদ পাহাড় দেখেছেন। পাহাড় তো এমনিতেই বড়। আর মদীনা মুনাওয়ারায় উহুদ পাহাড় সবচে' বড়। বিশাল পাহাড়। যদি কেউ কারো জানাযায় শরীক হয়, তাহলে তার এক কীরাত নেকী কামাই হয়। তার মানে এই পরিমাণ নেকী কামাই হয়, যা উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার পর কবরে দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকে, তার দুই কীরাত নেকী কামাই হয়। মানে দুই উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ তার নেকী কামাই হয়। এ হাদীছ বললেন কে? আবূ হুরায়রা রাযি.। শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর আশ্চর্য লাগল। একটু বেশি বলে ফেলল কিনা! আবূ হুরায়রা রাযি.-এর ভুল হয়ে গেল কিনা! তাই তিনি মাসআলা তাহকীক করার জন্য গেলেন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর কাছে। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. অনেক বড়

পণ্ডিত ছিলেন। অনেক জ্ঞানী ছিলেন। বিদুষী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের যখন কোনও মাসআলায় মতভেদ হত, সমাধানের জন্য সবাই তাঁর কাছে যেতেন। আজকাল আমাদের মহিলারা মাসআলা-মাসায়েল কম জানে। কুরআন-হাদীছের জ্ঞান তাদের বড় কম। কিন্তু ইসলামের প্রথম জমানায় মহিলারা অনেক জানত। বড় বড় সাহাবীরও যখন কোনও বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিত, ছুটে যেতেন আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর কাছে। এ বিষয়েও যখন আব্দুল্লাহ ইবন উমরের মনে খটকা লাগল, তিনি ছুটে গেলেন মায়ের কাছে, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর কাছে। গিয়ে বললেন– ইয়া উম্মাহ! মা! নবীজির সম্মানিত স্ত্রীগণ তো আমাদের মা। আমাদের সমস্ত মায়ের চেয়ে বড় মা। তো তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন– আবূ হুরায়রা এ হাদীছ বলেছেন যে, কারো জানাযায় শরীক হতে পারলে এক কীরাত নেকী, তারপর যদি দাফন পর্যন্ত থাকে তাহলে দুই কীরাত নেকী। আপনি কী বলেন? বললেন,

صَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ

আবূ হুরায়রা ঠিক বলেছেন।

এ কথা শুনেই আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর আক্ষেপ হল, আফসোস হল– আহা! কত জানাযা চলে গেল। তাতে আমার শরীক হওয়া হয়নি। কিংবা হয়তো জানাযায় শরীক হয়েছি, কিন্তু দাফনে শরীক হইনি।

لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً

আহা! কত কীরাত আমি নষ্ট করলাম। কত কীরাত হারালাম।[১৫৮]

যত জানাযা হয়েছে, সবগুলোতে যদি শরীক থাকতে পারতাম, দাফনে শরীক থাকতাম, তাহলে কত উহুদ পরিমাণ নেকী আমাদের হাসিল হত! আফসোস! আমি এ সমস্ত নেকী হারালাম। কোনও এক কারণে নেকী কামাই করা না হলে অথবা নেকী কামাইয়ের সুযোগ হারালে এভাবে তারা আক্ষেপ করতেন। আফসোস করতেন।

---

১৫৮. সহীহ মুসলিম : ২২৩২

## ঘরে বসে যত নেকী

কিন্তু আমাদের কোনও আফসোস নেই। কত নেকী রোজ হারাই। অতি আসানিতে কত নেকী কামাই করা যেতে পারে ঘরে বসে বসে! বাইরেও যাওয়া লাগে না। ঘরে বসে বসে রোজ কত নেকী কামাই করতে পারি! একটু লক্ষ করলেই হয়ে যায়। যেমন মনে করুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কাজে ডান দিকটা পছন্দ করতেন। ডান দিয়ে শুরু করা পছন্দ করতেন।

يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছুতে ডান দিকটা পছন্দ করতেন। এমনকি চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরার সময়েও।[১৫৯]

চুল আঁচড়াতেন, তো আগে ডান দিক থেকে শুরু করতেন। যখন জুতা পরতেন, ডান দিক থেকে শুরু করতেন। ডান পা আগে দিতেন। ডান জুতা আগে পায়ে দিতেন এবং এরপর বাম। খোলার সময় উল্টা করতেন। জুতা তো আমরা সবাই পায়ে দিই। সবারই তো জুতা খুলতে হয়। যে ঘরে থাকে তারও। বাথরুমে যেতে হলে জুতা পরা লাগে। বাথরুম থেকে বের হয়ে জুতা খুলতে হয়। রোজ কয়েকবার বাথরুমে যাওয়া হয় পেশাব-পায়খানার জন্য। গোসলের জন্যও বাথরুমে যাওয়া হয়। এখন জুতা খোলা আর জুতা পরার কথা চিন্তা করুন। প্রত্যেকবার যদি ডান পায়ে আগে পরি আর বাম পা আগে খুলি, তাহলে যখনই ডান পা আগে পরলাম, একটা নেকী হল। আবার বাম পা আগে খুললাম, তো আরেকটা নেকী হল। আর

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

যে-কোনও নেকীকে আল্লাহ দশগুণ বৃদ্ধি করেন।[১৬০]

তাহলে ডান পায়ে জুতা পরলে দশ নেকী হবে। কমপক্ষে দশ নেকী। অর্থাৎ আগে যদি জুতায় ডান পা দিই, তাহলে কমপক্ষে দশ নেকী

---

১৫৯. সহীহ বুখারী : ৪২৬

১৬০. সূরা আনআম : ১৬০

হবে। আর আগে যদি বাম পা খুলি, দশ নেকী হবে। যদি দিনে পাঁচবার বাথরুমে যাওয়া হয় আর ডান পায়ে জুতা আগে পরা হয় এবং বের হয়ে আগে বাম পা খোলা হয়, তাহলে দশ দশ করে একশ নেকী। বাথরুমে কেবল জুতার ব্যবহারে কত নেকী হল? একশত নেকী হল। আবার বাথরুমে ঢুকতে আগে বাম পা দিয়ে ঢুকতে হয়। বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে আগে বের হতে হয়। তাহলে আগে যদি বাম পা দিয়ে ঢুকি আর ডান পা দিয়ে বের হই তাহলে একশ নেকী। বাথরুমে ঢোকা আর বের হওয়াতে দুশ নেকী হল। এক দিনে যদি দুশ নেকী হয়, এক মাসে হবে কত? ছয় হাজার নেকী। এটা মাগনা। নেকী পেলাম মাগনা। আচ্ছা, এক বছরে কত নেকী হবে? বাহাত্তর হাজার নেকী হল বিনা মেহনতে। কারণ জুতা তো পরতেই হবে। শুধু ডান-বামের প্রশ্ন। বাথরুমে ঢোকা এবং বের হওয়া, এটা তো লাগবেই। শুধু সুন্নত মোতাবেক করলেই হল। আর সুন্নত মোতাবেক করতে বাড়তি কোনও কষ্ট নেই। বরং আরো নিরাপত্তা হয়। যদি সুন্নত মোতাবেক আমল করা হয়, তাহলে নিরাপত্তা হবে। কারণ অনেক সময় বাথরুমে যখন ঢোকে আর বের হয়, তখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। অনেকেরই হাত পা ভাঙ্গে। কিন্তু যদি সুন্নত মোতাবেক পরে, তাহলে সহজে অ্যাকসিডেন্ট হবে না কিংবা খুব কম হবে। কারণ সুন্নতের উপর আমল হলে কাজ ধীরস্থির হবে। ওখানে সে ডানপায়ে আগে জুতা পরছে, পরে সে ঢুকেনি, তারপর বাম পা দিয়ে ঢুকেছে, তাহলে ঢোকাটা ধীরস্থিরভাবে হল। অ্যাকসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা কম। আর সুন্নতের উপর আমল না হলে তো কোনও খবর নেই, কোনও ধীরস্থিরতা নেই। তাড়াহুড়ো করবে আর মরবে। সুন্নতের উপর আমল করলে নিরাপত্তাও লাভ হয় আবার একদম মাগনা ছাওয়াব। যদি আমরা হিসাব করি, প্রত্যেকদিন আমরা হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ নেকী নষ্ট করছি যা ঘরে বসেই আমরা কামাই করতে পারতাম। চুল সবাই আঁচড়ায়। দাঁড়ি সবাই আঁচড়ায়। তা ডানদিক থেকে শুরু করলে দশ নেকী। আর যদি সুন্নতের দিকে লক্ষ না রাখে তাহলে এ নেকী থেকে সে বঞ্চিত হবে। মোটকথা ঘরে বসে এভাবে নেকী কামাই করার ব্যবস্থা অনেক।

## পানাহারে নেকী লাভ

খাবার আমরা সবাই খাই। ডান হাতে পানি খাওয়া, খানা খাওয়া সুন্নত। রোজ তিনবার তো আমরা সবাই খাই। এ তিনের বাইরেও অনেকবার খাওয়া হয়। নাস্তা খাওয়া হয়। পাঁচবার যদি খাবার খাওয়া হয়, ডান হাত দিয়ে খেলে দশ নেকী। এভাবে পাঁচবারে পঞ্চাশ নেকী। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলি। দশ নেকী। এভাবে পঞ্চাশ নেকী। খাওয়া শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলি। দশ নেকী। তাহলে খাওয়ার শুরতে বিসমিল্লাহ আর শেষে আলহামদুলিল্লাহ, এভাবে যদি রোজ পাঁচবার করে দশবার হয়, তাহলে এখানেই একশ নেকী।

পানি রোজ কতবার পান করি! ডান হাতে পান করব সুন্নতের নিয়তে, দশ নেকী। বিসমিল্লাহ বলে পান করব, আবার দশ নেকী। তিন শ্বাসে পান করব আবারও দশ নেকী। পান করা শেষে আলহামদুলিল্লাহ বললাম এবারও দশ নেকী। তো একবার পানি পান করব আর এভাবে দশ দশ করে মোট চল্লিশ নেকী। পানি তো পান করিই। কিন্তু যদি তা করি সুন্নত মোতাবেক, তবে তৃষ্ণা নিবারণ হল, সঙ্গে নেকীও পেলাম। তাও চল্লিশ নেকী। যদি রোজ পাঁচ-দশবার এভাবে পানি পান করি, তাহলে কত নেকী কামাই হবে? প্রত্যেকদিন কত? মাসে কত? বছরে কত? এত নেকী যে, হিসাব করে শেষ করা যাবে না।

## পোশাক পরায় যত নেকী

সকলকেই জামা পরতে হয়। গেঞ্জি গায়ে দিতে হয়। সকলকেই জামা গেঞ্জি খুলতে হয়। যখনই জামা গায়ে দেব, বিসমিল্লাহ বলে গায়ে দেব। জামা পরার দুআ আছে, সেটা মুখস্থ করে নেব। আর দুআ না পারলে বিসমিল্লাহ বললেই যথেষ্ট। এরপর আগে ডান হাতায় হাত ঢোকাব। তখন বিসমিল্লাহ বলে পরব, এতে দশ নেকী। আবার ডান হাতায় আগে হাত ঢোকালাম, তো এখানেও দশ নেকী। এভাবে জামা পরায় ত্রিশ নেকী। আর দুআ জানলে চল্লিশ নেকী। আবার জামা খোলার সময়

তা খুলব জামা পরার বিপরীত নিয়মে। জামার সঙ্গে গেঞ্জি গায়ে দিই। গেঞ্জিতে ওই একই কাজ করব। জামায় যেমন নেকী পাব, গেঞ্জিতেও সমান নেকী। আবার যদি পাজামা পরি, তাহলেও একই কাজ। আগে ডান পা ঢোকাব, তারপর বাম পা। সেখানেও এমন নেকী পাব। খোলার সময় এর বিপরীত করব। তাহলে পোশাকও পরা হচ্ছে আর সেইসাথে নেকীও কামাই করা হচ্ছে। একদম বিনা পরিশ্রমে। কারণ এ কাজগুলো তো আমরা সবাই করবই। সবাই করি। যদি সুন্নত মোতাবেক করি তাহলে দুনিয়ার কাজও হল, নেকীও হল।

## ঘুমানোতে যত নেকী

আমাদের সবারই তো ঘুমানো লাগে। বিনা ঘুমে কেউ থাকি না। যদি ঘুমানোর সময় ওযু করে ঘুমাই, তাহলে দশ নেকী পেলাম। ঘুমের দুআ পড়ব–

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হে আল্লাহ! তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

আরো দশ নেকী হল। ডান কাতে ঘুমাব। আবার দশ নেকী পাব। এই মোট ত্রিশ নেকী হল। ঘুমালাম আবার ত্রিশ নেকীও পেয়ে গেলাম। ঘুমের সময় আরো অনেক আমল আছে। ঘুমের সময় এত আমল আছে যে, হাজারে হাজারে নেকী কামাই করা যাবে। নেকী আর নেকী, যদি ঘুমের সময় আমরা ওই আমলগুলো করি। আমার একটা বই আছে– 'মুমিনের ঘুম' নামে। এ বইটা যদি আমরা সবাই সংগ্রহ করে নিই, তাহলে ঘুমের সময় আমরা হাজারে হাজারে নেকী কামাই করতে পারব। কারণ তাতে আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে ঘুমাতেন আর কী করে ঘুম থেকে জাগতেন। তিনি যে তরীকায় জাগতেন আমরা যদি ওই তরীকায় জাগি, তাহলে ঘুমানোর সময়ও ছাওয়াব পাব আবার ঘুম ভাঙলেও ছাওয়াব পাব। হাজারে হাজারে নেকী আদায় হয়ে যাবে যদি আমরা ঘুমের সুন্নতগুলোর উপর আমল করতে পারি। আবার যদি ঘুমের ভেতর কেউ মারা যাই এ

অবস্থায় যে, মৃত্যুর আগে ঘুমের আমলগুলো আমার দ্বারা হয়েছে, তাহলে তো সোজা বেহেশত।

ঘুমের একটা দুআ আছে–

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হে আল্লাহ! তোমার নামে মরি ও বাঁচি।[১৬১]

এই দুআ পড়ে যদি কেউ ঘুমায় আর এ ঘুমের মধ্যেই সে মরে যায়, তাহলে তার ঈমান নিয়ে মৃত্যু হল। ফলে একদম সোজা বেহেশতে চলে যাবে।

কষ্ট না করে এভাবে ছাওয়াব কামাই করা যায়। যেমন, আমরা ভুলে গেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল– সালাম। সালাম দেওয়া ভুলে গেছি। মুসলমানদের ঘরে সালাম দেওয়ার রেওয়াজ নেই। বাড়িতে গিয়ে বাবা-মায়ের কদমবুসি না করলে সমস্যা হয়। কেউ তো পায়ে হাত দেওয়াকে সালাম বানিয়ে নিয়েছে। না, বরং সালাম হল আসসালামু আলাইকুম। পায়ে হাত দিয়ে সালামটাকে কদমবুসি বলে। ইসলামের তরীকা এটা না। অথচ এটা না করলে বাবা-মা নারাজ হয়। ছেলে সালাম দিল না, তাতে নারাজি নেই। পায়ে হাত কেন দিল না, সেজন্য নারাজ। দেখেন অবস্থা। ইসলামের তরীকা অনুযায়ী সে কাজ করল না, তাতে রাগ নেই। আর হিন্দু তরীকা অনুযায়ী কাজ কেন করল না, সেজন্য রাগ। মুসলমান বাবা-মা চায় সন্তানেরা তাদের সঙ্গে হিন্দুদের মতো আচরণ করুক। মুসলমানের মতো করুক তা চায় না। হাদীছে আছে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে, সে তাদের একজন।[১৬২]

আমাদের অধঃপতন কি এমনিই হয়েছে? ঘরে শান্তি নেই। নেই কেন? নেই তো এজন্য যে, আসসালামু আলাইকুম এর রেওয়াজ নেই। ঘরে যখন ঢুকবে তখন বলবে– আসসালামু আলাইকুম। ব্যস, দশ নেকী

---

১৬১. সহীহ বুখারী : ৬৩১৪

১৬২. সুনানে আবু দাউদ : ৪০৩১

হয়ে গেল। সঙ্গে যদি বলে 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ,' তাহলে বিশ নেকী। 'ওয়া বারাকাতুহু' বললে ত্রিশ নেকী। জবাব দিলে নেকী। ছেলেমেয়ে বাবার বা মায়ের রুমে যাবে। যখন ঢুকবে, সালাম দিয়ে ঢুকবে। অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। বাবা যদি ছেলেমেয়ের ঘরে যায়, সালাম দিতে হয়। প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হয়। বাবা কিংবা মা যদি ছেলে বা মেয়ের রুমে ঢুকে, তাহলে আগে অনুমতি নিতে হয়। সালামটাই অনুমতি। বিনা অনুমতিতে ঢুকবে না, এটা নিষেধ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট নিষেধ। সালাম দিলেই অনুমতি নেওয়া হয়। সালাম দিয়ে ঢুকবে। অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। কতবার বাবা-মা'র রুমে যাওয়া হয়? যতবার বাবা-মা ছেলে মেয়ের রুমে যায়, প্রত্যেকবার যদি আসসালামু আলাইকুম বলে অনুমতি নিয়ে ঢোকে, তাহলে দশ নেকী হতে থাকবে। যতবার যাবে ততবারই দশ নেকী পাবে।

السَّلامُ عَلَيكُم

তোমাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক

এটা একটা দুআ। ঘরে যদি বারবার এ দুআ হতে থাকে, ছেলে বলল বাবাকে السَّلامُ عَلَيكُم, বাবা বলল ছেলেকে السَّلامُ عَلَيكُم, মা বলল ছেলেমেয়েকে السَّلامُ عَلَيكُم, ছেলেমেয়ে বলল বাবামাকে السَّلامُ عَلَيكُم, তাহলে কত নেকী কামাই হবে এবং কত রহমত ও শান্তি এ ঘরে হবে! আমাদের ঘরগুলোতে শান্তি নেই, রহমত নেই। নেই তো এজন্য যে, সালামের রেওয়াজ নেই। সালামের রেওয়াজ হলেই রহমত আর শান্তির দুআ হয়। দুআ করলে আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা

আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৬৩]

তোমরা দুআ করো, আমি কবুল করব। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি সাড়া দেব। আমার কাছে দুআ করো, আমি কবুল করব। ঘরে ছেলেমেয়ে, বাবা-মা সবাই মিলে যদি বলে– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, শান্তি ও রহমত হোক তোমাদের প্রতি, তবে এটা তো দুআ হলো। যদি বারবার বলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শান্তি ও রহমত বর্ষণ করবেন। সে ঘরে অশান্তি থাকবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই আছে। বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। শান্তি নেই। সালাম দিলে এসব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও শান্তি আর আখিরাতেও শান্তি। দুনিয়ার অশান্তি দূর হবে, শান্তি পাওয়া যাবে। আর যত নেকী হবে, আখিরাতে তত শান্তি। আমরা ভুলে গেছি ইসলামের আদাব-কায়দা। সন্তানকে এগুলো শেখানো মূলত মায়ের কাজ।

## ছেলে-মেয়েকে জীবনাচারের আদাব শেখাবে কে?

প্রত্যেক মায়ের কাজ তার ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই শেখাবে– ডান হাতে খাও, নেকী পাবে। পানি যখন পান করছে, তখন বলবে– বাবা! ডান হাতে পান করো, দশ নেকী পাবে। বিসমিল্লাহ বলে পান করো, দশটা ছাওয়াব হবে। পান করা শেষ হলে বলবে, বাবা! বলো– আলহামদুলিল্লাহ, দশ নেকী পাবে। এক টান দিয়ে এক গ্লাস পানি পান করে ফেলেছে, তাকে শেখাতে হবে– এভাবে না, ধীরে ধীরে খাও, তিন শ্বাসে খাও, নেকী পাবে। মা তার ছেলেমেয়েকে শেখাবে। তারা শেখাবে কোত্থেকে? আমাদের মায়েরাই তো এসব জানে না। আমাদের মায়েদেরই খবর নেই। মাকে আদাব-কদমবুসি না করলে মা নাখোশ

---

১৬৩. সূরা মুমিন : ৬০

হয় কিন্তু আসসালামু আলাইকুম না বললে নাখোশ হয় না। কারণ সে জানে না। পুরুষদের উচিত তাদেরকে এসব শোনো। মা-বোনদের শেখাতে হবে। তাহলে তারাও তাদের সন্তানদের শেখাবে। শৈশব থেকেই মা তার শিশুদেরকে আদাব-কায়দা শেখাবে। ফলে যত বড় হবে, এ শিশু তত আদাবওয়ালা হবে। ছেলেমেয়ে বেয়াদব। কেন বেয়াদব? মা শেখায়নি। ডান হাতে খাওয়া শেখায়নি। খাওয়ার ক্ষেত্রে বেয়াদবি করছে। ডান হাতে পান করা শেখায়নি। বাবাকে মাকে সালাম দেয় না। বেয়াদবি করছে। সুন্নত মোতাবেক ঘুমায় না। ঘুমের ক্ষেত্রে বেয়াদবি করছে। আমরা বেয়াদব বলি কারো সঙ্গে কঠোর রুক্ষ ব্যবহার করলে। তাও বেয়াদবি বটে, কিন্তু এগুলোও তো বেয়াদবি। ঘুমের আদাব, বাথরুমের আদাব, খাওয়া-দাওয়ার আদাব, কথাবার্তার আদাব, মজলিসের আদাব, সবকিছুরই তো আদাব আছে। এগুলো না করলে বেয়াদবি হল। জীবনের সমস্ত কাজে আদাব কায়দা আছে। আর এটাই সুন্দর। এর চেয়ে সুন্দর জগতে আর কোন কিছু নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শিক্ষা দিয়েছেন, তারচেয়ে সুন্দর জগতে আর কিছু নেই।

## দুনিয়ার কাজ দ্বারাও আখিরাত কামাই

আজকাল বাঙ্গালী সংস্কৃতির কথা শোনা যায়। মানুষের তৈরি করা সংস্কৃতি। তাতে বহু গোঁজামিল। ইসলামী সংস্কৃতির উপরে জগতে আর কিছু নেই। ইসলামী সংস্কৃতির উপর আমল করলে দুনিয়াতেও শান্তি আখিরাতেও লাভ। প্রত্যেকদিন হাজার হাজার নেকী তোমার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। হাশরের ময়দানে যখন আমলনামা খোলা হবে, তখন হয়রান হয়ে যাবে। এত নেকী কোত্থেকে আসল? আসলে নেকী কী, তা তো চিন্তা করা হয়নি। আমরা নেকী বলতে তো মনে করি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে পড়া। কোন সন্দেহ নেই এতে যে, এটাই সবচে' বড় নেকী। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যে সবচে' বড় নেকী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে গাফলতি করার কোনও সুযোগ নেই। পুরুষ-নারী সবারই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত

পড়া সবচে' বড় নেকী। মহিলার জন্য হুকুম ঘরে পড়া আর পুরুষদের জন্য কর্তব্য হল মসজিদে এসে পড়া। কিন্তু নামায পড়াটাই শেষ নয়। বরং জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে নেকী আছে। জীবনে আমরা যত কাজ করি, সমস্ত কাজই যদি আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত মোতাবেক করি, তাহলে তাতেই নেকী। প্রত্যেকে কাজেই দশ দশ নেকী। দশ তো বললাম, একদম কম সংখ্যা। কেবল পানি পান করলেই তো ত্রিশ-চল্লিশ নেকী। আর সবচে বড় কথা– এসবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল হয়। এক হাদীছে আছে–

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

> আল্লাহ ওই বান্দার উপর রাজি খুশি হয়ে যায়, যে সামান্য কিছু খাবার খায় আর সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ বলে অথবা একটু পানি পান করে আর সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ বলে।[১৬৪]

কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে খায় আর খাওয়া শেষে বলে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তার উপর খুশি হয়ে যান। আল্লাহ যদি আমার উপর রাজি হয়ে যান, সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে আমার আর কী দরকার আছে? খাওয়াও হল, পেটও ভরল, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টিও পেয়ে গেলাম। কাজ দুনিয়ার, কিন্তু এর ভেতর দিয়ে পেলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইসলাম এক মহান ধর্ম। এর মতো ধর্ম আর কী হতে পারে? এ ধর্ম বলে– দুনিয়ার কাজগুলোও যদি তুমি সুন্নত মোতাবেক কর তাহলে আখিরাতের কাজ হয়ে যাবে।

আর অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা হল এই– তুমি যদি পুণ্য অর্জন করতে চাও, তাহলে দুনিয়া ছাড়ো। সন্নাসী হয়ে যাও, বৈরাগী হয়ে যাও। ইসলাম বলে, বৈরাগী হয়ো না। বৈরাগী হওয়া গুনাহ। দুনিয়ার কাজ করো, তবে সুন্নত মোতাবেক করো। তোমার দুনিয়ার কাজও হয়ে গেল,

---

১৬৪. সহীহ মুসলিম : ২৭৩৪

আবার কবরে শান্তির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। হাশরের ময়দানে আরশের ছায়াতলে জায়গা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এরপর আবার বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে এ সহজ সহজ নেকীগুলো কামাই করার প্রতি মনোযোগ দান করুন। শুধু একটু মনোযোগ দরকার। যখন যে কাজ করি, সে কাজ একটু লক্ষ করা যে, এ কাজের সুন্নত তরীকা কী।

## মা-বোনদের জন্য সহজে নেকী অর্জন

আমাদের মা-বোনদের জন্য কত আসান নেকী কামাই করা। কিছু কিছু কাজ আছে তারা তো করেন। রান্নাবান্না করে। তরকারি তারাই কাটে। পেয়াজ কাটে আর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। কত কষ্ট! কিন্তু যদি বিসমিল্লাহ বলে পেয়াজ কাটে, তাহলে কেবল চোখের পানিই পড়ল না; নেকীও কামাই হয়ে গেল। যখনই তরকারি কাটে, পেয়াজ কাটে কিংবা রান্না করে তখনই যদি ডান হাতে করে, বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে নেকী কামাই হতে থাকবে। যখনই সে ধোওয়ার জন্য চাল বের করে, বিসমিল্লাহ বলে চাল মাপবে। দশ নেকী পাবে। এরপর যখন তা ধোওয়ার জন্য ট্যাপ ছাড়বে তখনও বলবে– বিসমিল্লাহ! আরো দশ নেকী পাবে। চুলায় আগুন জ্বালানোর সময় বলবে– বিসমিল্লাহ। এবারও দশ নেকী পাবে। মোট ত্রিশ নেকী হয়ে গেল। চুলায় যখন পাতিলটা বসাবে তখনও বলবে– বিসমিল্লাহ। নেকীর পরিমাণ বেড়ে চল্লিশ নেকী। এগুলো কি আমার বানানো কথা? এখানে আলেম-উলামা আছেন। আমি ভুল বললে তারা বলে দেবেন। একটাও আমি মিছে কথা বলছি না আলহামদুলিল্লাহ। পাতিল বসিয়ে দিয়ে আসল, এরপর কিছুক্ষণ পর গিয়ে আবার একটু নাড়া দিল আর বলল বিসমিল্লাহ। আবার দশ নেকী পেল। রান্না হয়ে গেল তার মনমতো। এবার সে বলুক আলহামদুলিল্লাহ। আবার দশ নেকী।

মেয়েদের জন্য নেকী কামাই করা বড় আসান। কারণ এ সবগুলো কাজ তো সে করছেই। এরপর আবার পরিবেশনের দায়িত্বও তার। আমরা

পুরুষরা তো সব বেকার। স্ত্রী বা মা রান্না করে দিল, এখন সে একটু পরিবেশন করবে, এতটুকু শক্তিও তার গায়ে নেই। তার বলা উচিত ছিল– আহা! তুমি কষ্ট করে রান্না করেছ। পরিবেশনটা আমি করি। কিন্তু এটা করবে না। বসে বসে অপেক্ষা করে কখন স্ত্রী বা মা পরিবেশন করবে আর সে খাবে। এই যে পরিবেশন করছে এটা তো খেদমত। এতে সে ছাওয়াব পাচ্ছে। যদি এ কথাটা মনের মধ্যে রাখে– আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের খেদমত করছি। আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। যদি মনে করে– আমি দাসীগিরি করছি, তবে কষ্ট করেও ছাওয়াব পেল না। এরকম আছে। স্বামীকে বলে– আমি তো তোমার ঘরে দাসীগিরি করি। কিন্তু তার মনের মধ্যে যদি থাকত– কষ্ট হোক আমার, আমি সবার সেবা করছি, আমি তো এর ছাওয়াব পাব; তাহলে তো কত নেকী তার কামাই হতে পারত।

মোটকথা যখনই পরিবেশন করে, ভাত বাড়ে, বলতে যেন ভুল না হয়– বিসমিল্লাহ। তরকারি বাড়ছে পেয়ালায় আর বলছে– বিসমিল্লাহ। সেখান থেকে আবার প্লেটে তুলছে, বলছে– বিসমিল্লাহ। তরকারি দিচ্ছে, বলছে– বিসমিল্লাহ। ডান হাতে দিচ্ছে এতেও দশ নেকী। তাহলে দেখুন কত নেকী সে রান্না করে পাচ্ছে, পরিবেশন করে পাচ্ছে। আবার এই যে খেদমতের নিয়ত করেছে, সেবার নিয়ত করেছে তার মাধ্যমেও নেকী পাচ্ছে। প্রত্যেকদিন শত শত; বরং হাজার হাজার নেকী হবে। একজন নারী ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত এরকমভাবে ঘরের সেবা করছে। এ ত্রিশ-চল্লিশ বছরে তার কত নেকী কামাই হবে, যদি এ তরীকায় করে? আল্লাহ তাআলা আমাদের মা বোনদের এ সমস্ত নেকী কামাই করার সুযোগ দান করুন এবং আমাদের পুরুষদেরকে এ সুমতিটা দান করুন, যাতে আমরা ঘরের নারীদেরকে সহীহ ইসলাম শেখাই আর সেইসঙ্গে তাদের শুকরিয়া আদায় করার মতো মানসিকতাও তৈরি হয়।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

এ দিয়ে তো আটজনের চলবে। মাত্র একজন ফকির এসেছে। কেন বিরক্ত হও? তুমি তো আরো তিনজনকে দিতে পারবে! একজন মেহমান এসেছে। কেন বিরক্ত হও? তুমি তো আরো চারজনকে খাওয়াতে পারবে। যদি চারজন এসে যায়, তাহলেও তো এর দ্বারাই চলবে। শোনো,

طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِيْ لِلإِثْنَيْنِ

একজনের খাবার দিয়ে দুইজনের চলে

তুমি কেন ধরে নিয়েছ যে, চারজনের রান্না হয়েছে, এটা আমরা চারজনই খাব, এতে আর কাউকে ভাগ বসাতে দেব না? এটাই তো বখিলি। এটাই তো কৃপণতা, যে কৃপণতার হাদীছ এতক্ষণ পড়া হল। এটাই কৃপণতা যে, তোমার খাবারে তুমি আরেকজনকে ভাগ বসাতে দেবে না। বরং তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো যে, তোমার দুয়ারে একজন ক্ষুধার্ত মানুষ এসে হাজির আর বলছে– মা! খাবার দাও। তুমি শুক্‌র আদায় কর যে, তোমার ঘরে খাবার আছে, ওই লোকের খাবার নেই। সে তোমার কাছে এসে খাবার চেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এ অবস্থাতে রেখেছেন যে, তোমার কাছে এক ক্ষুধার্ত এসে খাবার চাইতে পারে। তোমার তো শুক্‌র আদায়ের সুযোগ হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এমন এক অবস্থাতে রেখেছেন যে, আমি তাকে খাবার দিতে পারছি, সে আমার কাছে খাবার এসে চেয়েছে। অথচ এ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

## কে বড় দানবীর?

আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর রাযি. অনেক বড় দানবীর ছিলেন। অনেক বড় দাতা ছিলেন। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। এক বাগানে লক্ষ করে দেখলেন বাগানের মালী রুটি খাচ্ছে আর তার সামনে একটা কুকুর। সে ওই রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজে একবার খাচ্ছে, আরেকবার কুকুরকে দিচ্ছে। একবার নিজে খাচ্ছে, একবার কুকুরকে খাওয়াচ্ছে। দেখে উনি অবাক হলেন। এমনও কেউ করে নাকি? এক লোকমা নিজে

খায় আরেক লোকমা কুকুরকে দেয়! এ করে করে রুটিটা খেল। এরপর তিনি কাছে গিয়ে তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

আচ্ছা, আমি দেখলাম– রুটি ছিঁড়ে তুমি একটু খাচ্ছ, ওই কুকুরটাকে একটু খাওয়াচ্ছ। ব্যাপারটা কী বলো তো?

আমি খাচ্ছিলাম এমন সময় এ কুকুর এসে হাজির। সে ক্ষুধার্ত। আমার দিকে তাকাল। এক ক্ষুধার্ত জীবের চোখ আমার চোখে পড়ল। তখন আমার খুব লজ্জা লাগল। আমি খাব আর সে খাবে না তা কী করে হয়। এজন্য দুজনে ভাগাভাগি করে খেলাম। দেখুন কী বলছে– এক ক্ষুধার্তের চোখ আমার চোখে পড়েছে। তাকে না দিয়ে খাব আমার খুব লজ্জা লেগেছে।

জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কার গোলাম?

বলল, মুসআব ইবন যুবায়রের।

তো উনি মুসআব ইবন যুবায়র রহ.-কে গিয়ে ধরলেন। হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.-এর ছেলে মুসআব। বললেন, ভাই! আমি তোমার গোলামকে কিনতে চাই। বললেন, ঠিক আছে, কিনবে কী! আমি তোমাকে গোলামটা এমনিই দিয়ে দিলাম। কিন্তু তিনি কিনেই নিলেন। তারপর বাগানটাও কিনলেন। তারপর ফিরে এসে বললেন, আসওয়াদ! আমি তো তোমাকে কিনেছি।

আসওয়াদ বলল, আল্লাহ তাআলা এ কেনায় আপনাকে বরকত দান করুন।

আমি কিন্তু বাগানটাও কিনেছি।

এ বাগানেও আল্লাহ তাআলা আপনাকে বরকত দান করুন।

আসওয়াদ! আমি তোমাকে আযাদ করে দিলাম।

আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

আসওয়াদ! এ বাগানটা আমি তোমাকে হাদিয়া দিয়ে দিলাম।

আমি কবুল করলাম এবং আল্লাহ তাআলা আপনাকে জাযায়ে খায়র দান করুন।

এটা আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর রাযি.-এর ঘটনা। কেমন দানশীল ছিলেন! হাজার হাজার দিরহাম মূল্যের সম্পদ কতক্ষণের মধ্যে আল্লাহর পথে দিয়ে দিলেন। ব্যস, ওই গোলাম স্বাধীন হয়ে গেল আর বাগানের মালিকও হয়ে গেল। তারপর কী ঘটল লক্ষ করুন।

আসওয়াদ এবার তাকে বলল, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এ বাগানটা আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিলাম।

আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর স্তম্ভিত। তিনি ভীষণ নাড়া খেলেন। তারপর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন আর নিজেকে বলছেন– আব্দুল্লাহ! তুমি খুব দানশীল, না! তুমি মনে করে থাক যে, তুমি অনেক বড় দানশীল! সত্যিকারের দানশীল তো এই আসওয়াদ।[১৫৪] তুমি সারা জীবনে অনেক দান করেছ বটে, তবে তোমার সর্বস্ব দান করনি। আর এ গোলাম আজকে মাত্র আজাদ হল। জীবনে কোনওদিন মালিকানা কী জিনিস তা বোঝেনি। কারণ গোলাম তো নিজেই নিজের মালিক নয়। সে মালের মালিক কী করে হবে? আজকেই সে প্রথম কিছুর মালিক হল। এইমাত্র এত মূল্যবান বাগানের মালিক হল। আর দেখো, এ মালিকানাটা সে একদিনও ভোগ করল না। মালিকানা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সে এটাকে আল্লাহর পথে খরচ করল। এ হল আল্লাহর পথে দান।

## কারো কাছে কিছু চাওয়া প্রকারান্তরে তাকে মর্যাদা দেওয়া

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাযি. বলেন, যখন কেউ আমার কাছে এসে কিছু চায়, তখন আমি মনে করি– আমি তার ইচ্ছা পূরণ করে তার যা উপকার করি, ওই লোক আমার কাছে চেয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার আমাকে করল। কেউ যখন আমার কাছে চায় এবং আমি তাকে দিই, এ দেওয়ার দ্বারা আমি তার যা উপকার করলাম, তারচে'

১৫৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইবরাহীম আল-হারবীর জীবনী দ্রষ্টব্য।

সে যে আমার কাছে চাইল এর মাধ্যমে সে আমাকে আরো অনেক বেশি কিছু দিল। কারণ–

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উৎকৃষ্ট।[১৫৫]

সে আমার কাছে আসলো, আমার কাছে চাইল, আর আমার হাতকে উপরে রাখার সুযোগ করে দিল। সে যদি না চাইত তাহলে আমার হাত উপরে রাখতে পারতাম না। এভাবে সে তো আমাকে বেশি দিলো। সে আমার কাছ থেকে নিল, তাই তার হাত নীচে। আর আমি দিলাম, তাই আমার হাত উপরে। আমাকে এ সুযোগ করে দিয়ে সে তো আমার চেয়ে বেশি দিল। দৃষ্টিভঙ্গি দেখুন! আমাদের মন খারাপ হয়ে যায় কেউ আসলে। দিতে চাই না। অথচ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে, তারা দিতে পারাকে নিজের সৌভাগ্য গণ্য করতেন। এ ক্ষেত্রেও আরো অনেক মূল্যবান শিক্ষা আছে।

ইয়াস ইবন মুআবিয়া রহ.-এর ঘটনা সম্ভবত। যে-কেউ তার কাছে এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে বলতেন- লিখে দাও। আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিলেন– আমার কাছে কারো কিছু চাওয়ার হলে মুখে চাইবে না, লিখে দিবে। কারণ মুখে চাইলে তোমার ইজ্জত নষ্ট হল। মানুষের ইজ্জত অনেক মূল্যবান জিনিস। তুমি চেয়ে সেই ইজ্জত কেন নষ্ট করবে? তোমার এ মুখ মানুষের কাছে চাওয়ার জন্য নয়। কাজেই মুখে কিছু চাবে না। তোমার যা দরকার তা একটা চিরকুটে লিখে দিয়ো। মুখে চাইতে হবে না।

## মেহমান আসলে মন খারাপ করো না

বলছিলাম- ঘরে যখন খাবার রান্না হয় আর এ অবস্থায় মেহমান আসে, তবে কোনও দিন মন খারাপ করতে নেই। বরং শুক্‌র আদায় করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তার ঘরে মেহমান পাঠিয়েছেন। আল্লাহ

১৫৫. সহীহ বুখারী : ১৪২৭, ১৪২৯

তাআলা তার দরজায় এক ক্ষুধার্তকে হাজির করছেন। আর সে ক্ষুধার্তকে কিছু খাওয়ানোর সুযোগ, তাওফিক আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন। শুক্‌র আদায় করা দরকার। এতে ঘরের খাবারে টান পড়বে না। বরং সুন্দর একটা কথা আছে– মেহমান যদি কারো ঘরে খায়, তাহলে সেই ঘরে বরকত নাযিল হয়। আর যে খায় সে তো তার খাবারই খায়। একজন আরেকজনেরটা খায় না। একজনের রিযিক আরেকজন খেতে পারে না। তোমার ঘরে এসে যদি কোনও মেহমান খায়, তাহলে তো তোমার লাভ। লাভ এই– সে তো খেল তার খাবারই, তোমার খাবার খায়নি। তার রিযিক খেয়েছে। তোমার দস্তরখানে কিন্তু খেয়েছে। এতে লাভ হল এই যে, তোমার ঘরে বরকত নাযিল হল। মেহমানের অসিলায় তুমিও বরকত পেলে। সাথে দুনিয়ার সুনাম তো আছেই। যদিও তুমি সুনামের জন্য করবে না, কিন্তু সুনাম তো হয়ই। কারো ঘরে যদি মেহমান খায়, তাহলে অতিথিপরায়ণ ও মেহমাননাওয়াজ হিসেবে তার সুনাম হয়ে যায়। আর সেসঙ্গে বরকত হয়। আখিরাতে যে ছাওয়াব তা তো পাবেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْ اٰخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

যে আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।[১৫৬]

অতিথি আসলে তাকে সম্মান করো। বিরক্ত কেন হও? হাসিমুখে তাকে গ্রহণ করে নাও। ইজ্জতের সঙ্গে তাকে বসাও। নিজ হাতে তাকে সেবা করো। ঘরে যে খাবার আছে সে খাবার তার সামনে পেশ করো। ভয় করো না। হাদীছে এসেছে–

طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِيْ لِلإِثْنَيْنِ

একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

যে হাদীছগুলো পড়া হল, সে হাদীছগুলোর উপর আমল করার তাওফিক আল্লাহ তাআলা দান করুন। ব্যস, আমার পকেটে যা আছে,

---

১৫৬. সহীহ বুখারী : ৬১৩৭

আমার কাছে যা আছে, আমি তাই আল্লাহর পথে খরচ করব। ধনী হওয়ার অপেক্ষা নয়; বরং আমার কাছে যা আছে তা দ্বারাই পুণ্য অর্জন করব, নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। কেননা হাদীছে জানানো হয়েছে, দান-খয়রাত দ্বারা জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানো যায়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুকুম দিয়েছেন–

اِتَّقُوْا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

একটা খেজুরের অর্ধেক দিয়ে হলেও নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

আমি জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# সহজে নেকী অর্জনের উপায়

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

গত মঙ্গলবারে আমাদের আলোচনায় এ কথা এসেছিল যে, দুনিয়া অল্পদিনের। এরপর কবর আর তারপর হাশর। তারপর জান্নাত বা জাহান্নাম। কবর অনেক লম্বা দিনের। দুনিয়ার চেয়েও অনেক বেশি দিন কবরে থাকতে হবে। হাশরের ময়দানও দুনিয়ার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। তারপর জান্নাত ও জাহান্নাম তো অনন্তকালের, কোনও শেষ নেই। দুনিয়া যখন অল্পদিনের আর ওই তিনটা জায়গা যেহেতু অনেক লম্বা, তাই আমার মূল চেষ্টা তো হওয়া উচিত এই যে, ওই তিন জায়গায় কীভাবে শান্তি হবে, কবরে কীভাবে শান্তি পাব, হাশরের ময়দানে কীভাবে আল্লাহর আরশের ছায়ায় জায়গা পাব, তারপর বিচার শেষে, যাতে জাহান্নামে না যাই; বরং জান্নাতে যেতে পারি। সমস্ত

মুমিনের চিন্তা তো এটাই হবে। কাজেই সে দুনিয়া নিয়ে বিভোর, দুনিয়ার স্বপ্নে মত্ত কীভাবে থাকতে পারে?

তার কাজ হবে আখিরাতের জন্য কামাই করা। দুনিয়ায় যা আছে সবই আখিরাতের কাজে ব্যয় করা। টাকা থাকলে সে টাকা ব্যবহার করবে আখিরাতের কাজে। গায়ের শক্তি ব্যবহার করবে আখিরাতের কাজে। তার বিদ্যা বুদ্ধি সবই সে খরচ করবে আখিরাত কামাই করার জন্য। আমরা দুনিয়ার টাকা-পয়সা কামাই করি। মনে করি, যত টাকা হবে তত শান্তি পাব। এখন যুবক বয়সে যত কামাই করব, বৃদ্ধ বয়সে তত শান্তি পাব। যারা বিদেশে আছে, তারা সেখানে অনেক কষ্ট-মেহনত করে উপার্জন করে সে টাকা দেশে পাঠায়। সে ভাবে, দেশে যত টাকা জমা হবে, ততই তার ভবিষ্যতে শান্তি হবে। মনে করে, বেশি টাকা হলে দুনিয়ার ভবিষ্যত জীবনে আরাম হবে, শান্তি হবে। ওই রকম আমাদের কবর আছে, হাশর আছে তারপর জান্নাত। সে তিন জায়গায় শান্তি তো আমরা পাব তখনই, যখন ওইখানকার টাকা-পয়সা আমরা বেশি কামাই করব। অর্থাৎ আখিরাতের টাকা। আর আখিরাতের টাকা হল নেকী, ছাওয়াব। যার যত বেশি ছাওয়াব হবে, যে যত বেশি পুণ্য-নেকী কামাই করতে পারবে, আখিরাতে শান্তি, কবরে শান্তি এবং হাশরের ময়দানে আরাম সে তত বেশি পাবে। পাপের চেয়ে যার পুণ্য বেশি হবে, গুনাহের চেয়ে যার নেকী বেশি হবে, সে কবরে-হাশরে সব জায়গায় শান্তি পাবে। তাই আমাদের সকলের ধ্যান-জ্ঞান ও চেষ্টা মেহনত এটাই হওয়া উচিত যে, কীভাবে বেশি বেশি নেকী কামাই করা যায়।

আমরা বড় অবহেলা করি। বড় গাফলতি করি নেকীর ব্যাপারে। ভবিষ্যত জীবনের টাকা-পয়সা নিয়ে তো আমাদের মাথা ব্যথা আছে, চিন্তা-ফিকির আছে এবং আছে চেষ্টা-মেহনত। কিন্তু আসল ভবিষ্যত আখিরাত। সে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমাদের চরম অবহেলা। নেহাত গাফলতির ভেতরে আমরা সময় নষ্ট করছি। অথচ আখিরাতের নেকী, আখিরাতের টাকা কামাই করা খুব সহজ। অতি সহজে, অতি আসানিতে বিপুল পরিমাণ আখিরাতের কামাই হতে পারে। একটু লক্ষ করলেই, একটু নজর দিলেই হয়ে যায়। যেহেতু আখিরাত নিয়ে

আমাদের কোনও ধান্দা নেই, তাই সহজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা নেকী কামাই করছি না। সাহাবায়ে কেরাম সবসময় নেকীর চিন্তা করতেন। তাদের ধান্দা ছিল আখিরাত। ফিকির ছিল একটাই– কবরে কী করে শান্তি হবে, হাশরের ময়দানে কীভাবে আল্লাহ তাআলার আরশের ছায়ায় জায়গা পাওয়া যাবে এবং সবশেষে কত সহজে জান্নাত লাভ করা যাবে। এটাই ছিল তাদের চেষ্টা। কীভাবে ছাওয়াব কামাই করা যায়, সে চিন্তা তাদের সবসময় থাকত।

## হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর বাজারে যাওয়া

বাজার সবচে' খারাপ জায়গা, সেটা আমরা সবাই জানি। বাজার সবচে' খারাপ জায়গা। সাহাবায়ে কেরাম সে বাজারে যেতেন নেকী কামাই করার জন্য। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর ঘটনা আছে। তিনি তার এক ছাত্রকে নিয়ে রোজ বাজারে যেতেন। ওই ছাত্র সকাল বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেত আর তিনি ওই ছাত্রকে নিয়ে বাজারে যেতেন। কিন্তু কিছুই কেনাকাটা করতেন না। বাজারে সবাই মালামাল কিনতে যায়, কিন্তু তিনি রোজ বাজারে যাচ্ছেন, অথচ কিছুই কিনছেন না। একদিন ওই ছাত্র ভোরবেলা তার কাছে গেলে তিনি বললেন– চলো বাজারে যাই। ওই ছাত্র বলল, হযরত! আপনি কেন বাজারে যান? আপনাকে কোনওদিন দেখলাম না বাজার থেকে কিছু কিনতে। বাজারে যান, কিছুক্ষণ থাকেন আর চলে আসেন। কোনও কিছু কিনতে কখনোই দেখি না। শুধু শুধু কেন বাজারে যাওয়া? বসুন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে যে সমস্ত হাদীছ শুনেছেন, আমাদেরকে তা শোনান। সময়টা কাজে লাগল। আপনি হাদীছ বলেন, আমি শুনি। আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বললেন– ওহে পেটুক! (ওই ছাত্রের পেট বড় ছিল) তুমি মনে করছ বাজারে কেনাকাটা করতেই যাই। আমি তো বাজারে যাই–

مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ

অর্থাৎ সালামের জন্য।[১৫৭]

---

১৫৭. মুওয়াত্তা মালিক, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ২/৯৬১

আসসালামু আলাইকুম বললে দশ নেকী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বললে বিশ নেকী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বললে ত্রিশ নেকী। আমি বাজারে যাই আর যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকেই বলি– আসসালামু আলাইকুম। অথবা সে আমাকে সালাম দেয়। আমি জবাব দিই। বাজারে যাই নেকী কামাই করতে। আমরা বাজারে যাই মাল কিনতে, আর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি. বাজারে যেতেন নেকী কিনতে। যেহেতু তাদের চিন্তাই ছিল আখিরাত, ফিকির ছিল আখিরাত, তাই বাজার খারাপ জায়গা হওয়া সত্ত্বেও সেখানেও নেকী খুঁজতেন। কোনওভাবে যদি নেকী ছুটে যেত, আফসোস করতেন। আক্ষেপ করতেন। আমাদের টাকাপয়সা কম হলে আক্ষেপ করি। আর তাদের যদি কোনও কারণে নেকী কামাই কম হত, কোনও এক নেকীর কাজ ছুটে যেত, আক্ষেপ করতেন।

## কত কত কীরাত নেকীই না হারালাম!

আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর আরেক ঘটনা। একবার হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. হাদীছ বললেন– 'যে ব্যক্তি কারো জানাযায় শরীক হয় তার এক কীরাত নেকী কামাই হয়।' এক কীরাত বলতে উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ বোঝায়। যারা হজ্জে গিয়েছেন, উমরায় গিয়েছেন, তারা উহুদ পাহাড় দেখেছেন। পাহাড় তো এমনিতেই বড়। আর মদীনা মুনাওয়ারায় উহুদ পাহাড় সবচে' বড়। বিশাল পাহাড়। যদি কেউ কারো জানাযায় শরীক হয়, তাহলে তার এক কীরাত নেকী কামাই হয়। তার মানে এই পরিমাণ নেকী কামাই হয়, যা উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাযার পর কবরে দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকে, তার দুই কীরাত নেকী কামাই হয়। মানে দুই উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ তার নেকী কামাই হয়। এ হাদীছ বললেন কে? আবূ হুরায়রা রাযি.। শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর আশ্চর্য লাগল। একটু বেশি বলে ফেলল কিনা! আবূ হুরায়রা রাযি.-এর ভুল হয়ে গেল কিনা! তাই তিনি মাসআলা তাহকীক করার জন্য গেলেন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর কাছে। আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. অনেক বড়

পণ্ডিত ছিলেন। অনেক জ্ঞানী ছিলেন। বিদুষী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের যখন কোনও মাসআলায় মতভেদ হত, সমাধানের জন্য সবাই তাঁর কাছে যেতেন। আজকাল আমাদের মহিলারা মাসআলা-মাসায়েল কম জানে। কুরআন-হাদীছের জ্ঞান তাদের বড় কম। কিন্তু ইসলামের প্রথম জমানায় মহিলারা অনেক জানত। বড় বড় সাহাবীরও যখন কোনও বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিত, ছুটে যেতেন আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর কাছে। এ বিষয়েও যখন আব্দুল্লাহ ইবন উমরের মনে খটকা লাগল, তিনি ছুটে গেলেন মায়ের কাছে, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর কাছে। গিয়ে বললেন– ইয়া উম্মাহ! মা! নবীজির সম্মানিত স্ত্রীগণ তো আমাদের মা। আমাদের সমস্ত মায়ের চেয়ে বড় মা। তো তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন– আবূ হুরায়রা এ হাদীছ বলেছেন যে, কারো জানাযায় শরীক হতে পারলে এক কীরাত নেকী, তারপর যদি দাফন পর্যন্ত থাকে তাহলে দুই কীরাত নেকী। আপনি কী বলেন? বললেন,

صَدَقَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ

আবূ হুরায়রা ঠিক বলেছেন।

এ কথা শুনেই আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাযি.-এর আক্ষেপ হল, আফসোস হল– আহা! কত জানাযা চলে গেল। তাতে আমার শরীক হওয়া হয়নি। কিংবা হয়তো জানাযায় শরীক হয়েছি, কিন্তু দাফনে শরীক হইনি।

لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً

আহা! কত কীরাত আমি নষ্ট করলাম। কত কীরাত হারালাম।[১৫৮]

যত জানাযা হয়েছে, সবগুলোতে যদি শরীক থাকতে পারতাম, দাফনে শরীক থাকতাম, তাহলে কত উহুদ পরিমাণ নেকী আমাদের হাসিল হত! আফসোস! আমি এ সমস্ত নেকী হারালাম। কোনও এক কারণে নেকী কামাই করা না হলে অথবা নেকী কামাইয়ের সুযোগ হারালে এভাবে তারা আক্ষেপ করতেন। আফসোস করতেন।

---

১৫৮. সহীহ মুসলিম : ২২৩২

## ঘরে বসে যত নেকী

কিন্তু আমাদের কোনও আফসোস নেই। কত নেকী রোজ হারাই। অতি আসানিতে কত নেকী কামাই করা যেতে পারে ঘরে বসে বসে! বাইরেও যাওয়া লাগে না। ঘরে বসে বসে রোজ কত নেকী কামাই করতে পারি! একটু লক্ষ করলেই হয়ে যায়। যেমন মনে করুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কাজে ডান দিকটা পছন্দ করতেন। ডান দিয়ে শুরু করা পছন্দ করতেন।

يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছুতে ডান দিকটা পছন্দ করতেন। এমনকি চুল আঁচড়ানো এবং জুতা পরার সময়েও।[১৫৯]

চুল আঁচড়াতেন, তো আগে ডান দিক থেকে শুরু করতেন। যখন জুতা পরতেন, ডান দিক থেকে শুরু করতেন। ডান পা আগে দিতেন। ডান জুতা আগে পায়ে দিতেন এবং এরপর বাম। খোলার সময় উল্টা করতেন। জুতা তো আমরা সবাই পায়ে দিই। সবারই তো জুতা খুলতে হয়। যে ঘরে থাকে তারও। বাথরুমে যেতে হলে জুতা পরা লাগে। বাথরুম থেকে বের হয়ে জুতা খুলতে হয়। রোজ কয়েকবার বাথরুমে যাওয়া হয় পেশাব-পায়খানার জন্য। গোসলের জন্যও বাথরুমে যাওয়া হয়। এখন জুতা খোলা আর জুতা পরার কথা চিন্তা করুন। প্রত্যেকবার যদি ডান পায়ে আগে পরি আর বাম পা আগে খুলি, তাহলে যখনই ডান পা আগে পরলাম, একটা নেকী হল। আবার বাম পা আগে খুললাম, তো আরেকটা নেকী হল। আর

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

যে-কোনও নেকীকে আল্লাহ দশগুণ বৃদ্ধি করেন।[১৬০]

তাহলে ডান পায়ে জুতা পরলে দশ নেকী হবে। কমপক্ষে দশ নেকী। অর্থাৎ আগে যদি জুতায় ডান পা দিই, তাহলে কমপক্ষে দশ নেকী

---

১৫৯. সহীহ বুখারী : ৪২৬

১৬০. সূরা আনআম : ১৬০

হবে। আর আগে যদি বাম পা খুলি, দশ নেকী হবে। যদি দিনে পাঁচবার বাথরুমে যাওয়া হয় আর ডান পায়ে জুতা আগে পরা হয় এবং বের হয়ে আগে বাম পা খোলা হয়, তাহলে দশ দশ করে একশ নেকী। বাথরুমে কেবল জুতার ব্যবহারে কত নেকী হল? একশত নেকী হল। আবার বাথরুমে ঢুকতে আগে বাম পা দিয়ে ঢুকতে হয়। বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে আগে বের হতে হয়। তাহলে আগে যদি বাম পা দিয়ে ঢুকি আর ডান পা দিয়ে বের হই তাহলে একশ নেকী। বাথরুমে ঢোকা আর বের হওয়াতে দুশ নেকী হল। এক দিনে যদি দুশ নেকী হয়, এক মাসে হবে কত? ছয় হাজার নেকী। এটা মাগনা। নেকী পেলাম মাগনা। আচ্ছা, এক বছরে কত নেকী হবে? বাহাত্তর হাজার নেকী হল বিনা মেহনতে। কারণ জুতা তো পরতেই হবে। শুধু ডান-বামের প্রশ্ন। বাথরুমে ঢোকা এবং বের হওয়া, এটা তো লাগবেই। শুধু সুন্নত মোতাবেক করলেই হল। আর সুন্নত মোতাবেক করতে বাড়তি কোনও কষ্ট নেই। বরং আরো নিরাপত্তা হয়। যদি সুন্নত মোতাবেক আমল করা হয়, তাহলে নিরাপত্তা হবে। কারণ অনেক সময় বাথরুমে যখন ঢোকে আর বের হয়, তখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। অনেকেরই হাত পা ভাঙ্গে। কিন্তু যদি সুন্নত মোতাবেক পরে, তাহলে সহজে অ্যাকসিডেন্ট হবে না কিংবা খুব কম হবে। কারণ সুন্নতের উপর আমল হলে কাজ ধীরস্থির হবে। ওখানে সে ডানপায়ে আগে জুতা পরছে, পরে সে ঢুকেনি, তারপর বাম পা দিয়ে ঢুকেছে, তাহলে ঢোকাটা ধীরস্থিরভাবে হল। অ্যাকসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা কম। আর সুন্নতের উপর আমল না হলে তো কোনও খবর নেই, কোনও ধীরস্থিরতা নেই। তাড়াহুড়ো করবে আর মরবে। সুন্নতের উপর আমল করলে নিরাপত্তাও লাভ হয় আবার একদম মাগনা ছাওয়াব। যদি আমরা হিসাব করি, প্রত্যেকদিন আমরা হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ নেকী নষ্ট করছি যা ঘরে বসেই আমরা কামাই করতে পারতাম। চুল সবাই আঁচড়ায়। দাঁড়ি সবাই আঁচড়ায়। তা ডানদিক থেকে শুরু করলে দশ নেকী। আর যদি সুন্নতের দিকে লক্ষ না রাখে তাহলে এ নেকী থেকে সে বঞ্চিত হবে। মোটকথা ঘরে বসে এভাবে নেকী কামাই করার ব্যবস্থা অনেক।

## পানাহারে নেকী লাভ

খাবার আমরা সবাই খাই। ডান হাতে পানি খাওয়া, খানা খাওয়া সুন্নত। রোজ তিনবার তো আমরা সবাই খাই। এ তিনের বাইরেও অনেকবার খাওয়া হয়। নাস্তা খাওয়া হয়। পাঁচবার যদি খাবার খাওয়া হয়, ডান হাত দিয়ে খেলে দশ নেকী। এভাবে পাঁচবারে পঞ্চাশ নেকী। খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলি। দশ নেকী। এভাবে পঞ্চাশ নেকী। খাওয়া শেষ হলে আলহামদুলিল্লাহ বলি। দশ নেকী। তাহলে খাওয়ার শুরতে বিসমিল্লাহ আর শেষে আলহামদুলিল্লাহ, এভাবে যদি রোজ পাঁচবার করে দশবার হয়, তাহলে এখানেই একশ নেকী।

পানি রোজ কতবার পান করি! ডান হাতে পান করব সুন্নতের নিয়তে, দশ নেকী। বিসমিল্লাহ বলে পান করব, আবার দশ নেকী। তিন শ্বাসে পান করব আবারও দশ নেকী। পান করা শেষে আলহামদুলিল্লাহ বললাম এবারও দশ নেকী। তো একবার পানি পান করব আর এভাবে দশ দশ করে মোট চল্লিশ নেকী। পানি তো পান করিই। কিন্তু যদি তা করি সুন্নত মোতাবেক, তবে তৃষ্ণা নিবারণ হল, সঙ্গে নেকীও পেলাম। তাও চল্লিশ নেকী। যদি রোজ পাঁচ-দশবার এভাবে পানি পান করি, তাহলে কত নেকী কামাই হবে? প্রত্যেকদিন কত? মাসে কত? বছরে কত? এত নেকী যে, হিসাব করে শেষ করা যাবে না।

## পোশাক পরায় যত নেকী

সকলকেই জামা পরতে হয়। গেঞ্জি গায়ে দিতে হয়। সকলকেই জামা গেঞ্জি খুলতে হয়। যখনই জামা গায়ে দেব, বিসমিল্লাহ বলে গায়ে দেব। জামা পরার দুআ আছে, সেটা মুখস্থ করে নেব। আর দুআ না পারলে বিসমিল্লাহ বললেই যথেষ্ট। এরপর আগে ডান হাতায় হাত ঢোকাব। তখন বিসমিল্লাহ বলে পরব, এতে দশ নেকী। আবার ডান হাতায় আগে হাত ঢোকালাম, তো এখানেও দশ নেকী। এভাবে জামা পরায় ত্রিশ নেকী। আর দুআ জানলে চল্লিশ নেকী। আবার জামা খোলার সময়

তা খুলব জামা পরার বিপরীত নিয়মে। জামার সঙ্গে গেঞ্জি গায়ে দিই। গেঞ্জিতে ওই একই কাজ করব। জামায় যেমন নেকী পাব, গেঞ্জিতেও সমান নেকী। আবার যদি পাজামা পরি, তাহলেও একই কাজ। আগে ডান পা ঢোকাব, তারপর বাম পা। সেখানেও এমন নেকী পাব। খোলার সময় এর বিপরীত করব। তাহলে পোশাকও পরা হচ্ছে আর সেইসাথে নেকীও কামাই করা হচ্ছে। একদম বিনা পরিশ্রমে। কারণ এ কাজগুলো তো আমরা সবাই করবই। সবাই করি। যদি সুন্নত মোতাবেক করি তাহলে দুনিয়ার কাজও হল, নেকীও হল।

## ঘুমানোতে যত নেকী

আমাদের সবারই তো ঘুমানো লাগে। বিনা ঘুমে কেউ থাকি না। যদি ঘুমানোর সময় ওযু করে ঘুমাই, তাহলে দশ নেকী পেলাম। ঘুমের দুআ পড়ব–

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হে আল্লাহ! তোমার নামে মরি ও বাঁচি।

আরো দশ নেকী হল। ডান কাতে ঘুমাব। আবার দশ নেকী পাব। এই মোট ত্রিশ নেকী হল। ঘুমালাম আবার ত্রিশ নেকীও পেয়ে গেলাম। ঘুমের সময় আরো অনেক আমল আছে। ঘুমের সময় এত আমল আছে যে, হাজারে হাজারে নেকী কামাই করা যাবে। নেকী আর নেকী, যদি ঘুমের সময় আমরা ওই আমলগুলো করি। আমার একটা বই আছে– 'মুমিনের ঘুম' নামে। এ বইটা যদি আমরা সবাই সংগ্রহ করে নিই, তাহলে ঘুমের সময় আমরা হাজারে হাজারে নেকী কামাই করতে পারব। কারণ তাতে আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে ঘুমাতেন আর কী করে ঘুম থেকে জাগতেন। তিনি যে তরীকায় জাগতেন আমরা যদি ওই তরীকায় জাগি, তাহলে ঘুমানোর সময়ও ছাওয়াব পাব আবার ঘুম ভাঙলেও ছাওয়াব পাব। হাজারে হাজারে নেকী আদায় হয়ে যাবে যদি আমরা ঘুমের সুন্নতগুলোর উপর আমল করতে পারি। আবার যদি ঘুমের ভেতর কেউ মারা যাই এ

অবস্থায় যে, মৃত্যুর আগে ঘুমের আমলগুলো আমার দ্বারা হয়েছে, তাহলে তো সোজা বেহেশত।

ঘুমের একটা দুআ আছে–

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

হে আল্লাহ! তোমার নামে মরি ও বাঁচি।[১৬১]

এই দুআ পড়ে যদি কেউ ঘুমায় আর এ ঘুমের মধ্যেই সে মরে যায়, তাহলে তার ঈমান নিয়ে মৃত্যু হল। ফলে একদম সোজা বেহেশতে চলে যাবে।

কষ্ট না করে এভাবে ছাওয়াব কামাই করা যায়। যেমন, আমরা ভুলে গেছি একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল– সালাম। সালাম দেওয়া ভুলে গেছি। মুসলমানদের ঘরে সালাম দেওয়ার রেওয়াজ নেই। বাড়িতে গিয়ে বাবা-মায়ের কদমবুসি না করলে সমস্যা হয়। কেউ তো পায়ে হাত দেওয়াকে সালাম বানিয়ে নিয়েছে। না, বরং সালাম হল আসসালামু আলাইকুম। পায়ে হাত দিয়ে সালামটাকে কদমবুসি বলে। ইসলামের তরীকা এটা না। অথচ এটা না করলে বাবা-মা নারাজ হয়। ছেলে সালাম দিল না, তাতে নারাজি নেই। পায়ে হাত কেন দিল না, সেজন্য নারাজ। দেখেন অবস্থা। ইসলামের তরীকা অনুযায়ী সে কাজ করল না, তাতে রাগ নেই। আর হিন্দু তরীকা অনুযায়ী কাজ কেন করল না, সেজন্য রাগ। মুসলমান বাবা-মা চায় সন্তানেরা তাদের সঙ্গে হিন্দুদের মতো আচরণ করুক। মুসলমানের মতো করুক তা চায় না। হাদীছে আছে–

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে, সে তাদের একজন।[১৬২]

আমাদের অধঃপতন কি এমনিই হয়েছে? ঘরে শান্তি নেই। নেই কেন? নেই তো এজন্য যে, আসসালামু আলাইকুম এর রেওয়াজ নেই। ঘরে যখন ঢুকবে তখন বলবে– আসসালামু আলাইকুম। ব্যস, দশ নেকী

---

১৬১. সহীহ বুখারী : ৬৩১৪

১৬২. সুনানে আবু দাউদ : ৪০৩১

হয়ে গেল। সঙ্গে যদি বলে 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ,' তাহলে বিশ নেকী। 'ওয়া বারাকাতুহু' বললে ত্রিশ নেকী। জবাব দিলে নেকী। ছেলেমেয়ে বাবার বা মায়ের রুমে যাবে। যখন ঢুকবে, সালাম দিয়ে ঢুকবে। অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। বাবা যদি ছেলেমেয়ের ঘরে যায়, সালাম দিতে হয়। প্রবেশের আগে অনুমতি নিতে হয়। বাবা কিংবা মা যদি ছেলে বা মেয়ের রুমে ঢুকে, তাহলে আগে অনুমতি নিতে হয়। সালামটাই অনুমতি। বিনা অনুমতিতে ঢুকবে না, এটা নিষেধ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্পষ্ট নিষেধ। সালাম দিলেই অনুমতি নেওয়া হয়। সালাম দিয়ে ঢুকবে। অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। কতবার বাবা-মা'র রুমে যাওয়া হয়? যতবার বাবা-মা ছেলে মেয়ের রুমে যায়, প্রত্যেকবার যদি আসসালামু আলাইকুম বলে অনুমতি নিয়ে ঢোকে, তাহলে দশ নেকী হতে থাকবে। যতবার যাবে ততবারই দশ নেকী পাবে।

السَّلامُ عَليكُم

তোমাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক

এটা একটা দুআ। ঘরে যদি বারবার এ দুআ হতে থাকে, ছেলে বলল বাবাকে السَّلامُ عَليكُم, বাবা বলল ছেলেকে السَّلامُ عَليكُم, মা বলল ছেলেমেয়েকে السَّلامُ عَليكُم, ছেলেমেয়ে বলল বাবামাকে السَّلامُ عَليكُم, তাহলে কত নেকী কামাই হবে এবং কত রহমত ও শান্তি এ ঘরে হবে! আমাদের ঘরগুলোতে শান্তি নেই, রহমত নেই। নেই তো এজন্য যে, সালামের রেওয়াজ নেই। সালামের রেওয়াজ হলেই রহমত আর শান্তির দুআ হয়। দুআ করলে আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ

তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই অহংকারবশে যারা

আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[১৬৩]

তোমরা দুআ করো, আমি কবুল করব। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমাকে ডাকো। আমি সাড়া দেব। আমার কাছে দুআ করো, আমি কবুল করব। ঘরে ছেলেমেয়ে, বাবা-মা সবাই মিলে যদি বলে– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, শান্তি ও রহমত হোক তোমাদের প্রতি, তবে এটা তো দুআ হলো। যদি বারবার বলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শান্তি ও রহমত বর্ষণ করবেন। সে ঘরে অশান্তি থাকবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য, ঝগড়া-ফাসাদ লেগেই আছে। বাবা-মা আর সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। শান্তি নেই। সালাম দিলে এসব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও শান্তি আর আখিরাতেও শান্তি। দুনিয়ার অশান্তি দূর হবে, শান্তি পাওয়া যাবে। আর যত নেকী হবে, আখিরাতে তত শান্তি। আমরা ভুলে গেছি ইসলামের আদাব-কায়দা। সন্তানকে এগুলো শেখানো মূলত মায়ের কাজ।

## ছেলে-মেয়েকে জীবনাচারের আদাব শেখাবে কে?

প্রত্যেক মায়ের কাজ তার ছেলেমেয়েদের ছোটবেলা থেকেই শেখাবে– ডান হাতে খাও, নেকী পাবে। পানি যখন পান করছে, তখন বলবে– বাবা! ডান হাতে পান করো, দশ নেকী পাবে। বিসমিল্লাহ বলে পান করো, দশটা ছাওয়াব হবে। পান করা শেষ হলে বলবে, বাবা! বলো– আলহামদুলিল্লাহ, দশ নেকী পাবে। এক টান দিয়ে এক গ্লাস পানি পান করে ফেলেছে, তাকে শেখাতে হবে– এভাবে না, ধীরে ধীরে খাও, তিন শ্বাসে খাও, নেকী পাবে। মা তার ছেলেমেয়েকে শেখাবে। তারা শেখাবে কোত্থেকে? আমাদের মায়েরাই তো এসব জানে না। আমাদের মায়েদেরই খবর নেই। মাকে আদাব-কদমবুসি না করলে মা নাখোশ

---

১৬৩. সূরা মুমিন : ৬০

হয় কিন্তু আসসালামু আলাইকুম না বললে নাখোশ হয় না। কারণ সে জানে না। পুরুষদের উচিত তাদেরকে এসব শোনো। মা-বোনদের শেখাতে হবে। তাহলে তারাও তাদের সন্তানদের শেখাবে। শৈশব থেকেই মা তার শিশুদেরকে আদাব-কায়দা শেখাবে। ফলে যত বড় হবে, এ শিশু তত আদাবওয়ালা হবে। ছেলেমেয়ে বেয়াদব। কেন বেয়াদব? মা শেখায়নি। ডান হাতে খাওয়া শেখায়নি। খাওয়ার ক্ষেত্রে বেয়াদবি করছে। ডান হাতে পান করা শেখায়নি। বাবাকে মাকে সালাম দেয় না। বেয়াদবি করছে। সুন্নত মোতাবেক ঘুমায় না। ঘুমের ক্ষেত্রে বেয়াদবি করছে। আমরা বেয়াদব বলি কারো সঙ্গে কঠোর রুক্ষ ব্যবহার করলে। তাও বেয়াদবি বটে, কিন্তু এগুলোও তো বেয়াদবি। ঘুমের আদাব, বাথরুমের আদাব, খাওয়া-দাওয়ার আদাব, কথাবার্তার আদাব, মজলিসের আদাব, সবকিছুরই তো আদাব আছে। এগুলো না করলে বেয়াদবি হল। জীবনের সমস্ত কাজে আদাব কায়দা আছে। আর এটাই সুন্দর। এর চেয়ে সুন্দর জগতে আর কোন কিছু নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শিক্ষা দিয়েছেন, তারচেয়ে সুন্দর জগতে আর কিছু নেই।

## দুনিয়ার কাজ দ্বারাও আখিরাত কামাই

আজকাল বাঙ্গালী সংস্কৃতির কথা শোনা যায়। মানুষের তৈরি করা সংস্কৃতি। তাতে বহু গোঁজামিল। ইসলামী সংস্কৃতির উপরে জগতে আর কিছু নেই। ইসলামী সংস্কৃতির উপর আমল করলে দুনিয়াতেও শান্তি আখিরাতেও লাভ। প্রত্যেকদিন হাজার হাজার নেকী তোমার আমলনামায় লেখা হতে থাকবে। হাশরের ময়দানে যখন আমলনামা খোলা হবে, তখন হয়রান হয়ে যাবে। এত নেকী কোত্থেকে আসল? আসলে নেকী কী, তা তো চিন্তা করা হয়নি। আমরা নেকী বলতে তো মনে করি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সঙ্গে পড়া। কোন সন্দেহ নেই এতে যে, এটাই সবচে' বড় নেকী। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া যে সবচে' বড় নেকী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে গাফলতি করার কোনও সুযোগ নেই। পুরুষ-নারী সবারই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত

পড়া সবচে' বড় নেকী। মহিলার জন্য হুকুম ঘরে পড়া আর পুরুষদের জন্য কর্তব্য হল মসজিদে এসে পড়া। কিন্তু নামায পড়াটাই শেষ নয়। বরং জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে নেকী আছে। জীবনে আমরা যত কাজ করি, সমস্ত কাজই যদি আমরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত মোতাবেক করি, তাহলে তাতেই নেকী। প্রত্যেকে কাজেই দশ দশ নেকী। দশ তো বললাম, একদম কম সংখ্যা। কেবল পানি পান করলেই তো ত্রিশ-চল্লিশ নেকী। আর সবচে বড় কথা– এসবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হাসিল হয়। এক হাদীছে আছে–

إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

> আল্লাহ ওই বান্দার উপর রাজি খুশি হয়ে যায়, যে সামান্য কিছু খাবার খায় আর সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ বলে অথবা একটু পানি পান করে আর সেজন্য আলহামদুলিল্লাহ বলে।[১৬৪]

কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে খায় আর খাওয়া শেষে বলে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তার উপর খুশি হয়ে যান। আল্লাহ যদি আমার উপর রাজি হয়ে যান, সন্তুষ্ট হয়ে যান, তাহলে আমার আর কী দরকার আছে? খাওয়াও হল, পেটও ভরল, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টিও পেয়ে গেলাম। কাজ দুনিয়ার, কিন্তু এর ভেতর দিয়ে পেলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি। ইসলাম এক মহান ধর্ম। এর মতো ধর্ম আর কী হতে পারে? এ ধর্ম বলে– দুনিয়ার কাজগুলোও যদি তুমি সুন্নত মোতাবেক কর তাহলে আখিরাতের কাজ হয়ে যাবে।

আর অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা হল এই– তুমি যদি পুণ্য অর্জন করতে চাও, তাহলে দুনিয়া ছাড়ো। সন্ন্যাসী হয়ে যাও, বৈরাগী হয়ে যাও। ইসলাম বলে, বৈরাগী হয়ো না। বৈরাগী হওয়া গুনাহ। দুনিয়ার কাজ করো, তবে সুন্নত মোতাবেক করো। তোমার দুনিয়ার কাজও হয়ে গেল,

---

১৬৪. সহীহ মুসলিম : ২৭৩৪

আবার কবরে শান্তির ব্যবস্থাও হয়ে গেল। হাশরের ময়দানে আরশের ছায়াতলে জায়গা পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। এরপর আবার বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ারও ব্যবস্থা হয়ে গেল। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে এ সহজ সহজ নেকীগুলো কামাই করার প্রতি মনোযোগ দান করুন। শুধু একটু মনোযোগ দরকার। যখন যে কাজ করি, সে কাজ একটু লক্ষ করা যে, এ কাজের সুন্নত তরীকা কী।

## মা-বোনদের জন্য সহজে নেকী অর্জন

আমাদের মা-বোনদের জন্য কত আসান নেকী কামাই করা। কিছু কিছু কাজ আছে তারা তো করেন। রান্নাবান্না করে। তরকারি তারাই কাটে। পেয়াজ কাটে আর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। কত কষ্ট! কিন্তু যদি বিসমিল্লাহ বলে পেয়াজ কাটে, তাহলে কেবল চোখের পানিই পড়ল না; নেকীও কামাই হয়ে গেল। যখনই তরকারি কাটে, পেয়াজ কাটে কিংবা রান্না করে তখনই যদি ডান হাতে করে, বিসমিল্লাহ বলে, তাহলে নেকী কামাই হতে থাকবে। যখনই সে ধোওয়ার জন্য চাল বের করে, বিসমিল্লাহ বলে চাল মাপবে। দশ নেকী পাবে। এরপর যখন তা ধোওয়ার জন্য ট্যাপ ছাড়বে তখনও বলবে– বিসমিল্লাহ! আরো দশ নেকী পাবে। চুলায় আগুন জ্বালানোর সময় বলবে– বিসমিল্লাহ। এবারও দশ নেকী পাবে। মোট ত্রিশ নেকী হয়ে গেল। চুলায় যখন পাতিলটা বসাবে তখনও বলবে– বিসমিল্লাহ। নেকীর পরিমাণ বেড়ে চল্লিশ নেকী। এগুলো কি আমার বানানো কথা? এখানে আলেম-উলামা আছেন। আমি ভুল বললে তারা বলে দেবেন। একটাও আমি মিছে কথা বলছি না আলহামদুলিল্লাহ। পাতিল বসিয়ে দিয়ে আসল, এরপর কিছুক্ষণ পর গিয়ে আবার একটু নাড়া দিল আর বলল বিসমিল্লাহ। আবার দশ নেকী পেল। রান্না হয়ে গেল তার মনমতো। এবার সে বলুক আলহামদুলিল্লাহ। আবার দশ নেকী।

মেয়েদের জন্য নেকী কামাই করা বড় আসান। কারণ এ সবগুলো কাজ তো সে করছেই। এরপর আবার পরিবেশনের দায়িত্বও তার। আমরা

পুরুষরা তো সব বেকার। স্ত্রী বা মা রান্না করে দিল, এখন সে একটু পরিবেশন করবে, এতটুকু শক্তিও তার গায়ে নেই। তার বলা উচিত ছিল– আহা! তুমি কষ্ট করে রান্না করেছ। পরিবেশনটা আমি করি। কিন্তু এটা করবে না। বসে বসে অপেক্ষা করে কখন স্ত্রী বা মা পরিবেশন করবে আর সে খাবে। এই যে পরিবেশন করছে এটা তো খেদমত। এতে সে ছাওয়াব পাচ্ছে। যদি এ কথাটা মনের মধ্যে রাখে– আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের খেদমত করছি। আল্লাহ তাআলা খুশি হবেন। যদি মনে করে– আমি দাসীগিরি করছি, তবে কষ্ট করেও ছাওয়াব পেল না। এরকম আছে। স্বামীকে বলে– আমি তো তোমার ঘরে দাসীগিরি করি। কিন্তু তার মনের মধ্যে যদি থাকত– কষ্ট হোক আমার, আমি সবার সেবা করছি, আমি তো এর ছাওয়াব পাব; তাহলে তো কত নেকী তার কামাই হতে পারত।

মোটকথা যখনই পরিবেশন করে, ভাত বাড়ে, বলতে যেন ভুল না হয়– বিসমিল্লাহ। তরকারি বাড়ছে পেয়ালায় আর বলছে– বিসমিল্লাহ। সেখান থেকে আবার প্লেটে তুলছে, বলছে– বিসমিল্লাহ। তরকারি দিচ্ছে, বলছে– বিসমিল্লাহ। ডান হাতে দিচ্ছে এতেও দশ নেকী। তাহলে দেখুন কত নেকী সে রান্না করে পাচ্ছে, পরিবেশন করে পাচ্ছে। আবার এই যে খেদমতের নিয়ত করেছে, সেবার নিয়ত করেছে তার মাধ্যমেও নেকী পাচ্ছে। প্রত্যেকদিন শত শত; বরং হাজার হাজার নেকী হবে। একজন নারী ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত এরকমভাবে ঘরের সেবা করছে। এ ত্রিশ-চল্লিশ বছরে তার কত নেকী কামাই হবে, যদি এ তরীকায় করে? আল্লাহ তাআলা আমাদের মা বোনদের এ সমস্ত নেকী কামাই করার সুযোগ দান করুন এবং আমাদের পুরুষদেরকে এ সুমতিটা দান করুন, যাতে আমরা ঘরের নারীদেরকে সহীহ ইসলাম শেখাই আর সেইসঙ্গে তাদের শুকরিয়া আদায় করার মতো মানসিকতাও তৈরি হয়।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# পবিত্র রমাযান : চাই গুনাহ থেকে বাঁচা ও বেশি বেশি তাওবা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!
আমি কুরআন মাজীদের এক আয়াত তিলাওয়াত করেছি। এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করো। যদি তাওবা কর, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে।[১৬৫]

---

১৬৫. সূরা নূর : ৩১

সফল হতে পারবে। সফলতার চাবিকাঠি বেশি বেশি তাওবা করো। বিশেষ করে এখন যেহেতু রমাযান মাস চলছে, এ মাসে আল্লাহ তাআলা বেশি বেশি ক্ষমা করেন, এটা ক্ষমার মৌসুম, তাই এই মৌসুমকে কাজে লাগানোর জন্য বেশি বেশি তাওবা করা উচিত।

## গুনাহ থেকে বাঁচার ঢাল

প্রথম তো লক্ষ রাখতে হবে এ মাসে যেন কোনও গুনাহই না হয়। এবং গুনাহ তো হওয়াই উচিত না। রোযাকে বলা হয়েছে– جُنَّة। হাদীছে আছে–

> الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ ، أَوْ قَاتَلَهُ ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ
>
> রোযা ঢাল। তোমাদের মধ্যে কেউ যেদিন রোযাদার থাকবে, সে যেন কোনও অশ্লীল কাজ না করে, কারো প্রতি দুর্ব্যবহার না করে। কেউ যদি তাকে গাল দেয় বা তার সাথে মারামারি করতে চায়, তবে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার।[১৬৬]

রোযা ঢাল। ঢাল মানুষকে শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা করে। কেউ যদি কাউকে কোনও আঘাত করতে চায়, তখন সেই আঘাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ ঢাল পাতে। আঘাতটা ঢালের উপর দিয়ে চলে যায়, গায়ে লাগে না। ঢালের ব্যবহার আগে তো খুব বেশি হত। এখনো হয়। বুলেট প্রুফ পোশাক তো ঢালই। গুলি নিজের গায়ে যাতে না লাগে, তাই এটা পরা হয়। আগে ঢাল ব্যবহার করা হত তরবারি ও তীরের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য। আরেক আছে মানবঢাল। আর তা হল শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নারী, শিশু বা নিরীহ মানুষ ব্যবহার করা। এটা জোরপূর্বক করা হয়। এটা পাষণ্ডতা ও নির্মমতা। আরেক মানবঢাল আছে স্বেচ্ছাকৃত। প্রিয়জনকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে শত্রুর

---

১৬৬. মুসনাদে আহমাদ : ৮০৪৫, ১০৫৫৯ ,৯৯৪৮

হামলার মুখে সঁপে দেওয়া। এর সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরাম। উহুদের যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের শরীর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ঢাল বানিয়ে দিয়েছিলেন। শত্রুর আঘাত যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে লাগতে না পারে, তার জন্য সামনে বুক পেতে দিয়েছিলেন। সুবহানাল্লাহ।

## শয়তানের হামলা থেকে আত্মরক্ষার উপায়

ঢাল তো এজন্যই, যাতে শত্রুর আঘাত গায়ে না লাগে। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু শয়তান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়ো না। কেউ শয়তানের অনুগামী হলে শয়তান তো সর্বদা অশ্লীল ও অন্যায় কাজেরই নির্দেশ দেবে।[১৬৭]

তোমরা শয়তানের পথে চলো না। শয়তানের কথায় চলো না। শয়তান তোমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। সবচেয়ে প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের কাজ হল মানুষকে দিয়ে গুনাহ করানো। মানুষেকে দিয়ে যত গুনাহ করানো যায়, শয়তান তত সফল হয়। শয়তানের সফলতা হল মানুষকে দিয়ে গুনাহ করানোর মধ্যে। সে কসম করেছে আল্লাহর সঙ্গে যে, হে আল্লাহ! আমি মানুষের উপর হামলা চালাব তার সামনে দিয়ে এবং তার পেছন দিয়ে। আমি তার ডান দিক থেকে হামলা করব, বাম দিক থেকে হামলা করব এবং সবদিক থেকে তার উপর হামলা চালাব। আমি তাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়ব। হামলা করা মানে নানান প্ররোচনা দিয়ে, উস্কানি দিয়ে মানুষকে গুনাহ করানো। আল্লাহ তাআলাও ব্যবস্থা দিলেন– তুই যতই হামলা করিস না কেন, তোর থেকে যেন আমার বান্দা বাঁচতে পারে, তার জন্য আমি তার হাতে ঢাল তুলে দেব। এই

১৬৭. সূরা নূর : ২১

ঢাল নানারকম আছে। যেমন আল্লাহ তাআলার যিক্‌র। এটা ঢাল। আল্লাহর যিক্‌র মানে আল্লাহর স্মরণ। মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করা আর সেটাকে মুখে উচ্চারণ করা। আল্লাহ, আল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, এসব হল যিক্‌র। যখন মুখে যিক্‌র জারি থাকবে আর মনেও আল্লাহর স্মরণ থাকবে, তখন কারোর দ্বারা গুনাহ করা সম্ভব হয় না। 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' বলছি, আবার মিথ্যা কথা বলছি, এটা সম্ভব নাকি? এটা সম্ভব না। সুবহানাল্লাহ বলছি আবার অন্যের উপর জুলুম করছি, এটা সম্ভব না। কেননা যিক্‌র হল ঢাল। যিক্‌র জারি থাকলে শয়তানের আক্রমণ সফল হয় না। বরং হাদীছ শরীফে যিক্‌রকে সুরক্ষিত দুর্গ বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি যিক্‌রের দুর্গে ঢুকে পড়ে, শয়তান তাকে ধরতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে–

الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ

বান্দা আল্লাহর যিক্‌র দ্বারাই নিজেকে শয়তান থেকে হেফাজত করতে পারে।[১৬৮]

## রোযার হাকীকত সম্পর্কে ধ্যান

এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার দেওয়া আরেকটা ঢাল হল রোযা। যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সত্যিকারের রোযাদার যদি সে হয়, তার পক্ষে গুনাহ করা সম্ভব না। কারণ যখনই সে গুনাহ করবে তখনই তার মনে পড়বে, আমি তো রোযাদার। আমি কীভাবে মিথ্যা কথা বলি! আমি রোযা রেখেছি, কীভাবে আমি মানুষকে ঠকাই! আমি রোযা রেখেছি, কীভাবে ঘুষ খাই! রোযা রেখেছি, কীভাবে সুদ খাই! রোযা রেখেছি, কীভাবে মালে ভেজাল মিশাই, কীভাবে ওয়াদা খেলাফ করি, কীভাবে মানুষকে গালি দিই, কীভাবে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করি ইত্যাদি।

কেউ যদি গায়ে পড়েও তোমার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তুমি বলে দাও, ভাই! আমি রোযাদার, আমি রোযা রেখেছি। তার মানে রোযাকে তুমি ঢাল বানাও। এর মাধ্যমে তার সাথে ঝগড়া হতে নিজেকে রক্ষা

১৬৮. জামে' তিরমিযী : ২৮৬৩, ৩১০২

করো। সুতরাং রোযা হল ঢাল। যে ব্যক্তি রোযাও রাখে আবার গুনাহও করে, তাহলে বুঝতে হবে তার রোযা যথাযথ রোযা হয়নি। সত্যিকারের রোযাদার তো চিন্তা করবে যে, রোযা অবস্থায় আমি কোনও কিছু খাই না, পান করি না। কেন খাই না, কেন পান করি না, অথচ আমার খাবারটা তো হালাল ছিল? আমরা যে খাবার খাই সব তো হালাল খাবার। তো আমি রোযা অবস্থায় সেই হালাল খাবার থেকে বিরত থাকি। তাহলে যেই জিনিস সারা বছরের জন্য হারাম, সেটা আমি রোযা অবস্থায় কী করে করতে পারি? মিথ্যা কথা বলা সারা বছরের জন্য হারাম। মানুষকে ঠকানো সারা বছরের জন্য হারাম। মানুষের গীবত করা সারা বছরের জন্য হারাম।

## গীবত কত কঠিন গুনাহ

গীবত হলো, অন্যের ভেতর যে দোষ আছে সেটা তার পেছনে বলা। এটা গীবত। এটা সারা বছরের জন্য হারাম। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ তার পেছনে বলে, সে যেন তার মৃত ভাইয়ের গোশত খায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا، اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[১৬৯]

তোমরা অন্যের দোষ তার পেছনে পেছনে বল, এটা কীভাবে বল? এটা তো মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো। তোমরা কি কেউ পছন্দ কর যে তোমার ভাই মারা গেছে আর তার শরীর থেকে কেটে কেটে তার

১৬৯. সূরা হুজুরাত : ১২

গোশত খাবে? এটা তো কেউ পছন্দ কর না। এটা যখন পছন্দ কর না, তাহলে কীভাবে পেছনে পেছনে তার বদনাম কর? পেছনে বদনাম করাটা তো তার শরীর থেকে গোশত খাওয়ার মতোই। এমনিতেই মানুষের গোশত খাওয়া হারাম। আবার সেই গোশত যদি হয় নিজের ভাইয়ের তাহলে তো আরো বেশি হারাম হবে। আবার সেই গোশত যদি হয় আপন মরা ভাইয়ের, তাহলে তো আরো বেশি হারাম। তিনগুণ হারাম। কারোও পেছনে বদনাম করা ওইরকমের হারাম। কত কঠিন গুনাহ চিন্তা করে দেখুন।

কেউ রোযাও রাখছে আর পেছনে অন্যের বদনাম করছে। তাহলে সারা বছরে যে কাজটা হারাম ছিল, রোযা অবস্থায় সে তা করছে। অথচ রোযা অবস্থায় সে হালাল খাবার খাচ্ছে না, হালাল পানি সে পান করছে না। কিন্তু যে জিনিস সারা বছর হারাম ছিল, সেই হারাম কাজটা সে করছে, সেই খাবার সে খাচ্ছে। এটা কেমন রোযা হল? সত্যিকারের রোযাদার যদি হয়, তাহলে সে কিছুতেই এ কাজ করতে পারে না। কেননা–

الصَّوْمُ جُنَّة

রোযা হল ঢাল

মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর গুনাহ থেকে বাঁচার দ্বারা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচা যায়। রোযা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

রোযা তোমাদের যুদ্ধে ব্যবহার করা ঢালের মতো এক ঢাল, যা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করে।[১৭০]

সুতরাং যারা রোযা রাখছে তাদের কর্তব্য রোযা অবস্থায় কোনও রকমের গুনাহ না করা। যতরকম গুনাহ আছে, সমস্ত গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। অন্যকে অভিশাপ দেওয়াও গুনাহ। আমাদের মা-বোনেরা অনেক সময় এ গুনাহটা করে। হাদীছে মহিলাদের জাহান্নামে যাওয়ার

১৭০. মুসনাদে আহমাদ : ১৮০৬৯, ১৭৯৩৯

এক কারণ বলা হয়েছে– বেশি বেশি অভিশাপ দেওয়া। এক মহিলা সাহাবী প্রশ্ন করেছিলেন, মহিলাদের জাহান্নামে বেশি যাওয়ার কারণ কী? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ বলেছিলেন–

تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ

তোমরা অভিশাপ দিয়ে থাক বেশি বেশি।[১৭১]

রাগ হলে ছেলেকে অভিশাপ দেয়, মেয়েকে অভিশাপ দেয়, ভাইকে অভিশাপ দেয়, বিভিন্ন জনকে অভিশাপ দেয়, যখন বেশি রাগ উঠে যায় তখন অভিশাপ দেয়– আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, ও মরুক, জাহান্নামে যাক, ও ভিক্ষা করে খাক। মা যদি ছেলেকে অভিশাপ দেয়, এটা খুবই বিপজ্জনক। বাবা-মায়ের অভিশাপ লেগে যায়। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

তিনটি দুআ অবশ্যই কবূল হয়। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মজলূমের দুআ, মুসাফিরের দুআ ও সন্তানের বিরুদ্ধে পিতামাতার দুআ অর্থাৎ অভিশাপ।[১৭২]

কোনও মায়ের উচিত না তার সন্তানকে এরকমের অভিশাপ দেওয়া। আর এমনিতেও অভিশাপ দেওয়া এত খারাপ যে, হাদীছে আছে– কেউ যদি কাউকে অভিশাপ দেয়, সে অভিশাপটা আসমানে উঠে যায়। কিন্তু অভিশাপ এমন জিনিস যে, তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না। সে দেখে আসমানের দরজা বন্ধ। যখন সে আর উপরে উঠতে পারে না তখন নীচের দিকে নামে এবং যাকে অভিশাপ দেওয়া হয়েছে তার দিকে ছুটে যায়। যাওয়ার পরে দেখে সে উপযুক্ত কি না। অভিশাপের উপযুক্ত যদি সে হয়, তাহলে এ অভিশাপটা তার উপরে পড়ে। আর সে

---

১৭১. সহীহ ইবনে হিব্বান : ৭৪৭৯

১৭২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৩, ৪৯৬

যদি অভিশাপের উপযুক্ত না হয়, তাহলে এ অভিশাপ ফিরে আসে ওই ব্যক্তির দিকে, যে অভিশাপ দিয়েছিল। যদি বলে 'ধ্বংস হও', কিন্তু যাকে বলা হয়েছে সে এর উপযুক্ত না, তবে হবে এই– যে ব্যক্তি এই অভিশাপ দিয়েছে, ধ্বংস সেই হবে। হয়তো কঠিন কোনও মুসীবতে সে পড়ে যাবে কিংবা কঠিন কোনও রোগে সে আক্রান্ত হবে অথবা এ রকম অন্য কিছু তার হবে।

যাহোক, সব রকমের গুনাহ থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। আমাদের মা-বোনেরা যে সমস্ত গুনাহ করে, তাদের সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তারা অভিশাপ দেয়। এই অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাসটা তাদের একটু বেশি। এমনিভাবে গীবত করা। বিশেষত যখনই দু-চারজন মহিলা একত্রিত হয়, তখনই কেন যেন তাদের আলোচনাটা সরে যায় এদিকে। কে কী করল না করল, সে নিয়ে আলোচনা। অমুকে কী করছে না করছে, তার পেছনে পড়ে যায়। এটা কিছুতই উচিত হবে না। কঠিন গুনাহ। মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো গুনাহ। রোযা রেখে এ গুনাহ করলে রোযা নিষ্ফল হয়ে যায়। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে করে রোযা অবস্থায় কোনও রকমের গুনাহ না হয়। তাহলেই রোযার সুফল পাওয়া যাবে। তারপরও যদি কখনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করতে হবে।

## তাওবা করতে বিলম্ব করা উচিত নয়

নিয়ম হল– গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করা, দেরী না করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

আল্লাহ নিজের প্রতি তাদের তাওবা কবুল করাকে আবশ্যিক করে নিয়েছেন, যারা মন্দকাজ করে অজ্ঞতাবশত, তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। তারাই এমন,

যাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করে নেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।[১৭৩]

এক তো হল, কোনও মুমিন ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে গুনাহ করতেই পারে না। আগে থেকে প্রোগ্রাম করা যে, অমুক সময় আমি এই গুনাহ করব, এটা মুমিনের কাজ না। রাস্তায় চললে হঠাৎ করে যেমন অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে, তেমনি গুনাহও হঠাৎ হয়ে যেতে পারে। এটা ওইরকমের যে, পিচ্ছিল রাস্তায় চলছে খুব সতর্কতার সাথে যাতে পড়ে না যায়। তারপরও পা ফসকে পড়ে গেল। গায়ে কাদা লেগে গেল। এই যে গায়ে কাদা লাগল, এখন কী করবে সে? গায়ে কাদা লেগেছে লাগুক, কী আর হয়েছে তাতে! কাদা লেগেছে এবং এ অবস্থায়ই সে উঠে ধীরে ধীরে হাঁটছে। চারদিকে মানুষ তাকিয়ে আছে, তার কোনও পরোয়া নেই। এমন তো হয় না। বরং কাদা লাগলে প্রথমে তো খেয়াল করে যে, কেউ দেখল কি না। মাথা উঠিয়ে দেখে, কেউ দেখে ফেলেনি তো! চারদিকে তাকায়। এরপর সে কত তাড়াতাড়ি কাদাটা ধুয়ে ফেলা যায় সেই চিন্তা করে। পাশে ডোবা বা পুকুর পেলে সেখানে নেমে পড়ে। নেমে এই কাদাটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে ফেলে। এরপর সে হাঁটে।

## গুনাহ হচ্ছে আত্মার ময়লা ও জঙ

গুনাহ হল কাদা। গুনাহ করলে মানুষের আত্মায়, রূহে দাগ লাগে, কাদা লাগে। গুনাহ করে ফেললে ফিরিশতারা দেখে এ লোকটার আত্মায়, রূহে কাদা লেগে গেছে। কুরআন ও হাদীছের ভাষায় একে বলে জঙ লাগা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন–

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

তারা যা কিছু করত, তাতে তাদের অন্তরে জঙ পড়ে গেছে।[১৭৪]

---

১৭৩. সূরা নিসা : ১৭

১৭৪. সূরা মুতাফ্ফিফীন : ১

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ ، صُقِلَ قَلْبُهُ ، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ ، حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ ذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ : {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}

বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার কলবে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে গুনাহটি ছেড়ে দেয় ও তাওবা-ইসতিগফার করে, তবে তার কলব পরিষ্কার হয়ে যায়। যদি ফের গুনাহ করে তবে দাগ বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তার গোটা অন্তরের উপর তা ছেয়ে যায়। এটাই সেই জঙ, সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা যা কিছু করত, তাতে তাদের অন্তরের উপর জঙ পড়ে গেছে"।[১৭৫]

কাজেই গুনাহ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি তাওবা করে ফেলতে হবে, যাতে করে ফিরিশতাদের রূহানী জগতের বাসিন্দাদের নজরে পড়ে না যায়। খুব তাড়াতাড়ি উঠে কাদা ধুয়ে ফেলতে হবে, জঙ মুছে ফেলতে হবে। আর গুনাহের কাদা ধোয়ার ও জঙ মোছার উপায় হল– তাওবা করা, ইসতিগফার করা। গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বলা– اَسْتَغْفِرُ الله । ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে জঙ মুছে যাবে।

وَتُوبُوٓا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করো। যদি তাওবা কর, তাহলে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে।[১৭৬]

---

১৭৫. সহীহ মুসলিম : ২০৭, ৩৮৬

১৭৬. সূরা নূর : ৩১

আলোচনা শুরু হয়েছিল এখান থেকে যে, শয়তান চায় মানুষকে দিয়ে বেশি বেশি পাপ করাতে। তাকে দিয়ে যত বেশি পাপ করানো যায়, শয়তান তত সফল হয়। কিন্তু আল্লাহ শয়তানের সফলতার দুয়ার বন্ধ করে দিয়েছেন। মানুষ যাতে সফল হতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছেন। যেই না গুনাহ হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে বান্দা তুমি বলো اَسْتَغْفِرُ الله– আল্লাহ, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। ব্যস সঙ্গে সঙ্গে গুনাহের দাগ মুছে যাবে। শয়তান ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি সফল হয়ে যাবে। যতবার গুনাহ হয় ততবারই বলবে– اَسْتَغْفِرُ الله। اللهُمَّ اغْفِرْنِي। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

## হযরত উমর রাযি.-এর ইস্তিগফার

রমাযান মাসে হযরত উমর ফারূক রাযি. খুব বেশি বলতেন–

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي

হে ওই আল্লাহ, যার ক্ষমা সবকিছু জুড়ে প্রশস্ত! আমাকে ক্ষমা করে দাও।[১৭৭]

এটা পড়তেন হযরত উমর ফারূক রাযি.। বিখ্যাত সাহাবী। সাহাবীগণ গুনাহ করতেন না। তারা তো জান্নাতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবদ্দশায় সুসংবাদ দিয়েছেন–

ابو بكر فى الجنة، عمر فى الجنة، عثمان فى الجنة

আবু বকর, উমর, উসমান, আলী রাযি. সবাই জান্নাতী। উমর ফারূক রাযি. কত নেক করেছেন জীবনে? সারা জাহানের সমস্ত মানুষের নেকী এক পাল্লায় আর উমর ফারুক রাযি.-এর নেকী আরেক পাল্লায় দিলে তাও তো সমান হবে না। শয়তান তাঁকে দিয়ে গুনাহ করাবে কী! উল্টো শয়তান তাঁকে ভয় পেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– উমর! তুমি যে রাস্তা দিয়ে হাঁট, শয়তান ভয়ে সে রাস্তা

১৭৭. শুয়াবুল ঈমান : ৩৬২০

ছেড়ে পালায়। সুতরাং শয়তান তাঁকে দেখে ভয় পেত। তাঁকে দিয়ে গুনাহ করাবে কীভাবে? তারপরও তিনি বলতেন–

يا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي

হে প্রশস্ত ক্ষমার মালিক! আমাকে ক্ষমা করে দাও।

তো তিনিই যখন বলতেন– আমাদের তো আরো বেশি বেশি বলা উচিত।

## প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসতিগফার

কেবল কি এই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর কোনও গুনাহ নেই, নিষ্পাপ মা'সুম যিনি, সমস্ত মানুষের সেরা, নবীদের সরদার, সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর হাবীব, তিনি পর্যন্ত বলেন যে, আমি রোজ একশ বার তাওবা করি। এমন অনেক হয়েছে যে, তিনি একই মজলিসে কতবার তাওবা, ইসতিগফার পড়েন তা সাহাবায়ে কেরাম গুণে দেখতেন। দেখা যেত, তিনি একশ'বার পড়েছেন–

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ انتَ التَّوَّابُ الغَفُوْر

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। আপনিই তো তাওবা কবুলকারী ও অতি ক্ষমাশীল।[১৭৮]

অথচ তাঁর কোনও গুনাহ নেই। তারপরও কেন এত তাওবা করছেন? করতেন এজন্য যে, বান্দা যত তাওবা করে আল্লাহ তত খুশি হন। তাওবা না করলে তিনি নারাজ হন। যারা তাওবা করে না, কুরআন মাজীদে তাদেরকে জালেম বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

যারা তাওবা করে না তারাই জালেম।[১৭৯]

---

১৭৮. মুসনাদে আহমাদ : ৫৫৬৪

১৭৯. সূরা হুজুরাত : ১১

গুনাহ না থাকলেও যদি তাওবা করা হয়, তাহলে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহকে বেশি বেশি খুশি করার জন্য তিনি বেশি বেশি তাওবা করতেন। আর আমাদের তো গুনাহের কোনও শেষ নেই। সব সময় গুনাহ করি। রোযা রেখেও গুনাহ করছি। রোযা রেখেও মিথ্যা কথা বলছি। রোযা রেখেও অভিশাপ দিচ্ছি। আরো কত শত গুনাহ নিত্যদিন করছি! কাজেই এর জন্য ইসতিগফার করতে হবে। বেশি বেশি তাওবা করতে হবে। এতেই সফলতা। তাওবা করে গুনাহ মাফ করানোর মধ্যেই সফলতা। তাই আল্লাহ বলেন,

وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

তোমরা বেশি বেশি তাওবা করো, তাওবা করলে তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে বেশি বেশি তাওবা করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

و اٰخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



# কুরবানীর মাসাইল ও শিক্ষা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

"আল্লাহর কাছে তাদের গোশত পৌঁছে না আর তাদের রক্তও না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। এভাবেই তিনি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন বলে। যারা সুচারুরূপে সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।"[১৮০]

---

১৮০. সূরা হজ্জ : ৩৭

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!
আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী– একটা পবিত্র মাস তিনি আমাদেরকে পাইয়ে দিয়েছেন। অনেক ফযীলতের মাস। এ মাসের প্রথম দশ দিনের অনেক মর্যাদা। কুরআন মাজীদের একটা সূরার নাম 'সূরাতুল ফাজর।' এ সূরার শুরুতে আছে–

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

শপথ ফজর-কালের। এবং দশ রাতের।[১৮১]

## যুল-হিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

দশ রাত্রের কথা বলা হয়েছে। এ দশ রাত হল যুল-হিজ্জা এর প্রথম দশ রাত। দিনসহ রাত। আমরা যাকে যিলহজ বলি। এর সহীহ শুদ্ধ নাম হল– যুল হিজ্জা। এ মাসের প্রথম দশ দিন অনেক বরকতের, অনেক ফযীলতের, অনেক ছাওয়াবের। এর একেকটা রাত অনেক মর্যাদাপূর্ণ। রাতের-দিনের সমানে মর্যাদা। এর একেক রাত লাইলাতুল কদরের মতো মর্যাদা রাখে। আর দিনে যদি কেউ রোযা রাখে, একেক দিন রোযা রাখলে একেক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। দশ তারিখ ছাড়া। রোযা প্রথম নয় দিন রাখা যাবে। আর আরাফাতের রোযা তো অনেক ফযীলতের। নয় তারিখের রোযা। এতে দুই বছরের গুনাহ মাফ হয়। কাজেই এ দিনগুলোকে আমরা খুব গুরুত্বের সঙ্গে হেফাজত করার চেষ্টা করি। তার মানে কোনও গুনাহ যেন না হয়ে যায়। দিনে-রাতে কখনোই কোনও ধরনের গুনাহ যাতে না হয়।

আমাদের সবচে' বড় সমস্যা আমরা গুনাহ ছাড়তে পারছি না। গুনাহের ব্যাপারে আমাদের বড় অবহেলা। গুনাহকে যেন কিছু মনেই করি না। গুনাহ হয়ে গেল তো হয়ে গেল, সমস্যা কী? অথচ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বড় কারণ গুনাহ করা। এ গুনাহ করেন তো ইবলীস মালউন বা অভিশপ্ত হয়েছে। মা'সিয়াত বা পাপাচার একটি

---

১৮১. সূরা ফাজর : ১-২

ধ্বংসাত্মক জিনিস। জিজ্ঞেস করা হয়– এটা সগীরা না কবীরা গুনাহ। গুনাহ হল আগুন। আগুন অল্প হোক আর বেশি হোক সবটাই ভয়ের। বেশি আগুনও জ্বালায়, অল্প আগুনও জ্বালায়। সিগারেট খেয়ে তার শেষ অংশটুকু ফেলে দিয়েছে এটা তো দাউ দাউ করে জ্বলে না। এ আগুনটাই তো সবচে' কম আগুন। কিন্তু দেখা যায় এ আগুনে কখনও মানুষের ঘরবাড়িও জ্বলে যায়। এমনই কয়েলের আগুন। আমাদের ছোটবেলায় মালিবাগ বাজার পুড়ে গেল। পরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এটা শুরু হয়েছে কয়েলের আগুন থেকে। একটা বাজার পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। কাজেই গুনাহমাত্রই আগুন। ছোট আর বড়তে পার্থক্য করতে নেই। সমস্ত গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, যাতে আমার দ্বারা কোনও গুনাহ না হয়ে যায়। বিশেষ করে ফযীলতের দিনগুলোতে। এ দিনগুলোতে নেক আমলের ছাওয়াব যেমন অনেক বেশি, তেমনি বদ আমলের গুনাহও অনেক কঠিন। মক্কা মুকাররামায় মসজিদুল হারামে এক রাকাত নামায পড়লে এক লক্ষ রাকাত নামায পড়ার ছাওয়াব পাওয়া যায়। ঠিক ওইরকমের গুনাহও যদি কেউ করে, তাহলে সে গুনাহটাও অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক, অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে যায়। এই দিনগুলো যেহেতু অনেক ফযীলতের, তাই সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনও গুনাহ না হয়ে যায়। এ দিনগুলোর একটি বিশেষ আমল হল কুরবানী। কেউ কেউ অনুরোধ করেছে যেন আজকে কুরবানী সম্পর্কে কথা বলি।

## কুরবানী করার ফযীলত

কুরবানী অনেক বড় ফযীলতের আমল। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ কুরবানী কী? তিনি বললেন, এটা তোমাদের পিতা, আমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এর সুন্নত। তাঁর আদর্শ। সুন্নত মানে আদর্শ। জিজ্ঞেস করলেন, এটা করলে আমরা কী পাব? তিনি বললেন, প্রত্যেক পশমে পশমে এক নেকী পাবে।

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ

প্রত্যেক পশমে এক নেকী।[১৮২]

আমরা সবাই জানি প্রত্যেক নেকীকে আল্লাহ দশ গুণ বাড়ান। তাহলে প্রত্যেক পশমে দশ নেকী হবে। একটা গরুর বা ছাগলের শরীরে কয়টা পশম থাকে? তাহলে কত নেকী পাওয়া যাবে? এটা আমাদের পক্ষে হিসাব করেন শেষ করা সম্ভব না। তাই যার পক্ষে সম্ভব এ সুযোগ ছাড়া উচিত না। অনেকে হিসাব করে– আমার উপর কুরবানী ওয়াজিব কি না? ওয়াজিব হলে করব আর তা না হলে করব না। আমাদের এ একটা আজব খাসলত। শরীয়তের ব্যাপার হলেই সেখানে খুঁজি, এটা ফরয-ওয়াজিব কি না। ফাঁক খুঁজি। ফরয যদি না হয়, ওয়াজিব যদি না হয়, তাহলে করব না। এটা কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে করি না। দুনিয়ার বিষয়ে আমরা কখনোই এটা করি না। এ অনুষ্ঠানটা করা ফরয কি না, ওয়াজিব কি না, তা ভাবি না। ফরয-ওয়াজিব তো নয়ই; গুনাহ হয়, তারপরও করি। খৎনা অনুষ্ঠান, এখানে তো খুঁজি না যে– এটা ফরয কি না, ওয়াজিব কি না। অথচ কত খরচ হয়ে যায় এবং খরচ করে হয় গুনাহ। তারপরও করি। এমনকি ঋণ করে হলেও করে। টাকা নেই, তো ধার নিয়ে করে। ধারকর্জ করে যদি গুনাহ করতে পারি, তাহলে ধারকর্জ করে নেকীর কাজ কেন করতে পারব না? আমি এ কথা বলব না– অবশ্যই ধারকর্জ করে হলেও করুন। কিন্তু এতটুকু তো অবশ্যই বলব– ধারকর্জ যদি করতে না হয়, সে ক্ষেত্রে ওয়াজিব না হলেও করুন। আর হিসাব করলে অধিকাংশের উপরই ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ কুরবানীর হিসাব আর যাকাতের হিসাব এক না।

## কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

কুরবানীর হিসাব হল এই– যদি কারো কুরবানীর দিনে তার একান্ত জরুরি ও প্রয়োজনীয় মালামালের বাইরে যা আছে তার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমান হয়, তাহলে তার উপরই কুরবানী ওয়াজিব।

---

১৮২. জামে' তিরমিযী : ১৪৯৩, ১৫৭২

একান্ত জরুরি যে মাল নয়, এমন মাল প্রত্যেকের ঘরে অনেক আছে। যেমন কারো পোশাক। পোশাকের ইসলামী মাপকাঠি হলো তিন সেট। এক সেট সার্বক্ষণিক কাজকর্মের জন্য, যারা অফিস আদালতে যায়, অফিস আদালতের জন্য। আরেক সেট হল মেহমানদের জন্য। আরেক সেট হল জুমুআ আর ঈদের জন্য। এই তিন সেট। এর বেশি হলে সেটাই বেশি। আজকালকার হিসেবে না হয় ধরলাম কারো পাঁচ সেটই দরকার, যেহেতু বিলাসিতা বাড়ছে। কিন্তু অনেকের জামা পাঁচ সেট কি; দশ সেট, পনেরো সেট, বিশ সেট। তাহলে এ দশ সেটের উপরে যা, বা পাঁচ সেটের উপরে যা, এ সবই তো তার অতিরিক্ত। এগুলোর দাম হিসাব করতে হবে। এমনিভাবে টেলিভিশন কারো দরকার নেই। এটা একটা ফালতু জিনিস। এটা কোনও জরুরি জিনিস না। এটারও দাম ধরতে হবে। তারপরে অনেকের ঘরে শোপিস থাকে। একটা শোকেস আছে, তার ভেতরে শোপিস। ওইগুলো কেবলই সাজানোর জন্য, বিশেষ কোনও কাজের জন্য নয়। এগুলো কোনও কাজের জন্য নয়, কেবলই দেখানো। এরকমের জিনিস একেকজনের ঘরে পাঁচ দশ বিশ পঞ্চাশ হাজার, এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকার পর্যন্ত আছে। কারো কারো বাড়িতে ওয়ালজুড়ে শোকেস দেখা যায়, পুরোটা ভর্তি শোপিস। এবং ওই সমস্ত শোপিসের অনেক দাম। ওর একেকটা পিসের দাম কয়েক হাজার টাকা। কারো কারো শোকেসে পঞ্চাশ লক্ষ টাকারো বেশি মূল্যের শোপিস থাকে। এগুলো সব অতিরিক্ত। ওটা বাদ দিলাম, ওতে তো অনেক টাকা। কিন্তু আমাদের মতো যারা সাধারণ, তাদেরও দেখা যাবে শোকেসের মধ্যে শোপিস আছে। এটা অতিরিক্ত মাল। কেউ বাড়ি কেনার জন্য জমি কিনেছে। সেখানে এখনো বাড়ি করেনি। ওই জমিটা পড়ে আছে। সে ভাড়া বাড়িতে থাকছে। আজকাল তো এক কাঠা জমির দামও পাঁচ-দশ-বিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকা। গুলশানে এক কাঠা জমির দাম বিশ-পঁচিশ কোটি টাকা। যাই হোক, জমি কিনেছে, এখনো সে তাতে বাড়ি করেনি; জমি আছে পড়ে। ওই জমিরও হিসাব করতে হবে। যদি ওই জমির দাম তিন লাখ টাকা হয়ে যায়, তাহলে তো তার জন্য হজ্জও ফরয। কারণ সে তো আর রাস্তায় থাকছে না। যে-কোনও জায়গায় তো থাকতে পারছে। কাজেও ঐটাও হিসাব করতে হবে। তো

এরকমের পড়ে থাকা জমি অনেকেরই আছে। সুতরাং কুরবানী ওয়াজিব অধিকাংশ মানুষের উপরই।

কুরবানী ওয়াজিব নয় এমন লোক খুব কম। এমনকি যারা ভিক্ষা করে, এদের অনেকের উপরও কুরবানী ওয়াজিব। রিকশাচালক যে, সে মনে করছে– আমি রিকশা চালাই, আমার কিসের কুরবানী? তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব হতে পারে। কাজেই আলেম-উলামার সঙ্গে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া উচিত যে, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব কি না। যদি ওয়াজিব হয়ে থাকে আর তা না করে, তাহলে তো কঠিন গুনাহ। আবার অনেকে আছে এমন, যাদের তেমন কিছু নেই। অনেক টাকার ঋণ। লাখ লাখ টাকার ঋণ। আবার থাকছে এমন বাসায়, যে বাসার ভাড়াই হচ্ছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা। দেখা যায়, তার অতিরিক্ত টাকা নেই, বরং ঋণ আছে। হিসাব করলে তো দেখা যাবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু আমার কথা হলো– আপনি এমন আলিশান বাসায় থাকছেন, আর নিশ্চয় ওই রকমের বাজার করেন, ওই রকমই খরচ করেন, সুতরাং দুনিয়ার বিষয়ে এত যখন খরচ করতে পারছেন, নেকী কামাই করার জন্য কেন করতে পারবেন না? ওয়াজিব না হলেও তারও উচিত এ সুযোগ গ্রহণ করা। কারণ কুরবানীর সময় পার হয়ে গেলে এক হাজার গরু জবাই করলেও ওই নেকী পাওয়া যাবে না, যে নেকী কুরবানীর সময় হয়তো সাত ভাগের এক ভাগে দিলে পাওয়া যায়। সাত ভাগের এক ভাগও যদি দেয়, তাহলে এক ভাগের মধ্যে কতগুলো পশম আছে? ওই সমস্ত পশমের দশ গুণ নেকী সে পাবে। এ তো বিশাল ব্যাপার। কাজেই আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে সবারই উচিত কুরবানী দিতে উৎসাহী হওয়া। এ সুযোগকে হাতছাড়া করা কিছুতেই উচিত নয়।

## বাবা-মায়ের নামে কুরবানী

অনেকে বলে, কুরবানী বাবার নামে, মায়ের নামে, জীবিত বা মৃত কারো নামে দেওয়া যাবে কি না? সবার নামেই দেওয়া যাবে। আসলে এগুলো হলো কি, কুরবানী যার উপর ওয়াজিব সে যদি কুরবানী দেয়,

তাহলে যার নামেই দিক না কেন, কুরবানী তার পক্ষ থেকেই আদায় হয় আর ছাওয়াবটা পায় যার নাম দেওয়া হয় সে। যেমন আমি দাদার নামে কুরবানী দিয়েছি। এখন অনেকে বলছে, তোমার নিজের উপর কুরবানী ওয়াজিব, দাদার নামে কেন দিবে? আসলে নিজের নামে না দিয়ে যদি দাদার নামে দেয়, তাহলে কুরবানী তারই হয়, শুধু ছাওয়াবটা দাদার হয়। কথা হল এই– এ ছাওয়াবটা দাদার নামে বখশিশ করা হল। কুরবানী তার হল আর ছাওয়াব দাদার হল, তাতে তার লাভ কী হল? সে তো ছাওয়াব পেল না। লাভ হল কী? এতেও লাভ আছে। লাভ হল এই– যদি সে না দিত তাহলে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হত। এখন সে গুনাহ থেকে বেঁচে গেল। ওয়াজিব তরকের গুনাহ থেকে বাঁচল। তো যে-কারো নামেই কুরবানী দেওয়া যায়। আর এখানেও অনেকে ভুল একটা কথা প্রচার করে। সেটা হল এই যে, কুরবানী হয় আল্লাহর নামে। দাদার নামে নানার নামে আবার কী? না; এ সমস্ত ভুল কথা।

## গরুতে বেজোড় সংখ্যক শরীক হওয়া জরুরি নয়

যদি এক গরুতে সাতজন দেয় তাহলে তো ঠিকই আছে। একটা প্রচার আছে এরকম– এক গরুতে শরীক হতে পারে তিন জন, পাঁচ জন, সাত জন। এরকম কোনও কথা নেই। এক গরুতে একজন থেকে নিয়ে সাতজন পর্যন্ত যে কোনও সংখ্যায় শরীক হতে পারে। দু'জন হতে পারে, তিনজন হতে পারে, চারজন হতে পারে এবং পাঁচ-ছয় জন হতে পারে। বেজোড় হওয়া জরুরি না। বেজোড় হতে হবে এমন কোনও কথা নেই।

আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হল– অনেকে এমনই করে যে, ছয়জনের নামে ছয় ভাগ। আর ছয় জনে মিলে দেয় আরেকটা অতিরিক্ত ভাগ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে। এটা সঠিক তরীকা না। ছয় জনের ছয় ভাগই হল। ছয় জনে মিলে সাত ভাগ হয় না। যদি সাত ভাগ দিতে চায়, তাহলে তার তরীকা

ভিন্ন। সেটা হল– ওই অতিরিক্ত যে এক ভাগ, সে এক ভাগের টাকা কোনও একজন বহন করবে। ওই একভাগের টাকা কোনও একজন দেবে। সপ্তম ভাগটা একজন দেবে। অথবা এমন হতে পারে যে, ছয়জনে দিল, কিন্তু ছয়জন দেওয়ার পরে সে ছয়জনের টাকাটা কোনও একজনকে দিয়ে দেবে। দেওয়ার পরে এখন সে ওই টাকার মালিক হয়ে গেল। এখন অতিরিক্ত ওই সপ্তম ভাগটা তার নামে হলো। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে দিল।

## কুরবানীর সঙ্গে আকীকা

কুরবানীর ভেতরে কেউ আকীকা দিতে পারে কি না? দিতে পারে। ছয়জন কুরবানী দিল, একজন আকীকা দিল। এভাবে দেওয়া যায়। কিংবা দুই জন আকীকা দিল বা তিনজন আকীকা দিল আর বাকিরা কুরবানী দিল। অথবা একজনে কুরবানী দিল আর ছয়জনে আকীকা দিল তাও হয়। আকীকা আর কুরবানীর একই নিয়ম। কুরবানীর গোশতের ভাগ-বাটোয়ারার নিয়ম আর আকীকার গোশতের ভাগ-বাটোয়ারার নিয়ম একই রকম।

অনেকে মনে করে– ছেলের নামে বা মেয়ের নামে আকীকা দিলে সেটা বাবা-মা খেতে পারে না। এটা ভুল ধারণা। বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন সবাই খেতে পারবে। এমনকি যার নামে আকীকা দিল সেও খেতে পারবে। এটা সবার জন্য হালাল এবং এটা অনেক বরকতের গোশত। তবে তো খাওয়াই উচিত।

কুরবানীর গোশত ভাগের বিষয়ে একটা সাধারণ নিয়ম হল– তিন ভাগ করা। তিন ভাগের এক ভাগ গরীবদের দেবে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেবে, আরেক ভাগ নিজেরা রাখবে। কিন্তু এটা কেবলই মুস্তাহাব। এটা ওয়াজিব-ফরয কিছু নয়। যদি নাও দেয়, তাতেও দোষের কিছু নেই।

# কুরবানীর গোশত গরীবদেরকে দেওয়ার সঠিক নিয়ম

ওই যে এক ভাগ গরীবকে দেওয়ার কথা, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে অনেক অবহেলা। কুরবানীর গোশত তিন ভাগের এক ভাগ গরীবকে দেওয়ার মানে কী? এটা আমরা মনে করি ফকীরকে দেওয়া। এজন্য যে সমস্ত ফকীর এসে বাড়িতে লাইন দেয়, আমরা ওদেরকে দিই। গরীবকে দেওয়ার অর্থ এটা নয়। গরীবকে দেওয়ার অর্থ হল– খোঁজ নেওয়া, আমার মহল্লায় কে কে কুরবানী দেয়নি। কেউ কেউ তো কারো কাছে হাতও পাতে না, লজ্জা পায়। এরকম গরীবদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে ওই যে তিন ভাগের এক ভাগ, এটা তাদের বাড়িতে পৌছে দেওয়া। কারণ সে তো আসবে না, সে এসে লাইন ধরবে না। কাজেই ইজ্জতের সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে তার বাড়িতে এ গোশত পৌছে দেওয়া। এ হলো গরীবকে দেওয়ার অর্থ। ওই যে ফকীর-মিসকীনকে দেওয়া হয়, এটা দিলে জায়েয হবে, কিন্তু এটা খুব পছন্দনীয় কাজ নয়; বরং এটা না করাই উচিত। কারণ এটা করার মানেই হল ফকীরকে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করা।

ভিক্ষাবৃত্তি ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। ভিক্ষুক আসলে তাকে ভিক্ষা দিতে বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এ কাজটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এবং ওইখানে লক্ষ্য রাখা জরুরি যে, কে ভিক্ষা করার উপযুক্ত আর কে ভিক্ষা করার উপযুক্ত নয়। যে কামাই-রোজগার করতে পারে, হাত ভালো, পা ভালো, ইচ্ছে করলে খাটতে পারে, ওর জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নেই। যে খেটে খেতে পারে, সে ভিক্ষা করবে কেবল সেদিন, যেদিন সে খাটতেও পারবে না। তার খাওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই, এখন না খেয়ে মরবে, এই অবস্থায় সে ভিক্ষা করতে পারে। তা না হলে খাটবার শক্তি যার আছে, তার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নেই। এদেরকে ভিক্ষা দেওয়া মানে নাজায়েয কাজে উৎসাহিত করা। এজন্য যারা এসে লাইন ধরে– ওদেরকে দিলে ফকীরকে দেওয়া হল বটে, কিন্তু এটা কোনও ভালো বা পছন্দনীয় কাজ নয়। এর একটা ক্ষতি হল এই– এতে করে যে সমস্ত লোক কুরবানী করতে পারেনি এবং কারোও বাড়িতে

গোশতের জন্য যায়নি, ওই লোকগুলো কুরবানীর গোশত খাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। তাহলে কিসের সহমর্মিতা হলো? তিন ভাগের এক ভাগ এর উদ্দেশ্য তো হল ওই গরীবদের প্রতি সহমর্মিতা। সে সহমর্মিতা তো হল না। তিন ভাগের এক ভাগ শেষ করে দিলাম ফকীরদেরকে দিয়ে দিয়ে। আর প্রকৃতই যাদের দেওয়া উচিত ছিল তারা পেল না। কাজেই ফকীরকে দেওয়ার এটা একটা ক্ষতিও। এমন হতে পারে যে, ফকীরকে না দিলে গালাগালি করবে। মানুষ খারাপ বলবে যে, দেখো এ কেমন মানুষ! ফকীরকে দেয় না। তা গালাগাল করুক। কিন্তু তাদেরকে না দিয়ে যদি ওই সমস্ত গরীবদের দিই, তাহলে ছাওয়াব অনেক বেশি পাব ইনশাআল্লাহ।

## কুরবানীর পশুর চর্বি বিক্রি করা

আরেকটা ভুল আমরা করি। কুরবানীর চর্বি অনেকের জমানোর অভ্যাস আছে। অনেকেই জমায়। এরপর দু'-চার দিন পরে দেখা যায়, বাড়িতে বাড়িতে চর্বি কেনার জন্য ডাকাডাকি করে। ফেরিওয়ালা আসে। তারা বাড়িতে বাড়িতে যায় চর্বি কিনতে। তারা ওদের কাছে চর্বি বিক্রি করে। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয কাজ। যদি কেউ ওইরকম বিক্রি করে, তাহলে ওই টাকাটা অবশ্যই সদাকা করে দিতে হবে। এ টাকা সে ভোগ করতে পারবে না। দরকার কী? চর্বি যদি বেশি হয়, এগুলো সব বিতরণ করে দিলেই হলো!

## চামড়ার টাকা বিতরণের সঠিক নিয়ম

কুরবানীর চামড়ার যে টাকাটা, এ টাকা তো নিঃসন্দেহে গরীব-মিসকীনের হক। তো আমরা কুরবানীর চামড়া বিক্রি করি। এরপর কী করি? আমাদের মধ্যে আরেকটি খাসলত আছে এই– পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা, এরকম করে করে গরীব-মিসকীনদের দিয়ে দিই, যেহেতু গরীবের হক । তাই এই যে ফকীররা আসে এদেরকে দিই। পাঁচ টাকা, দশ টাকা, বিশ টাকা, এই করে করে দিই। তো এর দ্বারা

কারো কোনও উপকার হল না। এ তো এক রকম ভিক্ষা দেওয়াই হল। ওই ভিক্ষুক তো এমনিতেই আপনার বাড়িতে ভিক্ষা পায়। ভিক্ষুক যদি আপনার বাড়িতে এসে হাত পাতে আর যদি সত্যিকারের ভিক্ষুক হয়ে থাকে, তখন তো তাকে ভিক্ষা দেওয়াটা হক। এক্ষেত্রে কুরবানীর চামড়ার মূল্য যে বিতরণ করা, সেটা হল কই? ভিক্ষুককে তো এমনিতেই ভিক্ষা দিতে হয়। এজন্য এটাকে ভিক্ষা না বানিয়ে প্রকৃত যারা গরীব তাদেরকে এমনভাবে দেওয়া উচিত, যাতে তারা উপকৃত হয়। কাউকে একশ টাকা, কাউকে পঞ্চাশ টাকা, কাউকে দুইশ টাকা। তারা যাতে উপকৃত হয় এভাবে দেওয়া উচিত।

## কুরবানীর চামড়া মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দেওয়া

আজকাল অনেক ২১মাদরাসা থেকে কুরবানীর চামড়ার জন্য মানুষের বাসায় বাসায় যাওয়া হয়। সবচে' ভালো হল– কুরবানীর চামড়াটা ওই সমস্ত মাদরাসায় দিয়ে দেওয়া। কারণ এতে গরীব বেশি উপকৃত হয়। কুরবানীর চামড়া যদি আপনি বিক্রি করেন, তাহলে তো বিক্রি করবেন চারশ টাকা কী পাঁচশ টাকা। যদি কোনও মাদরাসায় দেন, তাহলে ওই মাদরাসাওয়ালারা এটা বিক্রি করবে এক হাজার-দুই হাজার টাকা। তাহলে তো গরীব বেশি টাকা পেল। আপনি বিক্রি করে পাঁচশ টাকা গরীবকে দিলেন। আর মাদরাসায় দিলে গরীবকে দেওয়া হবে এক হাজার, দেড় হাজার, দুই হাজার টাকা। এজন্য কুরবানীর চামড়াকে ভিক্ষার বিষয় না বানিয়ে এটাকে বরং মাদরাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দেওয়াই ভালো। অন্ততপক্ষে কোনও এক গরীবকে দিয়ে দেওয়া, সেটাও ভালো। আমি নিজে বিক্রি না করে কোনও এক গরীবকে দান করে দিলাম– যাও! এ চামড়া তোমাকে দিয়ে দিলাম।

## জবাইয়ের বিনিময়ে চামড়া দেওয়া

যারা কুরবানীর দিন জবাই করে, ওই জবাইয়ের বিনিময়ে কুরবানীর চামড়া দেওয়া জায়েয নয়। এ ভুলটা আমরা অনেকে করি। জবাইয়ের

বিনিময়ে চামড়া দিয়ে দিই। এ সমস্ত মাসআলা আসলে জুমুআর দিন বলার কথা। কিন্তু যেহেতু আমাদের মা-বোনেরা আছেন, তারা তো আর জুমুআর বয়ান শোনেন না, এজন্যই বলা হচ্ছে। তারা তাদের স্বামীদেরকে, ছেলেদেরকে, ভাইদেরকে বলে দেবে– জবাইয়ের বিনিময়ে যেন চামড়া দেওয়া না হয়। জবাইয়ের বিনিময়ে টাকা দিয়ে দেবে। টাকাই দেওয়া উচিত। যে লোক জবাই করল, তাকে টাকা দেওয়াই ভালো। কারণ টাকা না দিয়ে চামড়া দিয়ে দিলে তা একরকমের বদলাবদলি হয়ে যায়। একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এ থেকে বাঁচার জন্য জবাইয়ের বিনিময়ে তাকে কিছু টাকা দেওয়া। আর কুরবানীর চামড়া যদি তাকে দিই, তাহলে ফী সাবীলিল্লাহ দিয়ে দেওয়া, বিনিময় হিসাবে নয়।

## কুরবানীর নিয়ত কী হবে?

এ তো গেল মাসআলা। বাকি কুরবানী সম্পর্কে আমি যে আয়াত পড়লাম, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবানীর গোশত-রক্ত কিছুই পৌঁছে না; আল্লাহর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। আল্লাহভীতি, পরহেজগারি, এটাই আল্লাহর কাছে পৌঁছে। কুরবানীর ক্ষেত্রে এটা খুব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা অনেকেই কুরবানী দিই মানুষকে দেখানোর জন্য। কুরবানী না দিলে কেমন হয়, মানুষ কী বলবে, কিংবা কুরবানীর দিন কুরবানী না দিলে ছেলেমেয়েরা গোশত খাবে কী করে? নানা রকমের নিয়ত থাকে। এগুলো ভুল নিয়ত। কুরবানী দেওয়া হবে কেবলই আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার জন্য, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নত পালন করার জন্য। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নত কী? ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বললেন তার ছেলেকে কুরবানী করতে। স্বপ্নের মাধ্যমে বললেন। এমনিতে তো কোনও মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা জায়েয নয়। আর ছেলেকে হত্যা করা, সে তো প্রশ্নই আসে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি হুকুম করেন, তখন কুরবানী করা জরুরি হয়ে যায়। তাহলে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শ হল এই– আমার মনে

কী চায়, কোনটা আমার মায়া লাগে, দরদ লাগে ওইটা কোনও বিষয় নয়; বিষয় হল আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ যখন যে হুকুম করেন, আমার মন মানুক আর না মানুক, সর্বাবস্থায় সে হুকুম পালন করা। এটাই হল ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শ। ছেলে কুরবানী করার মতো কঠিন একটা বিষয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে গেছেন। তিনি গলায় ছুরি চালাবেন প্রস্তুত হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ

সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল।[১৮৩]

এখনই জবাই করে দেবেন। এ অবস্থায় হুকুম আসল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। ইবরাহীম! হুকুম পালন হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ

আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।[১৮৪]

আল্লাহ পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, পরীক্ষায় তিনি পাশ করেছেন। আল্লাহর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে– জবাই করানো হবে। তিনি আল্লাহর হুকুম পালনে কতটা প্রস্তুত তাই দেখার ছিল। তো দেখা গেল এই– তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত। এই কুরবানী দ্বারা আমাদের শিক্ষা হল এই– আমার মন মানুক বা না মানুক, সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুম পালনে প্রস্তুত থাকব। পর্দা করতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু শরীয়তের হুকুম পর্দা করা। কাজেই মন মানুক আর না মানুক, আমি পর্দা করব। আমার মনে চায়

---

১৮৩. সূরা সাফফাত : ১০৩

১৮৪. সূরা সাফফাত : ১০৪-১০৬

না– যে আত্মীয় আমাকে কষ্ট দিয়েছে এখন আবার তার বাড়িতে যাব। তাকে দেখতে যাব, আমার মন চায় না। কিন্তু শরীয়তের হুকুম– তোমার আত্মীয় তোমার সাথে যেমন ব্যবহারই করুক না কেন, তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক রক্ষা করতেই হবে। কাজেই মন না চাইলেও আমি তার কাছে যাব, তার খোঁজ-খবর নেব। একজনের সাথে ঝগড়া হয়েছে। আমার মনে চায় না তার সাথে কথা বলতে। শরীয়তের হুকুম, তার সাথে কথা বলতে হবে। সুতরাং মনে না চাইলেও তার সাথে কথা বলব। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শ এই– মনে কী চায়, তা কোনও কথা নয়; আল্লাহর কী হুকুম, সেটাই বিষয়। এটাই তাকওয়া। আল্লাহ বলেন–

وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে।[১৮৫]

কুরবানীর গোশত-রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না। গোশত তোমরা নিজেরা খাও। আল্লাহ দেখেন তোমাদের পরহেজগারি। সুতরাং এ কুরবানীর শিক্ষা নিয়ে আমরা জীবনের সব জায়গায় পরহেজগার হয়ে চলব। আল্লাহর যখন যে হুকুম আসে, অকাতরে সে হুকুম মানতে চেষ্টা করব। তাহলেই আমাদের কুরবানী দেওয়া সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সহীহ নিয়তের সঙ্গে কুরবানী দেওয়ার এবং কুরবানীর শিক্ষানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।



১৮৫. সূরা হজ্জ : ৩৭



# কুরবানীর শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবনে তার প্রয়োগ

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَآؤُهَا وَ لٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ

"আল্লাহর কাছে তাদের গোশত পৌঁছে না আর তাদের রক্তও না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াই পৌঁছে। এভাবেই তিনি এসব পশুকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন বলে। যারা সুচারুরূপে সৎকর্ম করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও।"[১৮৬]

---

১৮৬. সূরা হজ্জ : ৩৭

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার খাস মেহেরবানীতে আমরা আমাদের জীবনে আরো একটি ঈদুল আজহা উদযাপন করার সুযোগ পেয়েছি। এই ঈদের আগে আল্লাহ তাআলার বহু বান্দা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে। তাদের পক্ষে এই ঈদের ফযীলত লাভ করা সম্ভব হয়নি। কুরবানীর কী ছাওয়াব, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। মাঝখানে দুই মঙ্গলবার আমাদের ছুটি গেল। এর মাঝখানে কুরবানী চলে গেছে। তো আমরা সবাই সরাসরি নিজে কুরবানী দিই বা না দিই, কুরবানীর আনন্দে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি। কুরবানী চলে গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই– আমরা কুরবানী থেকে কী শিক্ষা নিয়েছি? যেহেতু কুরবানীর পরে আজকে আমাদের এই প্রথম মজলিস, তাই মনে করছি এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হওয়া উচিত, যাতে আমাদের জীবনে কুরবানী অর্থবহ হয়ে থাকে। আমরা যেন সারা জীবন অন্ততপক্ষে আগামী কুরবানীর আগ পর্যন্ত কুরবানীর শিক্ষা নিয়ে চলতে পারি।

কুরবানীর শিক্ষা তো বহু কিছু। আজকে একটা বিষয় নিয়েই কথা বলব। আমাদের বাংলা ভাষায় আমরা কুরবানীর অর্থ করে থাকি– ত্যাগ স্বীকার করা। যদিও আরবীতে কুরবানীর হুবহু অর্থ তা না। কুরবানীর অর্থ এমন কিছু কাজ করা, এমন উপায় অবলম্বন করা, যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ যা দ্বারাই হয় তাই কুরবানী। তবে যেহেতু কুরবানীর ভেতর ত্যাগের একটা বিষয় আছে, তাই আমরা কুরবানীর অর্থ করি 'ত্যাগ করা', 'ত্যাগ স্বীকার করা'। কুরবানী দিলে সম্পদ ত্যাগ করতে হয়। মানুষের কাছে তার সম্পদের মুহাব্বত অনেক বেশি। টাকা-পয়সার প্রতি মানুষের ভালোবাসা অনেক গভীর। সে গায়ে কষ্ট করে। নানানভাবে কষ্ট করে দুই টাকা বাঁচানোর জন্য। ফার্সীতে একটা কথা আছে–

দোস্ত! তুমি যদি আমার জানটা চাও, জান দিয়ে দেব। কিন্তু তুমি যদি টাকা চাও, তাহলে কথা আছে।

টাকা সহজে ছাড়তে রাজি নয়। ডাক্তার দেখায় না টাকা বাঁচানোর জন্য। ডাক্তার না দেখানো মানে কী? নিজের জানের ক্ষতি করা। টাকা

খরচ হয়ে যাবে এ ভয়ে ওষুধ খায় না। তার মানে জানটা দিতে রাজি, টাকা ছাড়তে রাজি না। কুরবানী দিলে টাকা ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগ করা, ছাড়া, একই অর্থ। তাহলে কুরবানী অর্থ ত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

আমরা যে কুরবানী দিই, তা শুরু হয়েছে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বিশাল এক ত্যাগ করেছিলেন। অত বড় ত্যাগ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে কঠিন; বরং সম্ভবই না। যদিও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেকে ওই জাতীয় ত্যাগও করে। সেটা ঠাণ্ডা মাথায় করে না; শয়তানের ফাঁদে পড়ে করে। যেমন পত্র-পত্রিকায় আসে, আবার শোনাও যায়– কোনও কোনও মা নিজের সন্তানকে বাদ দিয়ে দিয়েছে এবং বাদ দিয়ে আরেকজনের পেছনে চলছে। কিংবা বাবা তার সন্তানকে ছেড়ে দিয়ে নতুন কারো পেছনে ছুটছে। বাবার ঘটনাও শোনা যায়, মায়ের ঘটনাও শোনা যায়। এটা হলো শয়তানের ধোঁকা। তখন তো পাগল থাকে, মাথা ঠিক থাকে না। কোনও মহিলা যখন কোনও পুরুষের কিংবা কোনও পুরুষ কোনও মহিলার চক্করে পড়ে যায়, তখন সে পুরোদমেই পাগল। তখন কী করে না করে, তার কোনও ঠিকানা থাকে না। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় এ জাতীয় কাজ কেউ করতে পারবে না। নিজের সন্তান! তার পেটের সন্তান হোক বা ঔরসজাত সন্তান হোক, এ সন্তানকে ত্যাগ করা ঠাণ্ডা মাথায় কখনো সম্ভব না। কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে জবাই করার হুকুম হলো। ব্যস, তিনিও জবাই করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। আল্লাহ যদি না থামাতেন তাহলে তো জবাই করেন ফেলতেন। ওই যে একটা গল্প বলা হয়– ছুরি চালিয়েছেন কিন্তু কাটেনি, পরে পাথরের উপর ছুঁড়ে মেরেছেন আর পাথর দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল! এগুলো কেচ্ছা। এগুলো সঠিক কথা না। সঠিক কথা হল এই– তিনি ছুরি চালাতে যাবেন, অমনি আল্লাহর হুকুম এসেছে–

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّه لِلْجَبِيْنِ 0 وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۰ قَدْ صَدَّقْتَ
الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۰ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ

> সুতরাং (সেটা ছিল এক বিস্ময়কর দৃশ্য) যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল। আর আমি তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।[১৮৭]

ইবরাহীম থামো! তুমি হুকুম পালন করে ফেলেছ। তোমাকে জবাইয়ের হুকুম করেছিলাম আর তুমি হুকুম পালন করেছ। এভাবে যদি আল্লাহ তাঁকে না থামাতেন, তবে তো জবাই হয়েই যেত। কাজেই তাঁর দ্বারা আল্লাহর হুকুম পালন হয়ে গেছে। এই যে আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ সন্তানের ভালোবাসা ত্যাগ, এটা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তবে কুরবানী থেকে এ শিক্ষা নিতে হবে। যেহেতু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কুরবানী থেকেই পশু কুরবানী শুরু হয়েছে, তাই পশু কুরবানী– এ যেন সন্তান কুরবানী। কাজেই এর থেকে ওই ত্যাগের শিক্ষা নিতে হবে। আমরা ত্যাগ করতে পারি না। আমার মনে যেটা চায়, আমি যা পছন্দ করি, আমরা সহজে ওইটা ছাড়তে পারি না।

## দুনিয়ার অশান্তির বড় কারণ

দুনিয়ায় যত অশান্তি, যত ফাসাদ ঘরে-বাইরে, এর একটা বড় কারণ এই যে, আমি যা পছন্দ করি তা ছাড়তে রাজি না। আমি যা ভালোবাসি ওইটা যদি ছাড়তাম, তাহলে অশান্তি জগতে অনেক কমে যেত। স্বামী-স্ত্রী যুদ্ধ লেগে যায়– স্বামীর পছন্দ একটা, স্ত্রীর পছন্দ আরেকটা। এখন কেউ ছাড়তে রাজি নয়। স্বামী চায় তার পছন্দেরটা হোক, স্ত্রী চায় তার পছন্দেরটা হোক। এখন কেউ নিজ পছন্দ ত্যাগ করতে রাজি নয়। যদি কোনও একজন তার পছন্দ ত্যাগ করে, তাহলে গন্ডগোল মিটে যায়। কিন্তু না, বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী।

---

১৮৭. সূরা সাফফাত : ১০৪-১০৬

এক তিল জমি আমি দেব না যুদ্ধ ছাড়া। দুই ভাইয়ের ভেতর গন্ডগোল এই নিয়ে যে, একটা তালগাছ দুই ভাইয়েরই পছন্দ। কোনও ভাই তা ছাড়তে রাজি নয়। ওই যে বলে–

বিচার মানি, কিন্তু তালগাছটা আমার

তালগাছ ছাড়ব না। বিশেষ করে আমাদের বরিশাল অঞ্চলে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের ওই অঞ্চলে তালগাছ বেশি। আর তালগাছের উপকারিতা অনেক। তালগাছের অনেক দাম। খুব শক্ত হয়ে থাকে। অনেক দাম। বিশ, পঁচিশ, ত্রিশ, চল্লিশ হাজার টাকা ভালো একটা তালগাছের দাম হয়ে যায়। এর কাঠ অক্ষয়। তারপর তাল নানানভাবে খাওয়া যায়। তো তালগাছ ভাগে সীমানার মধ্যে পড়েছে। এখন দুই ভাই চায় তালগাছটা তারই হোক। কেউ ছাড় দিতে রাজি নয়। কাজেই দুই ভাইয়ের মধ্যে কোন্দল ছাড় দিতে না পারার কারণে, ত্যাগ স্বীকার করতে না পারার কারণে। বাড়ির দুই ভাই। দুজনেরই দাবি দক্ষিণের দিকে আমি নেব। কেউ ছাড়তে রাজি নয়। ব্যস, এ নিয়ে কোন্দল।

নমিনেশন একজন পাবে। একই দলের দুজনেরই দাবি আমাকে দেওয়া হোক। দুজনেই দাবিদার। কেউ ছাড়তে রাজি নয়। ফলে দেখা যায়, একজনকে দেওয়া হয় আরেকজন বিদ্রোহী হয়। এই যে গন্ডগোল হয়ে গেল। এরপর এ দুই গ্রুপের মাঝে মারামারি হানাহানি।

পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব জায়গায় কোন্দল মারামারি হানাহানির একটা বড় কারণ হল– কেউ ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়। যদি একজন ত্যাগ স্বীকার করত, তাহলে এ মারামারি হয় না। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র পরিসর থেকেই শুরু করি!

আমাদের পারিবারিক জীবন। স্বামী স্ত্রী বাবা মা ভাই বোন নিয়ে একটি পারিবারিক জীবন গড়ে উঠে। অধিকাংশ পরিবারের মধ্যেই নানা রকম অশান্তি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সমস্ত অশান্তির পেছনে এটাও একটা বড় কারণ। একজনের একটা ইচ্ছা হয়েছে, আর তার বিপরীত ইচ্ছা

আরেকজনের হয়েছে। দুজনের কেউ আপন ইচ্ছা ত্যাগ করতে রাজি নয়। বাবা এক দিকে, মা এক দিকে, স্বামী এক দিকে, স্ত্রী এক দিকে। এক ভাই এক দিকে, অপর ভাই আরেক দিকে। ভাই এক দিকে, বোন আরেক দিকে। ভাবী এক দিকে, ননদ আরেক দিকে। শাশুড়ি এক দিকে, পুত্রবধূ এক দিকে। কেউ ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়। এ থেকেই দুই জনের মধ্যে, এরপর দুই জন থেকে পুরো পরিবারের মধ্যে গন্ডগোল লেগে যায়।

কেবলই কুরবানী সারলাম আমরা। একদম তাজা এখনও। এখনও মানুষের ঘরে ঘরে কুরবানীর গোশত রান্না হয়। কিন্তু এ কুরবানীর গোশত রান্না হচ্ছে, কুরবানীর গোশত খাওয়া হচ্ছে, আবার এর মধ্য দিয়েই ত্যাগ স্বীকার না করার যুদ্ধ চলছে! কুরবানী থেকে কী শিক্ষা নিল যে, এখনই স্বামী-স্ত্রী কিংবা ভাই-ভাইয়ে গন্ডগোল? কেউ ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি নয়। অথচ কেবল তাজা কুরবানী শিখিয়ে গেল– ত্যাগ স্বীকার করো। তাহলে কি কেবল গোশত খাওয়াই সার? কুরবানী তো কেবল গোশত খাওয়ার জন্যই নয়; তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। যদি ত্যাগ স্বীকার করতেই না পারি, তাহলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হবে না। ত্যাগ স্বীকার করলাম না তার মানে কী? এর মানে হচ্ছে আমার মনের যা কাম্য আমি সেটা নিয়ে নিলাম। আমি যা চাই তা তো নিয়েই নিলাম। আল্লাহর কাছে আর কী পাব? আল্লাহর কাছে কিছুই থাকবে না। ওদিকে আল্লাহর কাছেও কিছু পেলাম না, আবার পারিবারিক জীবনেও অশান্তি ডেকে আনলাম। আখিরাতও গেল, দুনিয়াও গেল।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ

> এরূপ ব্যক্তি দুনিয়াও হারায় এবং আখিরাতও। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।[১৮৮]

দুনিয়া গেল, আখিরাতও গেল, সর্বহারা হয়ে গেলাম। সুতরাং আমাদেরকে কুরবানীর এই বড় শিক্ষা নিয়ে জীবনে চলতে হবে যে,

---

১৮৮. সূরা হজ্জ : ১১

ত্যাগ স্বীকার করব। একজনে বলে ঝোল খাব, আরেকজন বলে শুকনো খাব। দুই জনের দুই রুচি। একজন বলে মিষ্টি খাব, আরেকজন বলে ঝাল খাব। একজন বলে এসি ছাড়ব, আরেকজন বলে এসি ছাড়ব না। একজনের এসি না ছাড়লে কষ্ট হয়, আরেকজনের ছাড়লে কষ্ট হয়। যখনই কোনও এক বিষয়ে দুই জনের দুই মত দাঁড়ায়, দুই জনের দুই রুচি দাঁড়িয়ে যায়, দুই জনের দুই চাহিদা দাঁড়িয়ে যায়, তখন একজন ত্যাগ স্বীকার করব।

## ত্যাগ স্বীকার করবে কে?

প্রশ্ন হল এই– ত্যাগ স্বীকারটা কে করবে? কে তার ইচ্ছাটা ছাড়বে? স্বামী ছাড়বে না স্ত্রী ছাড়বে? ভাবী ছাড়বে না ননদ ছাড়বে? শাশুড়ি ছাড়বে না পুত্রবধূ ছাড়বে? কে নিজের ইচ্ছাকে ত্যাগ করবে? কী এ প্রশ্নের জবাব? দুই জনের দুই মত, দুই অভিরুচি, দুই চাহিদা। এখন একজন যদি তার ইচ্ছাটাকে ছাড়ে, তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সে ছাড়টা কে দেবে? কে এ ত্যাগ স্বীকার করবে? আমাদের অবস্থা হল এই– যেমন ভাই বোনদের মধ্যে বণ্টনের একটা ঘটনা। সেখানে ভাইয়েরা বোনদেরকে ঠকাচ্ছিল। সেখানে কোনও আলেম শরীআতের নিয়ম বললে তারা মানতে রাজি হয় না। ভাইদের কেউ নসীহত করে– আরে! একজনের তো ছাড়তে হবে। একজনের তো ত্যাগ করতে হবে। না হলে গন্ডগোল মিটবে কী করে? তার মানে কী? এ ভাই নসীহত কী করছে? কাকে করছে? করছে তো বোনকে, বোন যেন ত্যাগ স্বীকার করে। সে তো বোনকে ঠকাচ্ছে। আলেম বলল, না, ঠকানো কেন? যেহেতু এখানে সবাই মিলে বসা হয়েছে, সে হিসেবে শরীআত মোতাবেক বন্টন করা হোক। সে তখন বলছে– কাউকে তো ছাড়তে হবে। তার মানে বোন ছাড়ুক। এটা কেবল সে ভাইয়ের অবস্থা যে তা নয়; আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাই তাই। আমরা প্রত্যেকেই আপন জায়গায় নিজের মতে অটল থেকে কামনা করি, অপরজন যেন ছাড় দেয়, অপরজন যেন ত্যাগ স্বীকার করে। ফলে ত্যাগ স্বীকার করা কারোই হয় না। তাই গন্ডগোল থেকেই যায়। হয় কী? শক্তি যার বেশি,

দাপট যারটা বেশি, তারটা কার্যকর হয়। যার দাপট কম তারটা কার্যকর হয় না। ফলে সে মনে মনে গুমড়ে মরে। তার অন্তরে ক্ষোভ এবং হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। ফলে ওইখানে আর শান্তি থাকে না। এ মনোভাব ছাড়তে হবে। ত্যাগ অমুকে স্বীকার করুক, আমি নই; আমি আমার আপনা জায়গায় থাকি– এ মানসিকতা ছাড়তে হবে।

তাহলে ত্যাগ স্বীকার করবে কে? ত্যাগ স্বীকার করবে প্রত্যেক 'আমি'। আমি। অমুকে নয়, অন্যজন নয়, আমি। অন্যজন কী করল না করল, আমার তা দেখা বিষয় নয়। আমি ত্যাগ স্বীকার করব। ভাই বলবে– আমি ত্যাগ স্বীকার করব। বোন কী করল না করল তা আমার দেখার বিষয় নয়। ত্যাগ স্বীকার আমি করব। অনুরূপ বোনও বলবে– না, তা হবে না, ত্যাগ আমি স্বীকার করব। ভাই কী করল না করল তা আমার ব্যাপার নয়। ত্যাগ স্বীকার করব আমি।

## প্রয়োজন নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবা

দুইটা দিকে নজর দিলে ত্যাগ খুব সহজ হয়ে যায়। একটা হচ্ছে– নিজের ক্ষুদ্রতা, নিজের হীনতার দিকে নজর দেওয়া যে, আমি তো ক্ষুদ্র, আমি হীন, আমি পাপী, আমি ঘোর পাপী। ভাই এবং বোনের মধ্যে ভাই ভাববে– আমি বেশি পাপী। বোন ভাববে, আমি বেশি পাপী। আমি বেশি ছোট। আমি ক্ষুদ্র। আমি যেহেতু ক্ষুদ্র, আমার তো ক্ষুদ্রটাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। স্বামী বলবে– আমি বেশি পাপী। স্বামী হয়েছি তো কী হয়েছে, গুনাহগার আমি বেশি। আমি বেশি ক্ষুদ্র। আমার ক্ষুদ্রটাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের বুযুর্গানে দীনের মধ্যে এমন ঘটনা বহু আছে। একজনের ঘটনা আছে এমন। শায়খ আহমাদ রিফাঈ রহ.। যখনই খেজুর খেতে বসতেন, তখন সবচে' নিকৃষ্ট যে খেজুর তাতে হাত দিতেন। যখন সবাই মিলে বাদাম খেতে বসি তখন কী করি? সবচে' ভালো বাদামটায় হাত দিই। প্রত্যেকে ভালোটায় হাত দিই। বেছে বেছে ভালোটা নিই। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি বেছে বেছে মন্দটা নিতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল– লক্ষ করা গেছে যে, আপনি

সবসময় সবচে' নিকৃষ্টটাতেই হাত দেন। ব্যাপারটা কী? উনি বললেন, এ মজলিসে, এ জামাতে সবচে' নিকৃষ্ট হলাম আমি। কাজেই আমার তো নিকৃষ্টটাই নেওয়া উচিত। আমি নিকৃষ্ট। উৎকৃষ্টটায় তো আমার অধিকার নেই। উৎকৃষ্টটা উৎকৃষ্টজন নিক। আমি যেহেতু নিকৃষ্ট, তাই নিকৃষ্টটাতেই আমি হাত দিতে পারি।

আমরা প্রত্যেকে যদি নিজের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, আমার থেকে নিকৃষ্ট আর ক্ষুদ্র আরে কেউ নেই। কাজেই ছাড় তো আমারই দেওয়া উচিত। যদি এমন হয় যে, মজলিসে আমরা দুইজন-তিনজন আছি, সেখানে চেয়ার একটা। তখন আমরা কী করি? মনে করি, আমার থেকে তার মর্যাদা বেশি। তাই চেয়ারটা তার জন্যই ছেড়ে দিই আর আমি নিচে বসি। এই তো করি! চেয়ার যদি একটা থাকে, তখন আমি যাকে আমার থেকে সম্মানী মনে করি তার জন্য চেয়ারটা ছেড়ে দিই আর আমি নিচে বসি। ঠিক ওরকম পারিবারিক জীবনে বা সমাজজীবনেও যদি আমি মনে করি যে, সবার মধ্যে আমি সবচে' নিকৃষ্ট কাজেই আমার তো নিকৃষ্ট আর নিচেরটাই নেওয়া উচিত, উৎকৃষ্টটা উৎকৃষ্টজন নিক, তবে ছাড়ও দেওয়া হল আর ঝামেলাও মিটে গেল। এবং এটা মনে করতেই হবে। যদি আল্লাহর নৈকট্য কেউ চায়, আল্লাহকে খুশি যদি কেউ করতে চায়, তাহলে নিজেকে হীন ক্ষুদ্র ভাবতেই হবে। নিজেকে উৎকৃষ্ট ভাবা, নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবা, এটা হিংসাত্মক। নিজেকে সেরা-উত্তম ভাবা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কাজেই ঘরের প্রত্যেকে যদি এরকম ভাবে অর্থাৎ স্বামী যদি ভাবে আমি নিকৃষ্ট, স্ত্রী যদি ভাবে আমি নিকৃষ্ট, ননদ যদি ভাবে আমি ছোট, ভাবী যদি ভাবে আমি ছোট, এভাবে প্রত্যেকে যদি নিজেকে ক্ষুদ্র ও ছোট ভাবে, তাহলে প্রত্যেকের জন্য ছাড় দেওয়া সহজ হয়ে যায়।

## দুনিয়ার তুচ্ছতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া চাই

ছাড় দেওয়া সহজ হয়ে যায় আরেকটা জিনিস ভাবলে। সেটা হল এই– আমি যে জিনিস ছাড়তে রাজি নই, সেটা হল দুনিয়ার জিনিস। হয়তো

টাকা ছাড়তে রাজি নই, ভালো খাবার ছাড়তে রাজি নই, নিজের মতটা ছাড়তে রাজি নই, ভালো পোশাকটা ছাড়তে রাজি নই অথবা সম্পদ ছাড়তে রাজি নই কিংবা ইজ্জত ছাড়তে রাজি নই। আমি যা ছাড়তে রাজি নই সেটা হল দুনিয়ার জিনিস। এ সবই দুনিয়ার জিনিস।

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

অথচ আখিরাত কত বেশি উৎকৃষ্ট ও কত বেশি স্থায়ী।[১৮৯]

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া নিকৃষ্ট, দুনিয়ার তুলনায় আখিরাত উৎকৃষ্ট। আমি যদি এ নিকৃষ্টটা ছাড়তে পারি, তাহলে আখিরাতের উৎকৃষ্ট জিনিস পেয়ে যাব। আমি তো আখিরাতই চাই। আমরা মুমিন, আখিরাত বিশ্বাস করি এবং সেখানে নাজাত চাই। জান্নাতে পৌঁছতে চাই। জান্নাতের নিআমত চাই। জান্নাতের নিআমতের তুলনায় দুনিয়ার নিআমত কোনও হিসাবেই আসে না। এটা একেবারে ফালতু। আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া এত ক্ষুদ্র এত তুচ্ছ যে, দুইয়ের মধ্যে কোনও তুলনা চলেই না। আমরা তো ওই হাদীছ পড়েছি যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

আল্লাহর কাছে দুনিয়ার মূল্য যদি একটা মশার ডানার বরাবর হত, তাহলে আল্লাহ তাআলা কোনও কাফেরকে এক ঢোক পানি পান করতে দিতেন না।[১৯০]

তাহলে দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে মশার ডানার চেয়েও কম।

একটা মরা কানকাটা ছাগল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলে ধরলেন আর বললেন, তোমরা এটা কে নেবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা এমনিই কানকাটা, তাও আবার মরা।

---

১৮৯. সূরা আ'লা : ১৭

১৯০. জামে' তিরমিযী : ২৩২০, ২৪৯০

এটা জ্যান্ত থাকলেও কেউ নিতে চাইত না, যেহেতু খুঁত আছে। মরাটা কে নেবে? বললেন, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর থেকেও বেশি হীন, এরচেয়েও তুচ্ছ।[১৯১] তাই আমরা কেন সেই তুচ্ছ দুনিয়া নিয়ে কামড়াকামড়ি করব!

## ছাড় দেওয়া সাহাবায়ে কেরামের বিশেষত্ব

দুনিয়াকে যদি ছাড়তে পারি, তাহলে এর বিনিময়ে আখিরাতে যে নিআমত পাব তার মূল্য আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এ তো আমাদের ঐতিহ্য। নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে এ কালের বুযুর্গানে দীন পর্যন্ত সবাই ছাড় দিয়েই এসেছেন। ছাড় দেওয়াই আমাদের বুযুর্গদের বিশেষত্ব। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ছাড়ই দিতেন। মাশওয়ারায় নিজের মতকে ছেড়ে দিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মতকে গ্রহণ করেছেন, এমন তো কত ঘটনা আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপরীতে কোনও উম্মতি, সে যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন, আবূ বকর রাযি.-এর মতো ব্যক্তিই হোক না কেন, তার মতের কিই বা মূল্য আছে? কিন্তু তারপরও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কত ক্ষেত্র এমন হয়েছে, যেখানে নিজের মত ছেড়ে সাহাবায়ে কেরামের মত নিয়েছেন। ছাড় দিয়েছেন। যখন গনীমতের মাল বন্টন করা হত, সবাইকে দিয়ে নিজের ভাগে কিছু থাকত না। আবূ বকর সিদ্দিক রাযি., উমর ফারূক রাযি.-এর জীবন তো এমনই গেছে। সমস্ত সাহাবী ছাড় দিয়ে চলেছেন। ত্যাগ স্বীকার করেন চলেছেন। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। আনসারদের সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

১৯১. সহীহ মুসলিম : ২৯৫৭

> তাদেরকে তারা নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব-অনটন থাকে। যারা স্বভাবগত কার্পণ্য হতে মুক্তি লাভ করে, তারাই তো সফলকাম।[১৯২]

তাদের বিশেষত্ব ছিল এই– নিজের একান্ত চাহিদার বিষয়টাকেও ছেড়ে দিতেন অন্যের স্বার্থে। অন্যে কী করল না করল, সেদিকে তাদের নজর ছিল না। আমার কী করণীয়, সেটাই তারা দেখতেন। অন্যে তাকে কষ্ট দেয় আর তিনি তাকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করেন। সারা ইতিহাস আমাদের এরকমেরই।

আপন করিতে খুঁজিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর..

এ ছিল সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র। বুযুর্গানে দীন যারাই হয়েছেন, আব্দুল কাদের জীলানী বলেন বা আবূ ইয়াযীদ বোস্তামী বলেন, জুনায়দ বাগদাদী হোক বা আমাদের দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবিরে দীন, সব তো এরকমেরই ছিলেন। তারা অন্যের আরামের জন্য নিজের সুবিধায় ছাড় দিতেন।

## মাওলানা সায়্যিদ আসগার হুসায়ন রহ.-এর ঘটনা

সায়্যিদ আসগার হুসায়ন রহ.-এর ঘটনা তো বিস্ময়কর। সায়্যিদ আসগর রহ. মাটির ঘরে বাস করতেন। মুফতি শফী সাহেব রহ. তাঁর ছাত্র। তিনি দেখেন, উস্তাদ প্রতি বছর তার ঘর সংস্কার করেন। একদিন বললেন, হযরত! প্রত্যেক বছর আপনি ঘর সংস্কার করেন। বৃষ্টিতে নষ্ট হয়। মাটির ঘর ধুয়ে যায়। আপনি যদি ঘরটাকে পাকা করতেন, তাহলে প্রত্যেক বছর সংস্কারের ঝামেলা হত না! তাঁর জানা আছে যে, ঘর পাকা করার মতো টাকা হযরতের আছে। চাইলেই ঘরটাকে পাকা করতে পারেন, সে টাকা তাঁর আছে। তাই তিনি বললেন– আপনি এ ঘরটাকে কাঁচা রেখেছেন আর প্রতি বছর সংস্কার করেন, কিন্তু যদি ঘরটাকে পাকা করে ফেলতেন, তাহলে আর আপনাকে

---

১৯২. সূরা হাশর : ৯

বারবার সংস্কারের ঝামেলা পোহাতে হয় না! জবাবে তিনি বললেন, মিয়া মুহাম্মাদ শফী! তোমার তো অনেক বুদ্ধি, মা শা আল্লাহ! তোমার তো বুদ্ধি বেশ! হযরত রহ. এরকম বার বার বলছেন। শেষে মুফতি সাহেব বুঝেছেন যে, তার মনঃপূত হয়নি আমার কথাটা। পরে বললেন, হযরত আমি আসলে জানতে চেয়েছিলাম যে, পাকা করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আপনি কেন কাঁচা রেখেছেন? বললেন, এসো। এ বলে তিনি ঘরের দরজায় নিয়ে দাঁড় করালেন আর বললেন, এ গলির এ মাথা থেকে ও মাথা তাকাও। তাকিয়ে দেখো তো কী দেখা যাচ্ছে! উনি দু'দিকেই তাকালেন। বললেন, কী দেখেছ? কোনও পাকা ঘর দেখা যায়? বললেন, না! গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত সব ঘর কাঁচা। বলো এখন, সব ঘর কাঁচা, এ অবস্থায় আমি যদি আমার ঘরকে পাকা করি তাহলে সেটা কেমন দেখা যাবে? সবাই কাঁচা ঘরে বাস করে আর আমি যদি এখানে একটা পাকা ঘর তৈরি করি, সেটা কেমন হবে বলো? কেমন দেখা যাবে? উনি বললেন, হযরত আমার বুঝে এসেছে।

এই যে দেখুন, অন্যের খারাপ লাগবে যে, আমাদের ঘর কাঁচা। এর জন্য তিনি ছাড় দিয়েছেন। চাহিদায় ছাড় দিয়েছেন। নিজের অর্থের সুবিধা ভোগে ছাড় দিয়েছেন। ত্যাগ স্বীকার করেছেন। চাইলেই ঘর পাকা করতে পারেন, কিন্তু তাও করছেন না। ত্যাগ স্বীকার করেছেন অন্যের খাতিরে। আমরা তো আশা করতে পারি না যে, এত বড় হব। এ তো বিশাল মনের দরকার। অত বড় ত্যাগের জন্য বিশাল মনের দরকার। অত বড় নাই বা হোক, কিন্তু ক্ষুদ্র ত্যাগ তো করতে পারি! যেই ত্যাগ করলে আমার কোনও ক্ষতি নেই, কেবল লাভ আর লাভ এবং যা করলে দুনিয়াতেও শান্তি পাব আর আখিরাতেও আল্লাহ তাআলার কাছে অফুরন্ত নিআমত লাভ করতে পারব, আমরা সেই ত্যাগ কেন স্বীকার করব না?

বিশেষ করে এ পারিবারিক জীবন, স্বামী-স্ত্রী, শাশুড়ি-পুত্রবধূ, ননদ-ভাবী, ভাই-ভাই, ভাই-বোন, বাবা-মা, এই যে পরিমণ্ডলটা, এর প্রত্যেক সদস্যের লক্ষ্য হবে একটাই যে, আমি ছাড় দেব, আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকব না। আমি যদি ছাড় দিতে পারি, তাহলে আমি দুনিয়ায়

শান্তি পাব এবং আখিরাতেও আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পাব। ব্যস, এ দুটো দিক যদি লক্ষ্য করি, তবে আমার জন্য ছাড় দেওয়া সহজ, যে ছাড় দিলে আমার দুনিয়া আখিরাতে দু' জায়গাতেই লাভ। আর ছাড় তো আমারই দেওয়া উচিত। যেহেতু আমি একজন পাপী, নিকৃষ্ট বান্দা, তাই ছাড় আমিই দেব। যদি এভাবে চিন্তা করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ ছাড় দেওয়া সহজ হবে এবং দুনিয়া আখিরাত দু' জায়গাতেই সাফল্য আমার পদচুম্বন করবে। কুরবানী আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছে যে, তোমরা ছাড় দিতে অভ্যস্ত হও। ছাড় দেওয়াকে তোমার জীবনের বৈশিষ্ট্য বানাও। ইনশাআল্লাহ তোমার জীবন গড়ে যাবে, জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে সে তাওফীক দান করুন।



# আশুরার শিক্ষা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ . فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

"(হে মানুষ!) তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদের যে-কোনও কষ্ট তার জন্য অতি পীড়াদায়ক। সে সতত তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত সদয়, পরম দয়ালু। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে রাসূল! তাদেরকে) বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। তারই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের মালিক।"[১৯৩]

১৯৩. সূরা তাওবা : ১২৮-১২৯

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

হাদীছে আছে– যেদিন আমলের ওজন করা হবে সেদিন সবচে' বেশি ওজন হবে উত্তম চরিত্রের।[১৯৪] সবচে' পূর্ণাঙ্গ মুমিন, পরিপূর্ণ মুমিন সেই লোক, যার আখলাক-চরিত্র ভালো। নফল নামায-রোযা থেকেও বেশি ফযীলত লাভ হয়, যদি আখলাক-চরিত্র ভালো করা যায়।

## মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের এক উদ্দেশ্য

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের দুনিয়ায় আগমনের একটা কারণ বলেছেন– যাতে মানুষের ভেতর উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। তিনি ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ

> আমাকে পাঠানো হয়েছে এ উদ্দেশ্যে, যাতে মানুষের ভেতর ভালো চরিত্রের বিকাশ ঘটানো যায়।[১৯৫]

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের বড় অবহেলা। আমাদের অনেক কিছুতেই অধঃপতন হয়েছে। নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীতে অধঃপতন। যেভাবে ইবাদত-বন্দেগী করা দরকার ছিল সেভাবে করছি না। আকীদা-বিশ্বাসের বিষয়েও আমাদের অনেক অবহেলা। তবে সবচে' অধঃপতন বেশি হয়েছে আমাদের আখলাক-চরিত্রে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত আখলাক, যেসব চরিত্র শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক বড় কম। তার কোনওটিই আমাদের ভেতরে পরিপূর্ণরূপে নেই। বরং যেসমস্ত চরিত্রের নিন্দা করেছেন, সেগুলোই আমাদের মধ্যে বেশি। এ অবস্থায় আমরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারব না।

---

১৯৪. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৭৯৯; জামে' তিরমিযী : ২০০২

১৯৫. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা : ২০৫৭১, ২১৩০১

আমরা যদি নিজেদের আখলাক-চরিত্র ভালো না করি, তাহলে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য খুব বেশি এগিয়ে যেতে পারব না। আখলাক-চরিত্রের বিষয়ে খুব বেশি বেশি নজর দেওয়া দরকার। আখলাক-চরিত্রের তো বিভিন্ন দিক আছে। তার মধ্যে একটা হলো বিনয়। বিনয়-নম্রতা। অর্থাৎ নিজেকে বড় মনে না করা; বরং ছোট মনে করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিনয়ের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দিয়ে গেছেন। অহংকারী হতে নিষেধ করেছেন। অহংকার কাকে বলে? তিনি ইরশাদ করেন–

الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ، وَغَمْطُ النَّاسِ

অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা, অন্যকে তুচ্ছ করা।[১৯৬]

নিজের চেয়ে অন্যকে তুচ্ছ, হীন ও ছোট মনে করা আর সত্য মানতে না চাওয়া, এটা হল অহংকার। আমাদের মধ্যে এ অহংকার বড় বেশি, কিন্তু বিনয় বড় কম। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে অহংকার নয়; বরং বিনয়ের গুণ থাকা উচিত ছিল। কেননা অহংকার ইবলীসের চরিত্র আর বিনয় আদম আলাইহিস সালামের চরিত্র। এই যে মুহাররম মাস চলছে, আরবী হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররম, এ মুহাররম মাসই তো আমাদেরকে শেখায়– বিনয়ী হও, অহংকারী হয়ো না। প্রতি বছর মুহাররম মাস ঘুরে ঘুরে আসে এবং আসে অনেক শিক্ষা নিয়ে। তার মধ্যে একটা শিক্ষা এইও যে, তোমরা বিনয়ী হও। কারণ এ মুহাররম মাসেই আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে কে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর জান্নাতে দিয়েছেন এবং তারপর জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় এনেছেন। এটা ঘটেছে মুহাররমের দশ তারিখে, আশুরায়। আশুরা বলতে মুহাররমের দশ তারিখ। এ দশ তারিখের অনেক ফযীলত। এ তারিখেই আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, অতঃপর জান্নাতে দেওয়া হয়েছে।

---

১৯৬. সহীহ মুসলিম : ২৭৫, ৪০৯২

## প্রাণ আছে সব কিছুর

আদম আলাইহিস সালাম কীসের সৃষ্টি? তিনি মাটির সৃষ্টি। মাটির চরিত্রই হল নম্রতা, বিনয়। মাটির উপর দিয়ে মানুষ হাঁটে, পশু-পাখি হাঁটে, মাটি তা সহ্য করে। মাটির উপর নেককার লোকও হাঁটে, বদকার লোকও হাঁটে, মাটি এটা সহ্য করে। মাটির উপর মানুষ চাষাবাদ করে, মাটিকে কষ্ট দেয়, এটাও মাটি সহ্য করে। মাটিরও তো প্রাণ আছে। মাটির প্রাণ না থাকলে মাটির উপর এত কিছু জন্মায় কী করে? মাটির ভেতর প্রাণশক্তি আছে বলেই এতে প্রাণীর জন্ম হয়। মরা জিনিস থেকে তো কোনও কিছু বের হয় না। জ্যান্ত থেকে জ্যান্ত বের হয়। কাজেই মাটিরও প্রাণ আছে। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু আবিষ্কার করেছেন– উদ্ভিদের প্রাণ আছে। জগদীশ চন্দ্র বসু তো এটা সেদিন বলেছেন, কিন্তু তার আগে কুরআনই বলে দিয়েছে– সব কিছুরই প্রাণ আছে। উদ্ভিদ কেন, পাথরেরও প্রাণ আছে। পাথরও আল্লাহর তাসবীহ পড়ে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়। এটা কুরআন মাজীদেই আছে। গাছ-পালা আল্লাহর তাসবীহ পড়ে। এমন কোনও কিছু নেই, যা আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পড়ে না।

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

এমন কোনও জিনিস নেই, যা তাঁর সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ বুঝতে পার না।[১৯৭]

এ মহাবিশ্বে যা-কিছু আছে, সব কিছুই আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পড়ে, হামদ পড়ে, আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ জপে। প্রাণ না থাকলে কী করে জপে?

সব কিছুর প্রাণ আছে। মাটিরও প্রাণ আছে। সে মাটির উপরে মানুষ কত রকমের অত্যাচার করে। কোদাল দিয়ে কোপায়, লাঙ্গল দিয়ে চষে, কুয়ো খনন করে, মলমূত্র ত্যাগ করে এবং আরো কতকিছু করে, কিন্তু মাটি তো সব সহ্য করে। মাটি তো এটা বলে না যে, কেন আমাতে

১৯৭. সূরা বনী ইসরাঈল : ৪৪

তুই মল ফেললি, আমি তোকে গ্রাস করে ফেলব। আমার উপর কেন লাঙল চালাল, আমি আমার ভেতর তাকে নিয়ে নেব, গ্রাস করব। আল্লাহর হুকুম হলে গ্রাস তো করে। যেমন আল্লাহর হুকুম হল– হে মাটি! কারূনকে তোমার ভেতর গ্রাস করে নাও, কারূনকে খেয়ে ফেলো। কেননা কারূন দর্পভরে চলছিল। কুরআন মাজীদে আছে–

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىْ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

অতঃপর (একদিন) সে তার সম্প্রদায়ের সামনে নিজ জাঁকজমকের সাথে বের হয়ে আসল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা (তা দেখে) বলতে লাগল, আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, অনুরূপ যদি আমাদেরও থাকত! বস্তুত সে মহা ভাগ্যবান।[১৯৮]

যাহোক, কারূন যখন দর্পভরে বের হল, মাটি তাকে গ্রাস করে নিল। অনেক অপকর্মই সে করেছে। শেষে আল্লাহ মাটিকে হুকুম দিলেন– মাটি! কারূনকে খেয়ে ফেলো। গ্রাস করো। তাই মাটি ফাঁক হয়ে কারূনকে ভেতরে নিয়ে নিল। বাঁচার জন্য হাত-পা অনেক ছোড়াছুড়ি করেছে। কিন্তু হাত-পা যতই নাড়াচাড়া করেছে, ততই ভেতরে ঢুকেছে। হাদীছে আছে– কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে সে মাটির নীচে দাবতে থাকবে। আল্লাহর হুকুম হলে মাটি গ্রাস করে। সবকিছুই কাজ করে আল্লাহর হুকুম হলে। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনও কিছুই কেউ করতে পারে না। কোনও কিছুই কিচ্ছু করতে পারে না আল্লাহর হুকুম না হলে। আল্লাহর হুকুম যখন হয় তখন মাটিও গ্রাস করে। আবার আল্লাহর হুকুমে মাটি তার পিঠে সব কিছু বহনও করে। আল্লাহর হুকুম হলে আগুন জ্বালিয়ে ফেলে আবার আল্লাহর হুকুম হলে আগুন জ্বালায় না; শান্তি দেয়। সবকিছুই আল্লাহর হুকুমে চলে। তো বলছিলাম– এ মাটি সবকিছু বরদাশত করে।

---

১৯৮. সূরা কাসাস : ৭৯

আদম আলাইহিস সালাম মাটির সৃষ্টি। আদম আলাইহিস সালামের নিজের ভেতরে বিনয় ছিল। সারা জীবন তিনি বিনয়ের আচরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলাও তাকে জান্নাতে দিয়েছেন। সেই জান্নাতে তাঁর দ্বারা একটা ভুল হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলার নীতি হল, তিনি তার বান্দাদের যারা বড়, তাদের ভুলকেও বড় করে দেখেন আর ছোটদের ভুলকে ছোট করে দেখেন। তা না হলে তো আমরা কবে ধ্বংস হয়ে যেতাম! আমরা রোজ কত পাপ করি, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না। আমরা যেহেতু ছোট মানুষ, তাই আল্লাহ আমাদের ভুলকে ছোট করে দেখেন। আর আদম আলাইহিস সালাম যেহেতু বড় মানুষ, তাই ছোট ভুলটাকেও আল্লাহ বড় করে দেখেছেন। তুমি কেন এটা করবে? তুমি আমার এত আদরের, এত সম্মান তোমাকে আমি দিয়েছি, ফিরিশতারা তোমাকে সিজদা করেছে। তোমার দ্বারা কেন ভুল হবে?

## হযরত আদম আলাইহিস সালাম নিষিদ্ধ ফল কেন খেলেন?

আল্লাহ বলেছিলেন এই গাছের ফল খাবে না, কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম তা খেয়ে ফেললেন। ইবলীস আল্লাহর কসম করে বলল, এই গাছের ফল যদি খাও তাহলে জান্নাতে চিরদিন থাকতে পারবে। সে বলল আল্লাহর নামে কসম করে। আল্লাহকে নবীগণ অনেক ভালোবাসেন। সবচে' বেশি ভালোবাসেন। সমস্ত মাখলুকের চেয়ে তারা আল্লাহকেই বেশি ভালোবাসেন। ভালোবাসেন বলেই তো জান দিয়ে দিতে পারেন। ভালোবাসেন বলেই তো আল্লাহর জন্য নিজের ছেলেকে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারেন। যেই আল্লাহকে সবচে' বেশি ভালোবাসেন, সেই আল্লাহর নামে যখন কসম করল, তখন আদম আলাইহিস সালামের এর মনটা গলে গেল। আমি যাকে সবচে' বেশি ভালোবাসি তার নামে কসম করেছে! মহান আল্লাহর নামে কসম করে কেউ মিথ্যা বলতে পারে? তারপর আবার বলছে– এখানে চিরদিন থাকা

যাবে। আল্লাহর কাছে চিরদিন থাকা যাবে, এটা তো লোভের ব্যাপারই। এটা সবারই তো কামনার জিনিস। সারা জীবন সবাই তো আমরা এ কামনাই করি, যাতে আমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। জান্নাতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় হল ঈমান এবং আমালে সালেহ তথা নেক আমল। সুতরাং যখন ইবলীস কসম করল আল্লাহর নামে আর বলল, ফল খেলে আল্লাহর বেশি কাছে থাকতে পারবে, চিরদিন জান্নাতে থাকতে পারবে, তখন তিনিও ভুলে গেলেন ওই হুকুমের কথা। যখন মানুষের ভেতর আবেগ বেশি হয়ে যায়, তখন অনেক কিছুই মনে থাকে না। এজন্য আল্লাহ বলছেনও

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا

আমি ইতঃপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে তা ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা।[১৯৯]

আদম আলাইহিস সালাম ভুলে গেলেন। মানুষ যখন খুব আবেগে এসে যায় তখন অনেক কিছুই তার মনে থাকে না। আর এ তো আল্লাহর নামে কসম করেছে। কসম করেছে পরম প্রেমাস্পদের নামে। আল্লাহ হলেন সবচে' বেশি মাহবুব। সেই মাহবুবের নামে কসম করেছে, তাঁর তো ভোলারই কথা। সুতরাং তিনি ভুলে গেলেন, ফলও খেয়ে ফেললেন।

## হযরত আদম আলাইহিস সালামের বিনয়

উলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এ কাজটা কঠিন পাপ ছিল না। এটা তাঁর ভুল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন ধরেছেন– আদম! কেন করলে, তোমাকে নিষেধ করিনি এ গাছের ফল খেতে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিনয় দেখালেন। যুক্তি দেখালেন না। তর্ক করলেন না। বললেন না যে, হে আল্লাহ! আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমি ইচ্ছা করে করিনি। আল্লাহ! আমি ভুলে গেছিলাম, তাই এটা

১৯৯. সূরা তোয়াহা : ১১৫

খেয়ে ফেলেছি। ইচ্ছা করে তো আর করিনি। আল্লাহ তাআলাও তা-ই বলেছেন–

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا

আমি ইতঃপূর্বে আদমকে একটা বিষয়ে আদেশ করেছিলাম, কিন্তু সে তা ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে পাইনি প্রতিজ্ঞা।[২০০]

আদম ভুল করেছে, ইচ্ছাকৃত করেনি। আমি তার মধ্যে এটার সংকল্প দেখিনি। এটা করবে বলে তার মধ্যে সংকল্প ছিল না। তার মধ্যে আমি ফল খাওয়ার সংকল্প দেখিনি। আর আমাদের কী অবস্থা? আমরা তো সংকল্প করে গুনাহ করি। এক বছর আগে থেকে সংকল্প করি যে, আগামী বছর কী গুনাহ করব! এক সপ্তাহ আগে থেকে চিন্তা করি, আগামী সপ্তাহ কী গুনাহ করব। আমরা যত গুনাহ করি, আগে মনে মনে পরিকল্পনা করি– এ গুনাহটা কেমনে করব, কীভাবে করব, কাকে লুকাব, কেউ যাতে জানতে না পারে সেজন্য কি কি চালাকি করব, আরো কত রকমের পরিকল্পনা করি! কিন্তু আদম আলাইহিস সালামের ভুল হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলাই বলেছেন, ভুল হয়ে গেছে, স্বেচ্ছায় করেনি। মোটকথা আদম আলাইহিস সালামের ভুল হয়ে গেছে, কিন্তু তারপরও তিনি নিজ থেকে এ কথা বলেননি যে, আমার ভুল হয়ে হয়ে গেছে, ভুলে এ কাজ করেছি, মনে ছিল না। কিন্তু আদম আ. নিজে বলেননি, আমি ভুলে করেছি। মনে ছিল না। বরং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাওবা করেছেন, কান্নাকাটি করেছেন যে, হে আল্লাহ! আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আমরা অপরাধ করেছি। তিনি বলতে থাকলেন–

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَٰسِرِينَ

তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সত্তার উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে

২০০. প্রাগুক্ত

ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[২০১]

আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। হে আল্লাহ! অন্যায় করেছি। এটাই হল বিনয়।

## ইবলীসের অহংকার

অপরদিকে ইবলীসকে আল্লাহ বললেন, ইবলীস! বলেছিলাম না সিজদা করতে! করলে না যে? তখন ইবলীস যুক্তি দেখাল। এটা হল অহংকার। অন্যায় হয়ে যাওয়ার পরও স্বীকার না করা, সত্য স্বীকার না করা; বরং সত্যকে অস্বীকার করা– এটাই হচ্ছে অহংকার। সে তো অপরাধ করেছে। তার উচিত ছিল অপরাধ স্বীকার করা। স্বীকার তো করেইনি; উল্টো অপরাধের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়েছে–

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ، خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَه مِنْ طِيْنٍ

সে বলল, আমি তার (অর্থাৎ আদম) চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা দ্বারা।[২০২]

আমি উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে। মাটির চেয়ে আগুন উত্তম। কাজেই আমি তার চেয়ে উত্তম। উত্তম হয়ে অধমকে সিজদা করব? ইবলীস যুক্তি খাড়া করেছে। এ-ই হল অহংকার। পরিণামে–

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

আল্লাহ বললেন, তাহলে তুই এখান থেকে নেমে যা। কেননা তোর এই অধিকার নেই যে, এখানে (থেকে)

---

২০১. সূরা 'আরাফ : ২৩

২০২. সূরা সোয়াদ : ৭৬

অহংকার করবি। সুতরাং বের হয়ে যা। তুই হীনদের অন্তর্ভুক্ত।[২০৩]

আল্লাহ বললেন, বের হও। এখানে অহংকার করবে সে সুযোগ তোমাকে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তাআলা তাকে তাড়িয়ে দিলেন। তাই তার নাম হয়েছে 'রজীম' – বিতাড়িত।

## আদম আলাইহিস সালামের বিনয়ের পুরস্কার

আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা তাড়িয়ে দেননি; বরং তাকে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। যাও! পৃথিবীতে যাও। জান্নাতে স্থায়ী বাস তো চেয়েছিলে, আর সে লোভেই তো ফল খেলে। شَجَرَةَ الْخُلْدِ – স্থায়ী নিবাসের বৃক্ষ, এ গাছের ফল খেলে স্থায়ীভাবে থাকা যাবে সে লোভেই তো খেয়েছিলে। ঠিক আছে! তোমাকে আমি স্থায়ী বসবাসের সুযোগ করে দিলাম। পৃথিবীতে যাও। সেখানে গিয়ে আমার হুকুমমতো চলতে থাকো। এক সময় জান্নাতে ফিরে আসবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

অতঃপর তোমাদের কাছে আমার পক্ষ হতে যদি কোনও হিদায়াত পৌঁছে, তবে যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখগ্রস্ত হবে না।[২০৪]

তিনি আরো বলেন–

فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

তাদের কোনও ভয় থাকবে না, তারা দুঃখও করবে না।[২০৫]

এক সময় সোজা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। এরপর আর বের হয়ে যাওয়ার ভয় থাকবে না। আর কোনও দুঃখ থাকবে না। জান্নাত থেকে যে

---

২০৩. সূরা আরাফ : ১৩

২০৪. সূরা তোয়াহা : ১২৩

২০৫. সূরা বাকারা : ৩৮, ৬২

একবার বের হয়েছিলে, সেই দুঃখ আর থাকবে না। এ ভয়ও থাকবে না যে, আবার কিনা বের হতে হয়। একবার বের হতে হয়েছে আবার কিনা বের হতে হয়, এ দুশ্চিন্তাও থাকবে না। অনন্তকাল জান্নাতে থাকতে পারবে। তো তিনি এত পুরস্কার লাভ করলেন বিনয়ের কারণে।

## ইবলীসের অহংকারের পরিণাম

আর ইবলীস অহংকার করেছে। আর অহংকার করার কারণে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বিতাড়িত হয়েছে। আমরা পড়ি–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

যখনই কিছু তিলাওয়াত করি বা যখনই কোনও খারাপ চিন্তা আসে কিংবা যখনই শয়তান ধোঁকা দেয়, তখন পড়ি–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

'বিতাড়িত শয়তান' থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

'বিতাড়িত শয়তান'। রজীম মানে বিতাড়িত, যাকে তাড়ানো হয়েছে। আর الرَّجْمُ মানে তাড়ানো। সেখান থেকেই পঠিত হয়েছে رجيم অর্থাৎ বিতাড়িত। আদম আলাইহিস সালামকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তাঁকেও জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাড়ানোর জন্য নয়; বরং যে আশায় ফল খেয়েছিলেন সে আশা পূরণের জন্য। যাতে জান্নাতে অনন্তকাল থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যই এমন করা হয়েছে। এটা হল বিনয়ের পুরস্কার আর ওটা হল অহংকারের শাস্তি।

তো এই যে একজনকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, আরেকজনকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফলে উভয়েই দুনিয়ায় এসেছে, কিন্তু উভয়ের কর্মপদ্ধতি থেকেছে ভিন্ন ভিন্ন। আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ায় এসেছেন এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবনযাপন করেছেন। আর ইবলীস দুনিয়ায় এসেছে এবং যে শয়তানি

সে করে এসেছে, সেই শয়তানি এখানেও করে গিয়েছে। অনন্তকাল সে শয়তানিই করতে থাকবে।

## এক পাপ আরো অনেক পাপের দিকে টানে

মনে রাখতে হবে– এক পাপ আরেক পাপের উস্কানি দেয়। বিশেষত যদি অহংকারজনিত পাপ হয়। যে পাপ করা হয় অহংকারের কারণে, সে পাপ কেউ করে ফেললে একের পর এক তা করতেই থাকে। তার ওখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে যায়। অহংকার বড় খারাপ জিনিস। এ অহংকারের লানত, অভিশাপ একের পর এক চলতেই থাকে। এটা খুবই খারাপ জিনিস। আমরা কেউ যেন কখনো অহংকারে পড়ে না যাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রহমত করুন। মাফ করুন। সুপথে থাকার তাওফীক দিন। অহংকার বিপথগামিতার একটা বড় কারণ। বিশ্বের সবাই আমাকে আমীর বলবে, আমাকে আমীর হতে হবে, এটাই তো অহংকার। আমি তো হব মামুর। আমি তো থাকব সবার পায়ের নীচে। সবার মাথার উপরে কেন? মাথার উপরে থাকার খাহেশ বড় খারাপ জিনিস। কাউকে মাথার উপর থাকার খাহেশে পেয়ে গেলে তার দ্বারা একের পর এক অপরাধ হতে থাকে। একের পর এক কথা বলছে, এক ভুল প্রথমে করেছে, এখন ভুল আস্তে আস্তে আরো বিস্তার হচ্ছে। নতুন নতুন এমন এমন ভয়ানক কথা বলতে থাকে, যার পরিণতি খুব শুভ হয় না। অহংকারী ব্যক্তি নবী-রাসূলকেও ছাড়ে না। নবী রাসূল আলাইহিমুস সালামের সাথেও তারা বেয়াদবি করে ফেলে। আর এর পরিণতি বড় অশুভ হয়ে যায়। অহংকারী লোক পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে। নতুন নতুন কথা বলার চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য তো সবার মাথার উপরে থাকা। নতুন নতুন কথা বললেই মানুষ মনে করে মহাপণ্ডিত। আর তাতে মাথার উপরে আসন পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। তাই বলি– অহংকার বড় খারাপ জিনিস। অহংকারকে কখনো মনে জায়গা দিতে নেই। এজন্যই তো হাদীছে বলা হয়েছে– যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার আছে, সে বেহেশতে যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ

সুতরাং অণু পরিমাণ, বিন্দু পরিমাণ অহংকার যার অন্তরে আছে সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।[২০৬]

জান্নাতে যাওয়া আটকে যাবে। তো বলেছিলাম– আশুরাও ঘুরে ঘুরে আসে আমাদেরকে চরিত্র শেখাতে, নেক আখলাক শিক্ষা দিতে। আমরা আশুরা বলতে মনে করি কারবালার ঘটনা। এটা একটা ভুল ধারণা। আশুরা আসলেই, মুহাররম আসলেই আমরা মনে করি, আশুরার মর্যাদা কারবালার কারণে। আশুরা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা অনেক।

## হিজরী মাস ও বছর বলতে না পারা লজ্জাজনক

সর্বপ্রথম কথা হল এই– আশুরা অর্থ কী? 'আশুরা' হল দশ তারিখ। 'আশার' মানে দশ। আশুরা হলো মুহাররমের দশ তারিখের নাম। এখন মুহাররম মাস চলছে। এটা কোন মাস? মুহাররম হিজরী সনের যে বারো মাস তার প্রথম মাস। তার মানে এটা যখন মুহাররম, তার মানে হিজরী একটা বছরের প্রথম মাস। আমাদের অনেকেই হিজরী মাসের নামগুলো জানি না। যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে মুহাররমের পরে কী মাস? হয়তো তা টেনেটুনে বলতেও পারে। কেননা মুহাররমের পরে সফর, এটা তো সোজা, সহজেই মনে থাকে। মুহাররম, সফর, এর পর কী? এখন প্যাঁচে পড়ে যাবে। রবীউল আওয়াল এর আগে-পরে কী মাস, তা তো মুখস্থ নেই।

ইংরেজি তো ফটফট করে বলে ফেলে। কিন্তু ওইরকম আরবী মাসগুলোর নাম বলতে পারে না। তাও যদি কোনও রকমে টেনেটুনে বলে, কিন্তু হিজরী কোন বছর শেষ হল, কোন বছর শুরু হল, এটা যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে সবাই হা করে থাকবে। মাথা চুলকাতে শুরু করবে। এটা কী আবার? কোন বছর শুরু হল, কোন বছর শেষ হল, এটা তো চিন্তা করিনি কখনো। এ প্রশ্ন করবে কেউ, ভাবিনি। আমাদের ঈমান বড় নিস্তেজ। একজন মুমিন-মুসলিম কেন তার আরবী হিজরী

২০৬. সহীহ মুসলিম : ২৭৬

মাস-বছর বলতে পারবে না? আসলে ইংরেজি বছর বলতে কোনও বছর নেই। এ হল খ্রিষ্টীয় বছর। মানে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম থেকে যে সাল গণনা করা হয়েছে, এটাকে বলে খ্রিষ্টীয় বছর। এটাকে আরবীতে বলা হয় মীলাদী। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম থেকে এ সাল গণনা করা হচ্ছে। এখন চলছে ২০১৯। এটা হল খ্রিষ্টীয় বছর, ইংরেজি বছর না। আর ওর বিপরীতে আরবী বছর না, হিজরী বছর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করেছেন, সে সময় থেকে যে সালের গণনা, ওইটাকে বলা হয় হিজরী বছর।

এখন চৌদ্দশ কত শেষ হল? কে পারবে? হিজরী ১৪৩৯ বছর শেষ হয়েছে। আর চল্লিশতম বছর শুরু হল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত যখন লাভ করেছেন, তার তেরো বছর পর থেকে এ সাল গণনা শুরু হয়েছে। মানে তিনি নবুওয়াত পেয়েছেন আরো তেরো বছর আগে। আর তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে হিজরত করার কত বছর পর? দশ বছর পর। নবুওয়াত লাভের তেইশ বছর পর। কিন্তু হিজরতের দশ বছর পর তার ওফাত হয়েছে। এগুলো তো সবার সবসময় থাকতে হবে মাথায়। জিজ্ঞেস করলেই বলে ফেলবে। এসব বিষয়ে জানার আগ্রহ আমাদের বড় কম। এজন্য জিজ্ঞেস করলে মাথা চুলকানো শুরু করি।

## আশুরার ফযীলত আবহমান কাল থেকে

হিজরী ১৪৩৯ শেষ হয়ে চল্লিশতম বছর শুরু হয়েছে। সারা পৃথিবীতে যখন নতুন বছর শুরু হয়, তখন কী হালচাল মচে যায়। খ্রিষ্টীয় বছর যখন শুরু হয় তখন রাত্রে যন্ত্রণায় ঘুমানো যায় না। আর বাংলা বছর শুরু হলে পরের দিন ঢাকা শহরে কী শুরু হয়ে যায়! কিন্তু আরবী বছর শুরু হওয়ায় শেষ হওয়ায় কোনও খবরই থাকে না। আমাদের ঈমানের দুর্বলতা, চেতনার নিস্তেজভাবের কারণে এমন হয়। এক ভুল তো হল এই, বছরের নাম জানি না, তার সংখ্যা জানি না আর মাসের নাম জানি না। এরপরে মুহাররম বলতেই আমরা মনে করি কারবালা। এটা

তো একটা মারাত্মক ভুল। বলেছিলাম, এর ফযীলত শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। বলা হয়ে থাকে আদম আলাইহিস সালামের জন্ম, দুনিয়ায় দাখিল হওয়া, জান্নাত থেকে দুনিয়ায় আসা, এসব দশ তারিখে হয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সঙ্গী যারা জাহাজে ছিল, তারা এদিন জাহাজ থেকে নেমে এসেছেন। 'জুদী' নামক এক পাহাড় আছে ককেশাস অঞ্চলে। 'জুদী' পাহাড়ে তাঁর জাহাজ ভিড়েছিল এ তারিখে। তবে এগুলো কোনওটাই বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত না। সহীহ সূত্রে এটা প্রমাণিত যে, এ তারিখে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তারা যখন মুক্তিলাভ করেছেন, তখন তারা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এদিন রোযা রেখেছেন। নিআমতের শুক্‌র আদায়ের একটা পন্থা রোযা রাখা; আনন্দ উল্লাস করা নয়। মিছিল করা, শোভাযাত্রা বের করা, রাস্তায় লাফালাফি করা, হইচই, রঙ ছেটানো, এ সমস্ত কাজ নিআমতের শুকরিয়া আদায় নয়। এগুলো তো গুনাহের কাজ। নিআমতের শুক্‌র আদায় হল মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং অন্য কোনও ইবাদত করা। যেমন নামায পড়া, রোযা রাখা, দান সদাকা করা কিংবা অন্য যে-কোনও ইবাদত করা। এ হলো নিআমতের শুক্‌র। আরেক শুক্‌র হল নিআমতের সঠিক ব্যবহার করা। তো রোযা রাখাও একটা শুক্‌র। যে কারণে নূহ আলাইহিস সালাম রোযা রেখেছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, তারা সবাই রোযা রেখেছিলেন মুহাররমের। তাদের প্রত্যেকের প্রতি বিশেষ কোনও নিআমত বর্ষিত হয়েছিল এ দিনে। তার শুক্‌রস্বরূপ তারা এ দিন রোযা রেখেছিলেন।

মুহাররমের দশ তারিখ কারাবালা থেকে নয়; এর অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। কারাবালার ঘটনার কারণে মুহাররমের মর্যাদা হয়নি; বরং মুহাররমের মর্যাদা হয়েছে সৃষ্টির শুরু থেকেই। সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে মর্যাদা দিয়ে, এ দিবসকে মর্যাদা দিয়ে বানিয়েছেন। এটা আল্লাহ তাআলা করেন। একই ধরণের সৃষ্টি হলে

আল্লাহ তাআলা একের উপর অন্যকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। যেমন, এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলা কত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তার ভেতরে সবার উপরে মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন। আবার কত মানুষ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, তাদের ভেতরে নবীদেরকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। দুনিয়ার কত গোত্র আছে, তার ভেতর কুরাইশ গোত্রকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। সব নবীর ভেতরে আবার কয়েকজন নবী আছেন, যাদের বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা বলেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ

এই যে রাসূলগণ, (যাদেরকে আমি মানুষের ইসলাহের জন্য পাঠিয়েছি) তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।[২০৭]

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেছেন– এই যে নবীগণ, এদের ভেতর কাউকে আমি কারো উপর বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, এদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আবার সবার উপরে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

একই জাতীয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা একের উপর অন্যকে মর্যাদা দেন। এটা আল্লাহ তাআলার নিয়ম। পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, সবার উপর আরব দেশের মর্যাদা। পৃথিবীতে কত ঘর আছে, সবার উপর কাবা ঘরের মর্যাদা। পৃথিবীতের আরো যত ঘর আছে, তার মধ্যে মসজিদের বিশেষ মর্যাদা। আবার সমস্ত মসজিদের ভেতর কাবা ঘরের বিশেষ মর্যাদা। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কত কিতাব আসমান হতে নাযিল করেছেন, তার মধ্যে কয়েক কিতাবের বিশেষ মর্যাদা আছে। কত ভাষা আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়েছেন, তার মধ্যে আবার

---

২০৭. সূরা বাকারা : ২৫৩

আরবী ভাষার বিশেষ মর্যাদা আছে। ঠিক সেরকমেরই, আল্লাহ তাআলা অনেক মাস সৃষ্টি করেছেন, সে মাসের ভেতর রমাযান মাসের বিশেষ মর্যাদা। আল্লাহ তাআলা অনেক দিন সৃষ্টি করেছেন, সে দিনসমূহের ভেতর আশুরার মর্যাদা শ্রেষ্ঠতম।

## মুমিন ব্যক্তির কবীরা গুনাহ থাকার কথা নয়

সব নবী এদিন রোযা রেখেছেন। এক সময় এ রোযা ফরয ছিল। রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পর আর এ রোযা ফরয থাকেনি। কিন্তু নফল আকারে এখনও আছে। অনেক ফযীলত এর। যদি কেউ আশুরার রোযা রাখে, তাহলে এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। এক বছরের গুনাহ, মানে এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হয়। কবীরা গুনাহ তো মুসলমানের থাকা উচিত না। কবিরা গুনাহ তো মুসলমানের থাকেই না। থাকে কী? থাকে সগীরা গুনাহ। কেন? কত গুনাহই তো আমরা করি, কত বড় বড় গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে কেন কবীরা গুনাহ থাকে না? থাকে না এজন্য যে, যে ব্যক্তি মুমিন-মুসলিম, তার যখন গুনাহ হয়ে যাবে, তখন আবার আরামে ঘুমিয়ে থাকবে এ হতে পারে না। মুমিনের গুনাহ হয়ে যাওয়া হল শরীরে কাদা লাগার মতো। রাস্তায় হাঁটছে আর হঠাৎ চিৎপটাং হয়ে পড়ে গেল, এরপর কি সে শুয়ে থাকে? শুয়ে থাকে না; বরং তাড়াতাড়ি উঠে যায় আর লক্ষ করে কেউ দেখল কিনা। যাতে কেউ না দেখতে পারে, সেজন্য আগে আগেই ঝেড়েঝুড়ে সাফ হয়ে যায়। কাদা লাগলে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে, যাতে কেউ দেখে না ফেলে। কত তাড়াতাড়ি ধুয়ে সাফ হওয়া যায় সে চেষ্টা করে। জামা-কাপড়, শরীরে যেমন কাদা লাগে, ঠিক ওইরকম আত্মায় কাদা লাগার একটা ব্যাপার আছে। গুনাহ করলে আত্মায় কাদা লাগে। মানুষের আত্মা আসল। রূহ আসল। শরীরে কাদা লাগলে কেউ দেখার আগে আগে ধুয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি আত্মায় কাদা লাগলে কেউ দেখার আগেই ধুয়ে ফেলা উচিত। যে মুমিন, যে মুসলিম, সে কেউ দেখার আগে তাড়াতাড়ি তা ধুয়ে ফেলবে। আল্লাহ দেখছেন, এ লজ্জাতেই তো সে বাঁচে না। আমি আমার আত্মায় কাদা লাগিয়ে ফেলেছি আর আল্লাহ

দেখেছেন এ লজ্জাতেই তো সে বাঁচে না। আবার ফিরিশতারাও দেখবে, শুধু কি দেখবে; বরং তা তারা লিখবে! কাজেই ফিরিশতারা লেখার আগে আগেই কত তাড়াতাড়ি তা ধুয়ে ফেলা যায়, একজন মুমিন সে চেষ্টা করে। আর আল্লাহ তাআলা একটু সুযোগও দেন। আল্লাহ বলেন, ফিরিশতারা, একটু থামো। দেখো, আমার বান্দা তাওবা করার কথা। মুমিন বান্দা আমার প্রতি ভয় রাখে, আখিরাতের প্রতি ঈমান আছে, তার তো তাওবা করার কথা। একটু অপেক্ষা করো। কাজেই মুমিন যে, সে তো খুব তাড়াতাড়ি তাওবা করবে। গুনাহ ধুয়ে ফেলবে। ব্যস, তাতে তার আর কোনও কবীরা গুনাহ থাকবেই না। সগীরা গুনাহ অলসতায় অবহেলায় হয়ে যায়। অনেক সময় এদিকে খেয়াল থাকে না। কাজেই মাঝেমধ্যে সগীরা গুনাহ হয়ে যায় এবং এগুলো থেকে যায়। আল্লাহ চান, বান্দার গায়ে কোনও রকমের দাগ না থাকুক। এজন্য এ ফযীলতের আমলগুলো দিয়েছেন। এগুলো করলে ছোটখাট কাদা যা লেগে আছে, ওইসব ধুয়ে যায়। তাই আশুরার রোযা যদি কেউ রাখে, তাহলে এক বছর যত সগীরা গুনাহ হয়ে গেছে, আবার তাওবা করা হয়নি, সেগুলো রয়ে গেছে, ওইগুলো সব সাফ হয়ে যায়। কিন্তু কবীরা গুনাহের জন্য তাওবা লাগবে।

## বিধর্মীদের অনুকরণ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব

এ রোযার অনেক ফযীলত। এক বছর কত সগীরা গুনাহ হতে পারে, এই রোযা রাখার দ্বারা এ সব ধুয়ে সাফ হয়ে যায়। এর অনেক ফযীলত। এ ফযীলতের আমল অবশ্যই করা উচিত। তবে আশুরার রোযা একটা না রেখে দুইটা রাখা ভালো– নয় তারিখ আর দশ তারিখ। অথবা দশ আর এগারো। কারণ ইহুদীরাও দশ তারিখ আশুরার রোযা রাখত। আর ইহুদীরা একটা খবিস জাতি। কুরআন মাজীদ তাদেরকে বলেছে–

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ

ওই সকল লোকের পথে নয়, যাদের প্রতি গযব নাযিল হয়েছে।[২০৮]

---

২০৮. সূরা ফাতিহা : ৭

ইহুদীরা হল একটি অভিশপ্ত জাতি। তাই এদের সাথে আমাদের যেন কোনও দিক থেকেই মিল না হয়ে যায়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। সে সতর্কতার অংশ হিসেবেই এ কথা বলেছেন– আশুরার রোযা রাখবে দুইটা। কারণ ইহুদীরা রাখে একটা। একটা রাখলে ওদের সাথে মিল হয়ে যাবে। অন্য জাতির সাথে যাতে মিল না হয় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের সেদিকে লক্ষ নেই। আশুরার এটাও একটা শিক্ষা। ইহুদী-নাসারার সাথে কোনও দিক থেকে মিল না হয়ে যায়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে, ওদের অনুকরণ করবে না। কিন্তু আমরা অন্যদের অনুকরণ করি। দাড়ি কামাই ওদের অনুকরণে। খৃষ্টানরা দাড়ি কামায়, তা দেখে দেখে আমরাও দাড়ি কামাই। খৃষ্টানরা টেবিল-চেয়ারে খায়, তা দেখে আমরাও টেবিল-চেয়ারে খাই। খৃষ্টানরা যেরকমের পোশাক পরে, আমরাও সে রকমেরই পোশাক পরি। খৃষ্টানদের অভিবাদন শিখে আমরা ওইগুলো বলতে শুরু করেছি। ঠিক এভাবে সকাল-সন্ধ্যার আচরণগুলো খৃষ্টানরা যেমন করে, আমরা তেমন করি। খৃষ্টানরা জন্মদিন-মৃত্যুদিন পালন করে, তা দেখে দেখে আমরাও পালন করি। আশুরা শিক্ষা দিতে আসে– তোমরা তোমরাই। তোমরা দুনিয়ার সেরা জাতি। আল্লাহ বলেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ، وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ . مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজে বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। কিতাবীগণ যদি ঈমান আনত, তবে তাদের পক্ষে তা কতই না ভালো হত। তাদের মধ্যে কতক তো ঈমানদার, কিন্তু তাদের অধিকাংশই নাফরমান।[২০৯]

---

২০৯. সূরা আলে ইমরান : ১১০

তোমরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমরা উত্তম। উত্তম হয়ে অধমের অনুকরণ করবে কেন? তোমার লজ্জা নেই? তোমার ভেতরে আত্মমর্যাদাবোধ নেই? তুমি যদি নিজেকে চিনে থাক, যদি লজ্জাবোধ থাকে, তাহলে কোনও বিষয়েই অন্যের অনুকরণ করা তোমার একদমই উচিত না। প্রতি বছর আশুরা আসে আর এ কথা আমাদের শিখিয়ে যায়।

## শেষ কথা

আদম আলাইহিস সালাম মাটির সৃষ্টি। আর মাটির গুণ হল বিনয়। সুতরাং আমাদেরকে বিনয়ী হতে হবে। যদি বিনয়ী হই, তাহলে আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গে, আমাদের বাবার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, আমাদের সঙ্গেও সে ব্যবহার করবেন। আমাদের বাবার ভুল হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলাই শিখিয়ে দিয়েছেন, বলো–

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

> হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজ সত্তার উপর জুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও আমাদের প্রতি রহম না করেন, তবে আমরা অবশ্যই অকৃতকার্যদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।[২১০]

আল্লাহ তাআলা শিখিয়ে দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা বলেছেন আর মাফ হয়ে গেছে। কাজেই আমাদেরও যদি কোনও গুনাহ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলাই আমাদের ভেতরে অনুতাপ-অনুশোচনা জাগিয়ে দেবেন। তাওবা করার জযবা আমাদের অন্তরে দিয়ে দেবেন। ফলে তাওবা করব আর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদি আদম আলাইহিস সালামের গুণ অর্জন করতে পারি, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন সে আচরণ আমাদের সঙ্গেও করবেন। এক তো হল সহজে পাপ আমাদের হবে না। আর যদি হয়েও যায়, তাহলে তিনি যেমন তাওবা করেছেন, আমাদেরও তেমন সরাসরি তাওবা করার তাওফীক লাভ হবে এবং যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাফ করে

---

২১০. সূরা আ'রাফ : ২৩

দিয়েছেন আর তাঁর উপর খুশি হয়ে গেছেন, সেরকম আমাদেরকেও মাফ করবেন, আমাদের উপর খুশি হয়ে যাবেন। আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর 'صَفِيّ', আল্লাহ তাআলার বাছাইকৃত। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর নবুওয়াতের জন্য, নৈকট্যের জন্য বেছে নিয়েছেন। আমরা যদি আদম আলাইহিস সালামের বিনয় অর্জন করতে পারি, আমরাও আল্লাহ তাআলার বাছাই করা মাখলুক হয়ে যাব। দুনিয়ায় আরো কত মানুষ আছে, ওরা কী করল না করল তাতে আল্লাহ তাআলার কিছু আসে যায় না। তারা পাপিষ্ঠদের কাতারে । আল্লাহ তাদের উপেক্ষা করছেন। এরপর একসাথে বেঁধে জাহান্নামে ফেলবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের থেকে বাছাই করে নেবেন। আর বাবাকে যেমন জান্নাত দেবেন ঠিক ওইরকমভাবে সন্তানদেরও জান্নাত দেবেন। আল্লাহ বলেন–

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ مَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۔ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তান-সন্ততিগণ ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুগামী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেব এবং তাদের কর্ম হতে কিছুমাত্র হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের বিনিময়ে বন্ধক রয়েছে।[২১১]

বাবাদের সাথে আমরা যারা পাপিষ্ঠ সন্তান আছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের পাপ ক্ষমা করে করে বাবাদের সাথে আমাদেরকেও জান্নাত দান করবেন। এ গুণ আমাদের অর্জন করতে হবে। কোন গুন? বিনয়। অহংকার ত্যাগ করতে হবে। অহংকার কী? দুটা কথা বলেছিলাম, এক বলেছিলাম, بطر الحق অর্থাৎ অহংকার হল সত্যকে মানতে না চাওয়া। শুধু তর্ক করা। তর্কে জিততে চাওয়া। ঠকতে না চাওয়া। সব কিছুরই উপরে থাকা, এ হল অহংকার। আর غمط الناس – মানুষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। এটাও অহংকার। আমরা অহংকার ছাড়ব এবং বিনয় অর্জন করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

২১১. সূরা তূর : ২১

# মায়েদের চাই আপন দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"অতঃপর সেদিন তোমাদেরকে নি'আমতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (যে, তোমরা তার কী হক আদায় করেছ?)"[২১২]

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি হাদীছই মূল্যবান। একেকটা হাদীছের ভেতরে অনেক মূল্যবান শিক্ষা আছে। একেকটা হাদীছের শিক্ষা এমন– মানুষ যদি তার মূল্য দেয় এবং তা অনুসরণ করে, তাহলে সারা জীবনের সংশোধনীর জন্য এক

---

২১২. সূরা তাকাছুর : ৮

হাদীছই যথেষ্ট। আমরা তো মূল্য দিই না। মনোযোগ দিয়ে শুনিও না। আমলে গরজ বড় কম।

আমরা অনেকেই একটি হাদীছ শুনেছি। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হাদীছ। হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تُنْظَرُونَ إِلاَّ إِلَى فَقْرٍ مُنْسٍ، أَوْ غِنًى مُطْغٍ، أَوْ مَرَضٍ مُفْسِدٍ، أَوْ هَرَمٍ مُفَنِّدٍ، أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزٍ، أَوِ الدَّجَّالِ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

"দ্রুত আমলে লেগে যাও– সাত জিনিস আসার আগেই। তোমরা কি এমন দারিদ্র্যের অপেক্ষায় আছ, যা তোমাদের সব কিছু ভুলিয়ে দেবে? কিংবা এমন প্রাচুর্যের, যা উদ্ধত বানিয়ে দেবে? নাকি অপেক্ষা করছ অক্ষম করে দেওয়া রোগ-বালাইয়ের? কিসের প্রতীক্ষায় তোমরা বসে আছ? বোধ-বুদ্ধির বিলোপকারী বার্ধক্যের নাকি আকস্মিক মৃত্যুর? নাকি নিকৃষ্টতম অদেখা প্রতীক্ষিত দাজ্জালের, কিংবা কেয়ামতের? আর কেয়ামত তো অতি ভয়াবহ, অনেক বেশি তিক্ত।"[২১৩]

হাদীছে নগদ সময়কে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে– তোমরা কিসের অপেক্ষায় আছ? মনে করছ ভবিষ্যতে সময় সুযোগ হলে তারপর আমল করবে? কিন্তু সে সুযোগ যে পাবে তার কী নিশ্চয়তা? হঠাৎ করেই মৃত্যু এসে যেতে পারে। কঠিন রোগ-ব্যাধি দেখা দিতে পারে। আমাদের প্রত্যেকেরই দেখা আছে এটা যে, যুবক বয়সে এমন কোনও কঠিন রোগ দেখা দিল, এরপর আর সে বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। অনেকে স্ট্রোকও করে। কেবল বুড়োদেরই স্ট্রোক হয় এমন তো কোনও কথা নেই, যুবকও করতে পারে। অনেক সময় স্ট্রোক করলে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, চিরদিনের জন্য, একদম মৃত্যু পর্যন্ত শয্যাশায়ী হয়ে থাকে, আর উঠতে পারে না। তো অপেক্ষা করছে

---

২১৩. জামে' তিরমিযী : ২৩০৬

এরকম যে, কোনও রোগ-ব্যাধি হবে আর এরপর আমল করবে। ভাবখানা দেখলে তো মনে হয় এমনই। সুস্থ আছে, কিন্তু আমল করতে চায় না। অনেক সময় এমন অর্থসঙ্কট দেখা দেয়, এমন অভাব-অনটন আসে, তখন ক্ষুধা মেটানোই দায় হয়ে যায়। তাহলে আমল করবে কখন?

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলেরই উচিত নগদ সময়কে কাজে লাগানো। যুবক বয়সে মনে হয় এমন– এখনই কেন? আরো কত সময় রয়ে গেল! কত সময় যে রয়ে গেছে, এর নিশ্চয়তা কী? কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই এখনই কাজে লেগে যাওয়া উচিত। প্রত্যেকের নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝে নেওয়া উচিত। সময়কে কাজে লাগানোর জন্য দরকার হল নিজ দায়িত্ব বোঝা। কোন সময়ের কী দায়িত্ব তা বোঝা। কার কী দায়িত্ব তা বোঝা। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।[২১৪]

এ হাদীছ বলছে– দায়িত্ব সকলেরই আছে। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমার কোনও দায়িত্ব নেই। অনেক সময় আমাদের মা-বোনেরা মনে করেন, আমার আবার কী দায়িত্ব, দায়িত্ব তো পুরুষদের। না, মা-বোনদেরও দায়িত্ব আছে। অনেক বেশি দায়িত্ব আছে। মা-বোনেরা জানেন, তাদের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত। যার পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত, তার কোনও দায়িত্ব নেই? এত বড় মর্যাদা আর কার আছে? নবী-রাসূল ছাড়া এ মর্যাদা আর কার আছে যে, তার পায়ের নীচে সন্তানের বেহেশত? বাবার সে মর্যাদা নেই। শিক্ষকের সে মর্যাদা নেই। রাষ্ট্রপতির সে মর্যাদা নেই। কারোই সে মর্যাদা নেই।

---

২১৪. সহীহ বুখারী : ৭১৩৮

## মায়েদের দায়িত্ব

একমাত্র নারীকে আল্লাহ এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তার পায়ের নিচে তার সন্তানের বেহেশত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে।[২১৫]

এত বড় মর্যাদা যার, তার বুঝি কোনও দায়িত্ব নেই? এটা কী করে হয়? মর্যাদা হয়ই তো দায়িত্বের কারণে। যার যত বেশি দায়িত্ব, যত বড় দায়িত্ব, তার মর্যাদা তত বেশি। মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশি। অনেক বড় দায়িত্ব তার। সেজন্যেই তার এ মর্যাদা। তার দায়িত্ব কী? দায়িত্ব হল এই– যে সন্তানের বেহেশত তার পায়ের নীচে, সে সন্তান কোন পথে চলছে তা দেখা। সে সন্তান জান্নাতের পথে চলছে, না দোজখের পথে চলছে– এটা দেখা মায়ের দায়িত্ব। তার সন্তান যাতে জাহান্নামে না যায়, তার সন্তান যেন জান্নাতবাসী হয়, জান্নাতের পথে যাতে চলে, সে দায়িত্ব মায়ের। এজন্য সন্তান যখন তার গর্ভে আসে, তখন থেকে তার দায়িত্ব শুরু হয়ে যায়। তখন থেকে মা যেমন আমল করবে তেমন আছর তার সন্তানের উপর পড়বে। মা যদি কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতকারী হয়, বেশি বেশি কুরআন পড়ে, তাহলে সন্তানের মধ্যেও তার আছর পড়বে। ওই তিলাওয়াতের নূর তার গর্ভের সন্তানের উপর পড়বে।

## নিজ সন্তানের খাতিরেও হালাল খাওয়া জরুরি

কাজেই যখন তার পেটে সন্তান এসে যায়, তখন থেকেই মায়ের দায়িত্ব শুরু হয়ে যায়। এখন থেকেই সে যেন নিজ আমলের যত্ন নেয়। সে হালাল খাবে। কারণ হারাম খেলে তার আছর সন্তানের উপর পড়বে। এ সন্তান তার পেটে আছে। মায়ের খাদ্যই সন্তানের খাদ্য। মা যা খায়, তার যে পুষ্টি, তার যে শক্তি, তাই সন্তানের কাছে পৌঁছে যায়। কাজেই মাকে হালাল খেতে হবে, কিছুতেই হারাম খাওয়া যাবে না।

---

২১৫. সুনানে নাসাঈ : ৩১০৪

এমনিভাবে যখন সন্তানের জন্ম হয়ে যায় তখন এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই, আমার সন্তান অনেক ছোট, আমার কী দায়িত্ব! তখনও দায়িত্ব আছে। সন্তানকে সে দুধ পান করাবে। সে কী দুধ পান করাচ্ছে, তার যে দুধ তৈরি হচ্ছে তা হালাল খাবারের না হারাম খাবারের, এটা তাকে লক্ষ রাখতে হবে। কোনও অবস্থাতেই হারাম খাওয়া যাবে না। বলতে পারে, হারাম উপার্জন করে স্বামী, এখন আমি কী করব? স্বামীকেও বোঝাতে হবে, স্বামীকে উৎসাহ দিতে হবে। বলতে হবে, আমাদের হালাল উপার্জনে যা হয় আমরা তাতেই সবর করব। আমরা কম খাব। আমরা সস্তা দামের পোশাক পরব। দামি পোশাকের দরকার নেই। তবুও আমরা হালাল খাব, হারাম খাব না। হালাল পরব, হারাম পরব না। স্বামীকে উৎসাহ দেবে। যদি সে হালাল খেয়ে তার সন্তানকে লালনপালন করে, তার দুধ যদি হালাল খাবারের হয়, তাহলে তার আছর ওই সন্তানের উপর পড়বে।

## ইমামুল হারামায়নের ঘটনা

ইমামুল হারামায়ন নামে একজন অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তার বাবা ইমাম জুওয়াইনী। বিশাল বড় আলেম, বুযুর্গ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন– দেখো, আমার সন্তান যেন অন্য কোনও মহিলার দুধ খেতে না পারে। তুমি ছাড়া অন্য কোনও মহিলার দুধ যেন সে পান করতে না পারে, সতর্ক থাকবে। ঘটনাক্রমে একদিন এক মহিলা আসল, তারও বাচ্চা ছিল। সে আদর করে ওই বাচ্চাকে কোলে নিল আর দুধ খাওয়ানো শুরু করল। এটা যেই না জানতে পারলেন ইমাম জুওয়াইনী, সঙ্গে সঙ্গে ওই বাচ্চার মুখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। আঙ্গুল ঢুকিয়ে তাকে বমি করালেন। কেউ বলছিল, বাচ্চা মানুষ, কষ্ট হচ্ছে। হোক, কষ্ট হোক, তবুও তার পেটের ভেতর যেন সন্দেহযুক্ত কোনও খাবার না থাকে। বমি করিয়েছেন, কিন্তু তারপরও কিছু থেকেছে। পরবর্তীতে সেই বাচ্চা অর্থাৎ ইমামুল হারামায়ন রহ. অনেক বড় আলেম হয়েছেন, অনেক মূল্যবান কিতাব লিখেছেন, অনেক ইবাদত-বন্দেগী করেছেন, উম্মতের অনেক দীনি খেদমত করেছেন। তিনি বলেন, মাঝেমধ্যে আমার কেমন যেন আলস্য দেখা দেয়। ভেতরে কেমন

যেন অন্ধকার মনে হয়। আমলের প্রতি উৎসাহ পাই না। যখনই এ অবস্থা হয়, তখন আমার মনে হয়, ওই যে আমি আরেক মহিলার দুধ খেয়েছিলাম, সে দুধের আছর এটা। কাজেই শিশুর জন্ম হলে, যখন মায়ের কোলে থাকে, তখনও মায়ের দায়িত্ব আছে।

## ইসলামী আদাব-কায়দা শেখানো

এরপরে যখন সে আধো আধো কথা বলতে শুরু করে, তখনও মায়ের দায়িত্ব আছে। মায়ের কোলে সে থাকে। মায়ের ভাষা সে শেখে। তখন থেকেই শিশুকে শেখাতে হবে। আল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এগুলো বলা শৈশব থেকেই শেখাতে হবে। ইসলামী আদাব-কায়দা শেখাতে হবে। এটা মায়ের দায়িত্ব।

এ ব্যাপারে মজার ঘটনা আছে। একবার এক যুবক হাঁচি দিল। হাঁচি দিয়ে বলল, আসসালামু আলাইকুম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ

তোমার উপরও সালাম। তোমার মায়ের উপরও সালাম।[২১৬]

এটা বললে ওই লোকটার মনে একটু কষ্ট লাগল। আমার মাকে আবার এখানে টেনে আনা কেন? ব্যাপার হল এই– হাঁচি দিলে বলতে হয়– اَلْحَمْدُ لِلّٰه। হাঁচি দিলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা সুন্নাত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলতেন। তিনি বলতে শিখিয়েছেন– হাঁচি যখন দেবে তখন বলবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه। আর যে এই اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুনবে, সে বলবে يَرْحَمُكَ اللّٰه। কী বলবে? يَرْحَمُكَ اللّٰه। এটা বলা ওয়াজিব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলাটা সুন্নাত। কিন্তু يَرْحَمُكَ اللّٰه বলা ওয়াজিব। যেমন সাক্ষাৎকালে আসসালামু আলাইকুম বলা সুন্নত, কিন্তু জবাবে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলা ওয়াজিব, নারী পুরুষ সবারই। ঠিক সেরকমেরই যে হাঁচি দেয় সে বলবে اَلْحَمْدُ لِلّٰه, আর এটা যে শুনবে সে বলবে يَرْحَمُكَ اللّٰه।

---

২১৬. সুনানে আবূ দাউদ : ৫০৩১

যদি সে الحَمْدُ لله বলে, তাহলে শ্রোতারা يَرْحَمُكَ الله বলবে। সে যদি الحَمْدُ لله না বলে, তাহলে يَرْحَمُكَ الله বলার দরকার নেই। এক মুসলমানের উপর আরেক মুসলমানের বিশেষ প্রাপ্য হল ছয়টা। এর মধ্যে দুই নম্বরে বলা হয়েছে তাশমীতুল আতিস (تَشْمِيْتُ العَاطِس) তথা الحَمْدُ لله এর জবাবে يَرْحَمُكَ الله বলা। এটা ওই মুসলমানের হক বা প্রাপ্য। তো হাঁচি দিয়ে বলতে হয়– يَرْحَمُكَ الله। ওই যুবক কী বলল? আস সালামু আলাইকুম। এটা বলা ভুল হয়েছে। এমনিতে তো আস সালামু আলাইকুম বলা খুব ভালো কথা। তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক– এটা একটা দুআ হল। কিন্তু যে জায়গার যে দুআ। উল্টাপাল্টা দুআ বললে তো হবে না। এ জায়গার দুআ হল الحَمْدُ لله পাঠ করা। কিন্তু সে ভুল বলেছে। সে আস সালামু আলাইকুম বলেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সতর্ক করলেন এই বলে–

عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ

সালাম তোমার উপরও, তোমার মায়ের উপরও।

এটা বললে সে যুবক মনে কষ্ট পেল। কেন? আমার মাকে এখানে কেন টেনে আনা? ব্যাপার হল এই– সে আলহামদুলিল্লাহ এর জায়গায় আসসালামু আলাইকুম বলল, এ ভুলটা যে করল এর জন্য দায়ী তার মা। তার মা দায়ী। দোষটা তার মায়ের। কারণ তার মায়ের কর্তব্য ছিল তার বাচ্চাকে শেখানো। বাচ্চা যেই না হাঁচি দেয়, তার মাকে তৎক্ষণাৎ বলতে হয়, বাবা/মা! বলো– আলহামদুলিল্লাহ। তুমি হাঁচি দিয়েছ, এখন বলো– আলহামদুলিল্লাহ। হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়। এ শিক্ষা কে দেবে?

মনে রাখবেন, আমাদের এ মজলিস ওয়াজের মজলিস না। এ মজলিস শিক্ষার মজলিস। এখান থেকে আমরা কিছু না কিছু শিক্ষা নিয়ে যাব। যা শিখলাম তা মনে রাখব। বাসায় গিয়ে পরস্পরে আলোচনা করব– আজকে এই এই বিষয় শেখানো হয়েছে। এজন্য আমরা হইচই মাতিয়ে দেই না। আমরা ধীরেসুস্থে কথা বলি। যা বলা হচ্ছে সবাই যেন বুঝতে পারে, শিখতে পারে।

মায়ের মর্যাদার কারণ হল তার দায়িত্ব। আর তার দায়িত্ব হল তার সন্তান জান্নাতের পথে চলছে না জাহান্নামের পথে চলছে, সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া। লক্ষ রাখা– যাতে তার সন্তান জান্নাতের পথেই চলে। জান্নাতের পথে চলার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা শিক্ষা দিয়েছেন তা মানতে হবে। সে শিক্ষার মধ্যে একটা শিক্ষা এইও– যখন হাঁচি দেবে তখন বলবে– اَلْحَمْدُ لِلّٰه। সন্তানকে এটা শিক্ষা দেবে কে? মা শিক্ষা দেবেন। তিনি সন্তানকে শেখাবেন– বাবা! কেউ যদি হাঁচি দেয়, আর বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه, তখন তুমি বলো– يَرْحَمُكَ اللّٰه। কী বলবে? يَرْحَمُكَ اللّٰه। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন। এটা বলা ওয়াজিব। এটা যে হাঁচি দিল তার পাওনা হয়ে গেছে। ওয়াজিব আদায় না করলে কী হয়? গুনাহ হয়। কাজেই যদি আমরা يَرْحَمُكَ اللّٰه না বলি তাহলে গুনাহ হবে। এ ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গানে দীন অনেক সতর্ক ছিলেন। যখনই শুনতেন কাউকে যে, সে হাঁচি দিয়েছে এবং বলছে اَلْحَمْدُ لِلّٰه, তখন অবশ্যই তার জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰه বলতেন। এমনকি এজন্য টাকা-পয়সা খরচও করতেন।

## ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর ঘটনা

মজার ঘটনা আছে ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর। তিনি একবার সফর করছিলেন জাহাজে। সফর অবস্থায় তিনি শুনতে পেলেন, নদীর তীর দিয়ে এক লোক যাচ্ছে আর সে হাঁচি দিয়ে বলে উঠেছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه। জাহাজে বসে তিনি শুনে ফেলেছেন। এখন তার জবাব দেওয়া কর্তব্য হয়ে গেছে। তিনি মনে করলেন আমি এখান থেকে يَرْحَمُكَ اللّٰه বললে ওই লোক শুনতে পাবে না। তিনি একটা নৌকা ভাড়া করলেন। নৌকা ভাড়া করতে তার টাকা লাগল এক দিরহাম। নৌকায় করে ওই লোকটাকে ধরলেন। বললেন, ভাই! يَرْحَمُكَ اللّٰه। এরপর আবার ফিরে আসলেন। ঠিক এসময় জাহাজের যাত্রীগণ শুনতে পেলেন একটা আকাশবাণী। কেউ বলছে–

يَا أَهْلَ السَّفِيْنَةِ إِنَّ اَبَا دَاوُدَ اشْتَرَى الْجَنَّةَ مِنَ اللهِ بِدِرْهَمٍ

হে জাহাজের যাত্রীগণ! তোমরা শোনো! আবূ দাউদ এক দিরহাম খরচ করে জান্নাত কিনে ফেলেছে।[২১৭]

আমরা এটা জানি না। কেউ যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে, তাহলে জবাবে বলতে হয় ইয়ারহামুকাল্লাহ। না জানার কারণে আমরা জবাবও দিই না। জবাব না দেওয়ায় আমরা দুইটা জিনিস থেকে বঞ্চিত হই। এক হল জবাব দেওয়ার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হই। জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব ছিল। এটা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। সে আদর্শ পালন থেকে বঞ্চিত হলাম। এবং গুনাহগার হলাম। ওয়াজিব পালন না করার কারণে গুনাহগার হলাম। এ এক ক্ষতি হল। দ্বিতীয় ক্ষতি হল এই– আমি যদি বলতাম يَرْحَمُكَ الله তাহলে সে একটা পাল্টা দুআ করত। যে হাঁচি দিল সে আবার পাল্টা একটা দুআ করত। সে দুআ কী?

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُم

আল্লাহ তোমাকে হেদায়াতের উপর রাখুন এবং তোমার সবটা অবস্থা ভালো করে দিন।

কী সুন্দর দুআ! يَهْدِيْكُمُ الله আল্লাহ তোমাকে হিদায়াতের উপর রাখুন। যে হাঁচি দিল সে আবার দুআও করল– আল্লাহ তোমাকে হেদায়াতের উপর রাখুন এবং তোমার সবটা অবস্থা ভালো করে দিন। তোমার যা কিছু জটিলতা আছে, যা কিছু সমস্যা আছে, যা অসুবিধা আছে আল্লাহ সব কিছুর সমাধান করে দিন। যে হাঁচি দিবে সে বলবে– الحَمْدُ لله। এ الحَمْدُ لله যে শুনবে সে বলবে يَرْحَمُكَ الله। আবার যে হাঁচি দিল সে বলবে–

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَ يُصْلِحُ بَالَكُم

---

২১৭. ফাতহুল বারী : ১০/৬১০

## বাংলা উচ্চারণে কুরআন ছাপানো ও পড়া

কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, আজকাল এক ধরণের অসৎ অসাধু ব্যবসায়ী বাংলা উচ্চারণে কুরআন ছেপেছে এবং এর ব্যবসা করছে। কুরআন শরীফ বাংলা উচ্চারণে লেখা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। বাংলা উচ্চারণে পড়া সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। কারণ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটা যদি বাংলায় কেউ লিখে দেয়, তাহলে উচ্চারণটা কী হয়? উচ্চারণ যেমন লেখা হয়, এ রকম পড়লে গুনাহ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটা বাংলায় লেখা সম্ভবই না। কারণ اَلْحَمْدُ এর ح গলা থেকে হয়। 'গলা থেকে হয়' এটা বাংলায় কী করে বোঝাবে? বাংলায় 'হ' আছে। এই 'হ' তো গলার ভেতর থেকে এভাবে উচ্চারণ হয় না। এটা কেমনে বাংলায় বোঝাবে? الْعٰلَمِيْنَ। গলার ভেতর থেকে উচ্চারণ হয়। ع তো বাংলায় নেই। বাংলায় 'আ' আছে। 'আ' তো গলার ভেতর থেকে উচ্চারণ হয় না। الْعٰلَمِيْنَ। তো বাংলায় হবে না। কাজেই লিখতে গেলে ভুল লেখবে আর এ ভুল অন্যরা পড়বে। এজন্য বাংলা উচ্চারণে যে কুরআন শরীফ ছাপানো আছে, ওটা কেনা জায়েয নেই। ওটা পড়াও জায়েয নেই। গুনাহ হয়। যারা কুরআন মাজীদ পড়তে পারে না, তাদের কর্তব্য যারা পড়তে পারে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া। এবং এটা খুব সহজ। এটা কঠিন কিছুই না। যারা পড়তে জানে, তাদের কাছে যদি কেউ শিখে, রোজ যদি আধাঘন্টা করে কেউ শিখে, এক মাসের মাথাতেই সে কুরআন শরীফ পড়া শিখে ফেলবে। এক মাস না হোক, দুই মাসের মাথায় তো শিখবে! এরপর যদি আরো দুই মাস চেষ্টা করে, তাহলে মোটামুটি ভালোভাবে সে কুরআন শরীফ পড়তে পারবে। এরপর যদি সে এ পড়া চালু রাখে, এক বছরের মাথায় এত সুন্দর করে সে কুরআন পড়বে যে, দেখা যাবে আধা ঘন্টায় সে এক পারা পড়ে ফেলেছে। কুরআন শেখা পড়া খুব সহজ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

> বস্তুত আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং আছে কি কেউ, যে উপদেশ গ্রহণ করবে?[২১৮]

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমকে সহজ করেছেন। তা পড়া, বোঝা এবং এর অনুসরণ করা সবই সহজ। এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করাও সহজ। এটা এতই সহজ যে, অনেক জায়গায় আছে বিশ দিনেই তা শিক্ষা দেয়। আল্লাহ খুব সহজ করেছেন। খুব সহজে শেখা যায়। কাজেই আমরা শিখব। কেন শিখব না? এটা না পড়লে নামায হয় না। আল্লাহর কালাম পড়া তো নামাযে ফরয। সূরা ফাতিহা পড়া, এর সঙ্গে সূরা মিলানো, এ তো ফরয। যা পড়লে প্রত্যেক হরফে হরফে দশ নেকী, তা আমরা কেন শিখব না?! আমরা ফালতু জিনিস শেখার জন্য কত টাকাপয়সা খরচ করি। দুনিয়ার কয়দিনের জীবন। এ কয়দিনের জীবনে যাতে আরামে থাকতে পারি সেজন্য কত টাকা পয়সা খরচ করি! আখিরাতে অনন্ত জীবনে যাতে শান্তি পাই, তার জন্য কেন টাকা পয়সা খরচ করব না? তার জন্য কেন সময় দেব না? সুতরাং আমাদের সকলেরই কর্তব্য কুরআনুল কারীম আরবীতে শিখে নেওয়া। আর যত দুআ আছে সে দুআগুলোও আমরা আরবীতে শিখব, বাংলা উচ্চারণে নয়।

## হাঁচির আদাব-কায়দা

হাঁচি আল্লাহ তাআলার একটা নিআমত। হাঁচি দেওয়াটা আল্লাহ তাআলার একটা নিআমত। কারণ হাঁচি দিলে শরীর ঝরঝরে হয়। হাঁচি দুই ধরনের। এক হাঁচি হয় ঠাণ্ডা লাগলে। কারো ঠাণ্ডা লেগেছে আর সে একের পর এক হাঁচি দিচ্ছে। এটাও নিআমত। আরেক হাঁচি আছে, যেটা ঠাণ্ডা লাগা ছাড়াই দেখা যায়, হঠাৎ হঠাৎ আসে। তো যদি কেউ হাঁচি দেয়, তাহলে তার শরীর ঝরঝরে হয়। শরীরে রক্ত সঞ্চালন খুব ভালো হয়। কোথাও যদি শিরা-উপশিরায় রক্ত জমাট বাঁধে, হাঁচির

---

২১৮. সূরা কমার : ২২

ধাক্কায় সে বাঁধা দূর হয়ে যায়। এজন্য এটা আল্লাহ তাআলার একটা নিআমত। ওই যে হার্টে ব্লক হয়, তখন তো অপারেশন লাগে। হাঁচি এমন এক নিআমত, যদি হাঁচি আসে মাঝেমধ্যে, তাহলে ওই ব্লক সহজে হতে পারে না। এরপরও রোগ-ব্যাধির কথা তো আলাদা। কিন্তু ছোটখাটো ব্লক হাঁচির ধাক্কায় ছুটে যায়। রক্ত সঞ্চালন খুব দ্রুত হয়। এটা আল্লাহ তাআলার একটা নিআমত। যেহেতু আল্লাহ তাআলার নিআমত, তাই হাঁচি দিলে বলতে হয়– اَلْحَمْدُ لله। এটা আল্লাহর শুক্‌র। আল্লাহ, তোমার শুক্‌র যে তুমি আমাকে এক নিআমত দান করেছ। সে নিআমতের শুক্‌র আদায় করে বলে اَلْحَمْدُ لله। আমরা যখন এটা শুনলাম তখন আমাদেরও মনে পড়ল– সে এক নিআমতের শুক্‌র আদায় করছে اَلْحَمْدُ لله বলে। আমরাও তো কত নিআমত আল্লাহ তাআলার ভোগ করছি। কাজেই আমাদেরও কর্তব্য নিআমতের শুক্‌র আদায় করা। এ নিআমতের কথা ভাই তুমি মনে করিয়ে দিয়েছ। কাজেই তোমার জন্য দুআ করি– يَرْحَمُكَ الله। ওই লোকটা اَلْحَمْدُ لله বলে আমাকে নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, তাই তার জন্য দুআ করছি, يَرْحَمُكَ الله – আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন। এরপর যদি আবারও হাঁচি দেয়, এরপর আবারও বলে اَلْحَمْدُ لله, তখন আবারো বলব– يَرْحَمُكَ الله। এরপর যদি আবারো হাঁচি দেয়, বলে اَلْحَمْدُ لله, তবে তখন আর يَرْحَمُكَ الله বলার প্রয়োজন নেই। এরকম হল একবার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে একজন দুই-দুই বার হাঁচি দিল আর বলল اَلْحَمْدُ لله। আমাদের বেলায় এমন হলে তখন কী করব? তো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইবারই তাকে বললেন, يَرْحَمُكَ الله। এরপর আবার যখন হাঁচি দিল, তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اَلرَّجُلُ مَزْكُومٌ

তার সর্দি লেগেছে।[২১৯]

---

২১৯. সহীহ মুসলিম : ৭৬৮১

এখন আর দরকার নেই। কারণ যার সর্দি লাগে সে তো বিশ-চল্লিশ বার হাঁচি দিতেই থাকে। এখন যদি একের পর এক এর উত্তর দেওয়া লাগে তাহলে তো আর কোনও কাজ করা হবে না। বসে বসে এগুলোই করতে থাকলে পাছে সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

দেখুন ইসলাম কী সুন্দর! ইসলাম সব কিছুতেই ভারসাম্য, মধ্যপন্থা বজায় রেখেছে। একদিক থেকে বলেছে, হাঁচি দিলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলো, জবাবে يَرْحَمُكَ اللّٰه বলো, আবার অন্যদিক থেকে বলেছে– এইসব বলতে যেয়ে যেন অন্য কাজ নষ্ট না হয়। যদি কারো সর্দি লাগে, সে বারবার এ কাজ করবে। তখন আর এগুলো অর্থাৎ বার বার اَلْحَمْدُ لِلّٰه আর يَرْحَمُكَ اللّٰه বলার দরকার নেই। সবদিক লক্ষ রাখা হয়েছে। কাজেই বারবার হাঁচি দিলে আর সেসবের দরকার নেই। আবার যদি সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বলে তখনও আবার يَرْحَمُكَ اللّٰه বলার দরকার নেই।

একবার এমন হল যে, এক মজলিসে একজন হাঁচি দিল। হাঁচি দিয়ে বলল اَلْحَمْدُ لِلّٰه। জবাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, يَرْحَمُكَ اللّٰه। একটু পরে আরেকজন হাঁচি দিল। কিন্তু হাঁচি দিয়ে চুপ, কিছুই বলল না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কিছু বললেন না। ওই লোকটার মন খারাপ হয়ে গেল। ওই লোকটা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ওই ভাই যখন হাঁচি দিল, আপনি তার জন্য দুআ করলেন। বললেন, يَرْحَمُكَ اللّٰه। আমিও তো হাঁচি দিলাম। আমার জন্য যে দুআ করলেন না? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে তো হাঁচি দিয়ে বলেছিল, اَلْحَمْدُ لِلّٰه। তুমি হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলনি।[২২০] সে যেহেতু হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলেছে তাই সে দুআ পেয়েছে। তুমি হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলনি তাই দুআও পাওনি। তাহলে দুআর আশা করা যাবে তখনই, যখন আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়ব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه না বললে তখন আর দুআর আশা করা যাবে

২২০. সহীহ বুখারী : ৬২২৫

না। তখন يَرْحَمُكَ اللهُ বলার কোনও বিধান নেই। হাঁচি সম্পর্কে একটা কথা তো হল এই– হাঁচি যে দেবে সে বলবে الحَمْدُ لله।

## হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে কাপড় বা হাত রাখা

আরেকটা কথা হল এই– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন, তখন হাতে কাপড় থাকলে সে কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকতেন আর কাপড় না থাকলে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতেন। মুখের সামনে হাতচাপা দিতেন কিংবা কোনও কাপড় দিতেন।[২২১] কেন? এটা করতেন এজন্য যে, যাতে হাঁচির আওয়াজটা কম হয়। কিছু কিছু লোক এমন জোরে হাঁচি মারে, সারা মসজিদ ফাটিয়ে ফেলার অবস্থা হয়। মনে হয় যেন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। হাঁচি দেওয়া আল্লাহ তাআলার নিআমত বটে। কিন্তু অত জোরে দিলে ক্ষতিও আছে। সবকিছুই সীমার মধ্যে থাকা চাই। অত জোরে আওয়াজ করলে নিজেরও কানের তালু ফেটে যাওয়ার ভয় আছে। আর দ্বিতীয় ক্ষতি এই– জোরে আওয়াজ হলে তো অন্যদের ক্ষতি। আওয়াজ শোনবার ক্ষমতা মানুষের সীমিত। এর বেশি হয়ে গেলে তখন শ্রবণশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। তাছাড়া পরিবেশগত একটা ক্ষতিও তো আছে। কী একটা বিশ্রী অবস্থা শুরু হয়ে যায় মজলিসের মধ্যে! তাই যথাসম্ভব হাঁচির আওয়াজ কম করতে হবে। এজন্য উচিত হাঁচির সময় মুখের সামনে হাত ধরা কিংবা কোনও কাপড় বা টিস্যু ধরা।

তাছাড়া অনেক সময় হাঁচি দিলে মুখ থেকে থুতু বের হয়ে যায়। সামনে হাত ধরলে বা কাপড় ধরলে সে থুতুটা হাত বা কাপড়ে লাগে। আর তা না হলে দেখা যাবে আরেকজনের হাত বা মুখে লেগে গেছে। এমন হয় অনেক সময়, হাঁচি দেয় আর লোকজনকে বিপদে ফেলে দেয়। এগুলো বাস্তব, কোনও গালগল্প নয়। অন্যকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নেই। মানুষের মুখের থুতু ভীষণ দুর্গন্ধের জিনিস। মুখের থুতু বড় বাজে জিনিস। এটা

---

২২১. সুনানে আবূ দাউদ : ৫০২৯; জামে' তিরমিযী : ২৭৪৫

যদি আরেকজনের চোখেমুখে লেগে যায়, তাহলে তো ভয়াবহ ব্যাপার! আরেকজনের গায়ে যাতে এটা না লেগে যায়, তাই কর্তব্য মুখের সামনে হাত বা কোনও কাপড় ধরা। যাক, আজকে হাঁচি সম্পর্কে কিছু কথা হয়ে গেল। আমাদের মা-বোনরা যেন এ কথাগুলো শিখে নেন এবং তারা নিজ সন্তানদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেন।

কথা শুরু হয়েছিল এখান থেকে যে, মায়েদের অনেক দায়িত্ব। সে দায়িত্বের মূলকথা হল এই– মানবজীবনের যে আদবকায়দাগুলো, সে আদবকায়দাগুলো সন্তানদের শেখানো। আদবকায়দা বলতে জীবনের প্রত্যেকটা কাজেই আদবকায়দা আছে। হাঁচি দেওয়ার আদাব আছে। হাসিরও আদাব আছে। এক হল– হাঁচি, আরেক হল হাসি। ওই যে হাসাহাসি, এ হাসিরও আদাব আছে। কান্নারও আদাব আছে। বাথরুমে যাওয়ার আদাব আছে। ঘুমানোরও আদাব আছে। বসারও আদাব আছে। ঘরে ঢোকা এবং ঘর থেকে বের হওয়ার আদাব আছে। জামা-কাপড়েরও আদাব আছে। জুতা পরা এবং জুতা খোলারও আদাব আছে। ওযু-গোসলের আদাব আছে। বড়দের সঙ্গে ব্যবহার এবং ছোটদের সঙ্গে ব্যবহারেরও আদবকায়দা আছে। আমরা জীবনে যা-কিছু করি, যত রকমের কাজ করি, সমস্ত কাজ কর্মের আদাব আছে। মানবজীবনে এমন কোনও কাজ নাই, যেই কাজের আদবকায়দা নাই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব শিক্ষা দিয়েছেন।

## ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণতা

এজন্যই তো একবার এক মুশরিক এক সাহাবীকে ব্যঙ্গ করে বলেছিল– কেমন নবী তোমাদের? পেশাব-পায়খানা কীভাবে করে সেটাও শেখায়! এমন তুচ্ছ জিনিস, বাজে জিনিস, এটাও বুঝি শেখাতে হয়? এ কেমন নবী, যে পেশাব পায়খানা করাও শেখায়! ওই সাহাবী ছিলেন সালমান ফারসী রাযি.। তিনি গর্ব করে বললেন, বটে! এটাই তো আমাদের গর্ব। আমাদের নবী এ ছোটখাটো জিনিসও শেখান। আর জান, পেশাব-পায়খানা করা বিষয়ে তার কত শিক্ষা? এরপর তিনি এক এক

করে শিক্ষা উল্লেখ করতে লাগলেন।[২২২] তার মানে দেখো– পেশাব-পায়খানার মতো একটা তুচ্ছ জিনিস সম্পর্কেও যখন তাঁর এত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, তাহলে বড় বড় কাজ সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা কেমন হবে? এ হল আমাদের ইসলামের গৌরব। ছোট বিষয়ে এত শিক্ষা, আর বড় বড় বিষয়ে তো অনেক শিক্ষা। জীবনে আমরা যা-কিছু করি সবকিছু সম্পর্কে শিক্ষা আছে। আর এ শিক্ষাগুলো সন্তানকে শেখানোর দায়িত্ব মায়ের।

মা কীভাবে শেখাবেন? শেখাতে হলে আগে জানতে হবে। মায়ের আগে জানতে হবে ইসলামী সমস্ত আদবকায়দা। আগে মায়ের নিজে জানতে হবে। জানলেই সন্তানকে শেখানো যাবে। আফসোস হল এই, আমাদের মা-বোনেরা জানে না। কেন জানে না? জানে না আমাদের পুরুষদের গাফলতির কারণে। আমাদের পুরুষেরা আমাদের মা-বোনদেরকে শেখায় না। পুরুষেরা মা-বোনদের কী করে দামী শাড়ি কিনে দেবে, দামী জুতা কেনে দেবে, কখন মার্কেটে নিয়ে যাবে, কখন বেড়াতে নিয়ে যাবে, এ তালে থাকে। ঠিক আছে, ওইটাও করো। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি জরুরি হল মা-বোনদের ইসলামী আদবকায়দা শেখানো। কারণ এটা যদি না শেখায়, তাহলে তার আদরের সন্তানকে তো মা শেখাতে পারবে না। আর আদরের সন্তানদের যদি মা না শেখায়, তাহলে এ মায়ের পায়ের নীচে যার বেহেশত, সে আদরের সন্তান জান্নাতের পথ ছেড়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে চলবে। এজন্য তো মা দায়ী হয়ে যাবে। মাকে এ দায় থেকে বাঁচানোর জন্য মা'র নিজেরও চেষ্টা করা উচিত। পুরুষদেরও চেষ্টা করা উচিত, মায়েদেরকে ইসলামী আদবকায়দা শেখানো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন।



২২২. সহীহ মুসলিম : ২৬২



# কুধারণার ক্ষতি ও এর সংশোধন

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কোনও কোনও অনুমান গুনাহ। তোমরা কারো গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[২২৩]

২২৩. সূরা হুজুরাত : ১২

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আল্লাহ তাআলার অনেক মেহেরবানী তিনি আমাদেরকে নিজেদেরকে ইসলাহ ও সংশোধনকল্পে আরো এক মঙ্গলবার এখানে একত্র হওয়ার তাওফীক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ভেতর এ জযবা এসে গেছে যে, নিজেদের সংশোধন দরকার। এ সদিচ্ছা আমাদের ভেতর আল্লাহ তাআলাই দান করেছেন। সদিচ্ছাও আল্লাহ তাআলার এক নিআমত। সকলের মনে তা আসে না। মানুষের মনে কত রকমের ভাবনা আসে, কত রকমের ইচ্ছা জাগে। তার মধ্যে অনেক ইচ্ছা ভালো, অনেকগুলো মন্দ। যে সমস্ত ভালো ইচ্ছা মনে জাগে, ওইগুলো আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিআমত। এর জন্য আল্লাহ তাআলার শুক্‌র আদায় করা দরকার। আর সে শুক্‌র হচ্ছে ওই সদিচ্ছা পূরণ করে ফেলা। গাফলতি না করা। গাফলতি করতে থাকলে ওই সদিচ্ছা মনে আর আসে না। সদিচ্ছাগুলো আল্লাহ তাআলার নিআমত। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসা অতিথি, মেহমান। মানুষের মনে সদিচ্ছা হল মেহমানের মতো।

কোনও বাড়িতে যদি মেহমান আসে, সে মেহমান লক্ষ করে– এ বাড়ির লোকজন আমাকে সমাদর করে কি না। যদি আদর-যত্ন করে, তাহলে ওই মেহমান থাকে এবং পরে আবারও আসে। যদি দেখে যে, আমাকে আদর-যত্ন করে না, বরং অবহেলা করছে, তখন এ মেহমান খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। এরপর আর কখনো আসে না। ঠিক ওইরকম সদিচ্ছাও মানুষের মনে আল্লাহ তাআলার পাঠানো মেহমানের মতো। যদি মানুষ এ মেহমানকে সম্মান করে, মানে সদিচ্ছাকে পূরণ করে, তাহলে মনের ভেতর সদিচ্ছা আবারো আসে। আর যদি মানুষ এ ইচ্ছা পূরণ না করে, তাহলে তাকে অপমান করা হয়, অবহেলা করা হয়। এরপর মনে আর সদিচ্ছা আসে না। অসদিচ্ছাই আসতে থাকে। এজন্য মনের ভেতর সদিচ্ছা যদি আসে, তাহলে অবহেলা করতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পালন করে ফেলা উচিত।

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী– তিনি আমাদেরকে আত্মসংশোধন, নিজেকে ইসলাহ করার সদিচ্ছা দান করেছেন। সে ইচ্ছায় প্রতি

মঙ্গলবার এখানে আসার তাওফীকও তিনি দান করেন। এখন উচিত নিজেদের সংশোধন করে ফেলা। আমাদের ভেতর নানা রকমের রোগ আছে। মানুষের যেমন শারীরিক রোগ-ব্যাধি আছে, তেমনি রূহানী ও আত্মিক রোগ-ব্যাধিও আছে। শরীরের রোগ-ব্যাধির মত আত্মার রোগ-ব্যাধিরও চিকিৎসা দরকার। শরীরের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা না করলে যেমন মানুষ আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে, একসময় এমন অথর্ব হয়ে যায় যে, আর কোনও কাজের থাকে না, ঠিক তেমনি যদি আত্মার রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করা না হয়, এটাকে ভালো করার চেষ্টা না করা হয়, তাহলে আত্মা একসময় এমন নিস্তেজ দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তার পক্ষে আর ভালো কাজ করা সম্ভব হয় না। এজন্য আমার মধ্যে কি কি মন্দ জিনিস আছে তা খুঁজে খুঁজে দেখা এবং সেগুলোর চিকিৎসা করা খুবই জরুরি। আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ, অনেকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি, আমরা চেষ্টাও করছি– যাতে আমাদের সংশোধন হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমরা তাওফীক চাই আল্লাহ তাআলার কাছে, যেন আমরা নিজেদের পুরোপুরি সংশোধন করে ফেলতে পারি।

## কুধারণা করা কবীরা গুনাহ

আরো অনেক রোগ-ব্যাধি আছে, যে সম্পর্কে এখনও আলোচনা হয়নি। যেমন আমি যে আয়াত পড়েছি, যেখানে একটা বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে, ওইটাও আমাদের মধ্যে আছে। বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا

হে মুমিনগণ! যারা ঈমান এনেছ!

اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ

তোমরা অনেক ধারণা পরিহার করো, ছেড়ে দাও।

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

কারণ কোনও কোনও ধারণা আছে এমন, যেগুলো গুনাহ।

মানুষের মনে ধারণা দুই রকমের আসে। একটা সুধারণা, আরেকটা কুধারণা। সুধারণা তো ভালো। কিন্তু কুধারণা গুনাহ। বলা হয়েছে অনেক ধারণা আছে গুনাহ। মানে কুধারণা গুনাহ। কাজেই কুধারণা তোমরা ছেড়ে দাও। একে অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করবে না। কুধারণা করা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা যখন ছাড়তে বলেছেন, তো নিশ্চয়ই এটা মন্দ জিনিস। কাজেই ছাড়া উচিত। যদি না ছাড়া হয়, তাহলে এ দোষ থেকে যাবে আর এ গুনাহ বারবার করাই হবে। যদি কুধারণা করার চরিত্র হয়ে যায়, তাহলে একের পর এক গুনাহ হতেই থাকে। মানুষ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে– মানুষ অভ্যাসের দাস। ভেতরে যে অভ্যাস আছে, সে সবসময় ওইটাই করে। যদি কুধারণার অভ্যাস থাকে, তাহলে সবসময় অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করতেই থাকবে আর গুনাহ হতেই থাকবে। আমাদের এ জাতীয় গুনাহ বারবার হয়ে যায়। হয়তো প্রতিদিনই করি। প্রতিদিনই যদি করতে থাকি, তাহলে কুধারণার গুনাহ কত হয়ে যায়!

আমরা অনেক সময় লক্ষ করি না। গুনাহের প্রতি আমাদের নজর নেই। কি কি গুনাহ আমার দ্বারা হচ্ছে তার খবরও রাখি না। অথচ তা জমা হচ্ছে, আমলনামায় লেখা হচ্ছে। প্রত্যেকদিন যদি অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করতে থাকি, তাহলে প্রত্যেকদিনই এ জাতীয় গুনাহ লেখা হচ্ছে। এখন তো বুঝতে পারছি না। যখন হাশরের ময়দানে আমলনামা খুলে দেওয়া হবে আর বলা হবে– পড়ো, তখন দেখা যাবে– সুবহানাল্লাহ! কুধারণার গুনাহই হাজার হাজার। প্রত্যেকদিন এটা করছি। নানাজন সম্পর্কে কুধারণা করছি।

## কুধারণা আরো বহু গুনাহের কারণ হয়

স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে কুধারণা করে, স্ত্রী স্বামী সম্পর্কে কুধারণা করে। ভাই বোন সম্পর্কে কুধারণা করে, বোন ভাই সম্পর্কে কুধারণা করে। এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশী সম্পর্কে কুধারণা করে। বন্ধুতে বন্ধুতে একটু মনোমালিন্য হল, ব্যস, অমনি একজন সম্পর্কে অন্যজন কুধারণা করে। যত লোকের সঙ্গে কোনও রকমের লেনদেন আছে, যোগাযোগ

আছে, সবার সঙ্গেই যদি কুধারণা হতে থাকে তাহলে কত গুনাহ হবে? এত গুনাহ হবে যে, পরকালে কেবল এই একটার জন্যই যদি ধরা পড়ে যাই, তাহলে মহামুসীবত হয়ে যাবে। কত গুনাহ! রাশি রাশি গুনাহ কেবল এ কুধারণার কারণে হয়।

আর কুধারণার কারণে কেবল কুধারণারই গুনাহ হয়? না; বরং আরো হাজারো গুনাহ হয়। কুধারণার গুনাহ কেবল কুধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এক কুধারণা থেকে আরো হাজারো গুনাহ সৃষ্টি হতে থাকে। এটা অনেক গুনাহের মূল। এর থেকে একেক করে গুনাহ জন্ম নিতে থাকে। যার সম্পর্কে কুধারণা হয়, তার সবকিছুই বাঁকা চোখে দেখা হয়, তার কোনওটাই ভালো চোখে দেখা হয় না। তার ভালো কাজকেও মন্দ মনে করা হয়। কুধারণা কারো প্রতি একবার হয়ে গেলে তখন তার ভালোটাকেও মন্দ মনে করা হয়। আর পেছনে পেছনে তার সমালোচনা করা হয়, গীবত করা হয়। কুধারণা থেকে গীবতের সৃষ্টি হয়ে যায়। এরপর গীবত থেকে পরস্পরে হানাহানি, মারামারি শুরু হয়ে যায়। সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। শুরু হয়েছিল এক কুধারণা থেকে। সেখান থেকে সম্পর্কই ছিন্ন হয়ে যায়। এমনকি খুনোখুনিও হতে পারে। কুধারণা থেকে হত্যাকাণ্ডও হতে পারে।

এক সাহাবী খন্দকের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে গেলেন। বাড়ির দরজায় পৌঁছতেই দেখেন স্ত্রী দরজার সামনে দাঁড়ানো। স্ত্রীকে দরজার সামনে দাঁড়ানো দেখেই মাথাটা গরম হয়ে গেল। স্ত্রী কেন দরজার সামনে দাঁড়ানো থাকবে? স্ত্রী থাকবে বাড়ির ভেতর। দরজার সামনে কেন? কার অপেক্ষায় আছে? কাকে দেখছে?

আমাদের অনেকে এমন কুধারণা করে বসি। স্ত্রী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, স্বামীর নজরে পড়তেই মনের ভেতর কুধারণা সৃষ্টি হয়ে গেল। কেন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে? এমনও তো হতে পারে, তোমার অপেক্ষায় আছে! তুমি কেন উল্টো কুধারণা কর? তোমার অপেক্ষায় আছে, এও তো হতে পারে! কিন্তু না! কেন বাইরে

তাকিয়ে আছে, কুধারণা মনে এসে গেল আর এরপর থেকেই মনে করে– কার সঙ্গে যেন সম্পর্ক। ব্যস, এখন সবকিছুতেই সন্দেহ করে। সন্দেহ যখন মনের মধ্যে একবার এসে গেল, তখন একের পর এক তা বাড়ছেই।

উল্টোও হতে পারে। স্বামী দেরি করে বাড়ি ফিরেছে। ব্যস, স্ত্রীর মনের মধ্যে সন্দেহ– কেন দেরি করে ফিরল? এমন তো হতে পারে যে, তোমার কারণে দেরি করে ফিরেছে। তোমার কোন একটা রোগের জন্য ডাক্তারের খোঁজ করছিল যে, কোন ডাক্তারকে দেখানো যায়। এ করতে করতে তার দেরি হয়ে গেছে। কিংবা যা রোজগার করে তাতে চলছে না, তাই আরো কামাইয়ের সন্ধানে সে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল, এ কারণে তাই বাড়িতে ফিরতে দেরি হয়েছে। তোমাকে একটু বেশি সুখে রাখতে চায়। কিন্তু সে উল্টো সন্দেহ করে বসে আছে। স্বামী এত দেরি করে বাসায় ফিরল! কোথায় কোথায় ঘুরেছে, কার পেছনে ঘুরেছে কে জানে! ব্যস, এখন এ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে গণ্ডগোল লেগে গেল। যদি মনের মধ্যে কোনও খটকা জাগেও, তাহলে জিজ্ঞেস করে নিরসন করে ফেলা চাই। এখনই নয়, আরো পরে। কারণ এখন বাইর থেকে এসেছে। মাথা গরম। কাজেই এখন জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়। পরবর্তীতে যখন শান্ত হবে, ওই সময় জিজ্ঞেস করা যায়, আজকে কেন দেরি হয়ে গেল, কোনও সমস্যা হয়ে গিয়েছিল কি না, কোনও ঝামেলা হয়েছিল কি না ইত্যাদি।

তো ওই সাহাবী যখন দেখলেন স্ত্রী বাইরে দাঁড়ানো, রেগে গেলেন। আরব জাতি স্ত্রীদের বিষয়ে সাঙ্ঘাতিক স্পর্শকাতর। তার স্ত্রী অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখবে বা অন্য কারো দিকে তাকাবে, এটা তারা কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না। পারে না এজন্য যে, তাদের আত্মসম্মানবোধ খুব বেশি। কারো স্ত্রীর যদি অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকে, এতে তার মান-সম্মান নষ্ট হয়। আবার স্ত্রীদের তারা খুব বেশি ভালোও বাসে। আর ভালো বেশি বাসলে সেখানে এমন অহেতুক সন্দেহ অনেক সময় সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য ভালোবাসা যেখানে বেশি, সেখানে সতর্কতাও খুব বেশি দরকার, যাতে শয়তান ভেতর থেকে কোনও রকমের গোলযোগ সৃষ্টি করতে না পারে।

তো যখনই দেখলেন দরজার সামনে দাঁড়ানো, মাথা গরম হয়ে গেল। হাতে বর্শা ছিল, সে বর্শা তাক করলেন। মারতে উদ্যত হয়েছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী বললেন, থামুন! থামুন! বাড়ির ভেতরে কী, দেখুন আগে। তখন তার মনে হল ভেতরে কোনও সমস্যা। খুব তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই দেখেন ঘরের চত্বরে এক বিরাট সাপ। স্ত্রী ওই সাপের ভয়ে দরজার দিকে চলে এসেছে। এক বিশাল সাপ কুন্ডুলি পাকিয়ে আছে। ওই দেখে তিনি আর দেরি করলেন না, বর্শাটা সাপের গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। এরপর বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, বর্শা মারার পর সাপটা আগে মরল না এ লোকটা আগে মরল, তা বলা যাবে না। বলা সম্ভব নয় যে, কে আগে মরেছে।[২২৪] মানে দুজনই মারা গেছে। সাপও মরল আর তিনিও মারা গেলেন।

ঘটনা কী? সাপ মরল তো বর্শার আঘাতে। কিন্তু তিনি কেন মারা গেলেন? এ কারণে যে, ঘরের ভেতর যে সাপ থাকে অনেক সময় সে সাপ সাপ নয়, জিন হয়ে থাকে। এটা একটা জিন ছিল। একে মারার কারণে তার সঙ্গের জিন সাথে সাথে প্রতিশোধ নিয়েছে আর তাকে মেরে ফেলেছে। এজন্য বাড়ির ভেতর সাপ থাকলে সেটা মারতে নেই। ঘোষণা দিতে হয়– এই সাপ! বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। তোমাকে সময় দিলাম তিন দিন। তিন দিনের মধ্যে যদি না যাও, তাহলে তোমাকে মেরে ফেলব। এভাবে একের পর এক ঘোষণা দিতে হয়, এরপর মারতে হয়। একদম দেখামাত্রই মারা উচিত না। কারণ তা জিনও হতে পারে।

## শাহ আহলুল্লাহ রহ.-এর ঘটনা

শাহ আহলুল্লাহর একটা ঘটনা আছে। একবার একটা সাপ মেরে ফেলেছিলেন। একদিন রাত্রের বেলা তিনি বের হলেন। পথে একদল লোক তাকে ধরল আর বলল, আমাদের সঙ্গে চলুন। কোথায়? চলুন তো, খুবই প্রয়োজন। তাদের উপকার হবে মনে করে তিনিও গেলেন। তারা তাকে একটা পালকির মধ্যে ঢুকাল। এরপর তাকে

২২৪. মুওয়াত্তা মালিক, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, ২/৯৭৬

উড়িয়ে নিয়ে গেল। উনি তখন বুঝছিলেন, আমি মাটিতে নয়, বাতাসের উপর দিয়ে চলছি।

এক জায়গায় তাকে নামানো হল। এরপর তারা তাকে নিয়ে সামনে গেল। তিনি গিয়ে দেখেন এক রাজদরবার। বহু মানুষ সেখানে। রাজদরবারে তাকে হাজির করা হল। তিনি বললেন– আমাকে কেন ডাকা হয়েছে? বলা হল– আপনি আমাদের রাজপুত্রকে হত্যা করেছেন। তার বিচারের জন্য আপনাকে আনা হয়েছে। তিনি বললেন, না তো! আমি কোনও রাজপুত্র কেন, কোনও মানুষকেই মারিনি! শুধু শুধু আমাকে এমন অপরাধী করা হচ্ছে। আমি কিছুই করিনি। বলা হল– কেন? আপনার কী মনে নেই অমুক দিন একটা সাপ মেরেছিলেন? সে সাপটাই ছিল আমাদের রাজপুত্র। আমাদের জিনের বাদশাহর ছেলে। আপনি তাকে মেরেছেন। উনি বললেন, আমি তো সাপ মনে করে মেরেছি। আমি জানি নাকি সে জিন? এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। শেষে বাদশাহ বললেন, একটা কাজ করা হোক, আমাদের মুফতী সাহেবকে ডাকা হোক। জিনদের মধ্যেও আলেম আছে। তো মুফতী সাহেবকে ডাকা হল। তাকে বলা হল– এর বিচার কী, আপনি বলুন। উনি বললেন, এ নির্দোষ। এর কোনও অপরাধ নেই। সুতরাং তার কোনও বিচার হবে না। কেন হবে না? হবে না এজন্য যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি– কেউ যদি অন্যের বেশ ধরে আর তাকে মেরে ফেলা হয়, এর জন্য কারো শাস্তি হবে না।

এ যে মুফতী সাহেব, উনি অনেক দীর্ঘ আয়ু পেয়েছেন। হাজার বছর বেঁচেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনেছেন। ওই মুফতী সাহেব একজন সাহাবী, জিন সাহাবী। রাজপুত্র সাপের বেশ ধরেছে। জিনের বেশে তো সে ছিল না। এ সাপটাতো আসলে সাপ নয়; জিন সাপের বেশ ধরেছে। ওই লোকটা সাপ মনে করে মেরেছে, জিন মনে করে মারেনি। কাজেই তার কোনও দোষ নেই। তার কোনও বিচার হবে না।

বাদশাহ বলল, ঠিক আছে। এর যখন কোনও অপরাধ নেই, তাই একে আবার তার জায়গামতো পৌঁছে দিয়ে আসো। সে জিনেরা আবার তাকে

তার জায়গামতো পৌঁছে দিল। তো বাড়ির ভেতর যে সাপ থাকে, সবসময় তা সাপ হয় না; অনেক সময় জিন হয়ে থাকে। সব জিন ক্ষতিও করে না। দুষ্ট জিন ক্ষতি করে, ভালো জিন ক্ষতি করে না। তারা অনেক সময় সাহায্যও করে, বিশেষত মুমিন জিন যদি হয়ে থাকে। জিনদের মধ্যে ভালোও আছে, মন্দও আছে, মুমিনও আছে, কাফেরও আছে।

যাহোক, ওই যে সাহাবী সাপ মারলেন, সেটা ছিল একটা জ্বীন। এজন্য জিনদের আরো যারা তার সঙ্গে ছিল, তারা প্রতিশোধ নিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম– ওই সাহাবী তার স্ত্রীকে বর্শা মারতে উদ্যত হলেন। ওই স্ত্রী যদি সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাবধান না করতেন, তাহলে তো তিনি মযে যেতেন। এ মরাটা হত তো সন্দেহের ভিত্তিতে, তার সম্পর্কে একটা সন্দেহ হয়েছে, একটা কুধারণা সৃষ্টি হয়েছে। মন্দ ধারণা থেকে মানুষের জানও খতম হয়ে যেতে পারে। কুধারণা উপর ভিত্তি করে মানুষহত্যা, এ তো মহাপাপ। মন্দ ধারণা একটি পাপ ছিল। তার থেকে আরো বড় পাপ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ হত্যা করা।

## কুধারণা করা মুনাফিকদের আলামত

এজন্য কারো প্রতি মন্দ ধারণা করতে নেই। এটা মুমিনদের আলামতও নয়। এটা হল একসময়কার মুনাফিকদের আলামত। কুধারণা করা মুনাফিকদের কাজ, খাঁটি মুমিনের কাজ নয়। কুরআন মাজীদে মুনাফিকদের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা কি কি করত। তাদের একটা খাসলত ছিল এটাও যে,

يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ

তারা যে-কোনও হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[২২৫]

---

২২৫. সূরা মুনাফিকূন : ৪

কোথাও কোনও আওয়াজ শুনলেই তাদের মনে হত, আমাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু হচ্ছে। এ তো কুধারণা। আওয়াজ হলেই মনে করত, নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে কোনও কিছু হচ্ছে। এটা মুনাফিকদের আলামত।

মুনাফিকদের একটা খাসলাত ছিল মিথ্যা বলা। হাদীছে আছে–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আর আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।[২২৬]

নিশ্চয়ই কুধারণা করাও মিথ্যাই বটে। বরং হাদীছে এটাকে কঠিন মিথ্যা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

সাবধান! কুধারণা করো না। কেননা কুধারণা করা কঠিনতম মিথ্যা কথা।[২২৭]

সুতরাং কুধারণা করা মুনাফিকীর আলামত। আমাদের মধ্যে কেন মুনাফিকের আলামত থাকবে? মুনাফিককে আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের পক্ষে কোনও সাহায্যকারী পাবে না।[২২৮]

মুনাফিকরা জাহান্নামের একেবারে সবচে' নিচের জায়গায় থাকবে। কাজেই আমাদের মধ্যে মুনাফিকের কোনও আলামত থাকা উচিত নয়।

---

২২৬. সহীহ বুখারী : ৩৩, ২৭৪৯ ,২৬৮২

২২৭. সহীহ বুখারী : ৫১৪৩

২২৮. সূরা নিসা : ১৪৫

অনেক অশান্তির একটা কারণ এটাও হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোলযোগ, মনোমালিন্য এ কুধারণার কারণে হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকে সবচে' বেশি ভালোবাসা। কিন্তু সে ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায় একের প্রতি অন্যের কুধারণার কারণে। ভাই-ভাই, ভাই-বোন সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় কুধারণার কারণে। আর একবার যখন কুধারণা হয়, তখন তার ভালো কিছু দেখলেও সেটাকে ভালো চোখে দেখা হয় না।

মুনাফিকরা মুসলমানদের ভালো কাজকেও ভালো হিসেবে নিত না। যেমন, কেউ যদি খুব বেশি দান-সদাকা করত, তাহলে মুনাফিকরা বলত, আরে! এসব তো করছে মানুষকে দেখানোর জন্য। সাহাবায়ে কেরাম মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করতেন নাকি? তাদের সমস্ত কাজ ছিল আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করার জন্য। কিন্তু বেশি দান-সদাকা করলেই মুনাফিকরা বলত– এসব করে মানুষকে দেখানোর জন্য। আবার কোনও গরীব বেশি কিছু করতে পারে না, সারাদিন কুলিগিরি করে হয়তো সামান্য কিছু কামাই করেছে, তারপর সেই টাকা কেউ যদি আল্লাহর পথে খরচ করত, তাহলে মুনাফিকরা বলত– আরে, কী দাতা হয়েছ! তোমার এ দানের কোনও দরকার আছে? এটা আল্লাহর কী কাজে আসবে? এ সামান্য দান! তারা এটারও প্রশংসা করত না।

মুনাফিকীর স্বভাব হয়ে গেলে কারো ভালো কিছুকে ভালো চোখে দেখা হয় না। একবার কুধারণা হয়ে গেলে তার সব ভালো কাজকেও খারাপ চোখে দেখা হয়। যখন ভাই-বোনে গন্ডগোল হয়, কিংবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হয়, তখন একজন আরেকজনের ভালো কাজটাকেও ভালো চোখে দেখে না। সবকিছুই খারাপ চোখে দেখে। স্ত্রী যদি স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের বেশি বেশি খোঁজ নেয়, আর এর আগে কোনও কারণে স্বামীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে স্বামী এটাকেও ভালো চোখে দেখে না। অথচ এটা তো ভালো কাজ ছিল। স্ত্রীর তো কর্তব্য স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেওয়া। আগে যেহেতু একটা কুধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে, এখন এটাকেও ভালো চোখে দেখে না। কিংবা স্ত্রী যদি নিজের আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়, তখন ওইটাকেও ভালো

চোখে দেখে না। একবার কুধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই এখন মনে করে, সব টাকা বুঝি এখানে ঢালে। আমি যা কামাই করি সব তার বাবা-মায়ের পেছনে খরচ করে। যাহোক, আমি যা বলছি তা কোনও গালগল্প নয়।

অনেক পরিবারে স্বামী এবং স্ত্রীর মাঝে যুদ্ধ লেগে থাকে। এর শুরুটা হয়েছে কুধারণা থেকে। এ কারণে একজন আরেকজনের পেছনে লেগেই আছে। আল্লাহ তাআলা বিবাহের ব্যবস্থাটা দিয়েছেন পরস্পরের শান্তির জন্য। কিন্তু এখন কেবল অশান্তি আর অশান্তি। সামান্য একটা কুধারণা থেকেই এ অশান্তির সৃষ্টি। কাজেই আমরা কখনোই কারো ব্যাপারে কুধারণা করব না। আমাদের হতে হবে সুধারণা পোষণকারী।

## মুমিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা চাই

আমাদেরকে হুকুম দেওয়া হয়েছে– মুমিনদের বিষয়ে সুধারণা পোষণ করো। যদি কারো কোনও কিছু দেখ, তাহলে এটাকে ভালো ব্যাখ্যা করো যে, সম্ভবত সে এটা এ কারণে করেছে। তা ভালো দিকে নিয়ে যাও, মন্দ দিকে টেনে নিয়ো না। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে, একে মন্দ দিকে না টেনে ভালো দিকে নাও যে, হয়তো আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। কিংবা এভাবে নাও যে, ব্যাপারটা কী, তাকিয়ে আছে কেন, ছেলেটা কোথায় বের হয়ে গেছে কি না, এজন্য পেরেশান কি না, কিংবা কোনও মেহমান আসার কথা কি না, হয়তো সেজন্যই অপেক্ষায় আছে। এভাবে এর ভালো ব্যাখ্যা করো, মন্দ ব্যাখ্যা করতে যেয়ো না।

স্ত্রীও স্বামীর সব কাজের ভালো ব্যাখ্যা করবে। এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর ভালো ব্যাখ্যা করবে। শুধু শুধু সন্দেহ করতে যাবে না। খামোখাই তার গায়ের উপর কিছু চড়াবে না। আমার লাউগাছটা কে ছিড়ে নিল! নিশ্চয়ই সে এ কাজ করছে! আরে, লাউগাছ হয়তো কোনও কিছুর গায়ে লেগে ছিঁড়ে গেছে। শুধু শুধু প্রতিবেশীকে দোষারোপ করা কেন! আমার কোনও কিছুই সে ভালোভাবে নেয় না, সুন্দর লাউগাছটা দেখে গাছটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে, এ জাতীয় খামোখা

দোষারোপের ঘটনা অনেক ঘটে। শুধু শুধু আরেকজনকে সন্দেহ করেছে। অথচ সে এগুলো কিছুই করেনি।

কোনও এক প্রতিষ্ঠানে এক মহাগণ্ডগোল হয়েছিল কেবল এ কারণেই। কেউ ফুল্ল গাছ কেটেছিল। পরে এটাকে প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়। আসলে প্রতিপক্ষ এ কাজটা করেনি; বরং এ দুই পক্ষেরই শত্রু করেছে এ কাজ। তারা চেয়েছে– এ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যাক। আমরা যদি এটা কাটি, তাহলে নিশ্চয়ই একজন আরেকজনকে দোষ দেবে। শেষে তা-ই হয়েছে। মহাগণ্ডগোল বেঁধে গেল ফুল গাছকে কেন্দ্র করে। অথচ দুই দলের কেউই তা করেনি। এটা কেটেছে অন্য কেউ। এজন্য শুধু শুধু কাউকে সন্দেহ করতে নেই। বরং দোষের কাজ দেখলেও মনে করতে হবে এটা কোনও ভালো উদ্দেশ্যে করেছে।

## হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বর্ণনা আছে– একবার তিনি এক পাহাড়ে উঠলেন। সেখান থেকে দেখতে পেলেন, একটা লোক কিছু একটা চুরি করছে। তিনি তাড়াতাড়ি নামলেন। নেমে ধরলেন, এই তুমি এটা চুরি করলে কেন? সে লোক আল্লাহর নামে কসম করে বলল, আল্লাহর কসম! আমি চুরি করিনি। তখন তিনি বললেন, আমি আমার চোখকেই মিথ্যুক সাব্যস্ত করলাম আর তোমাকেই সত্যবাদী ধরে নিলাম।[২২৯] আমি ভুল দেখেছি। আসলে এটা আমার চোখের ভুল। তুমি যে আল্লাহর নামে কসম করলে, তাই বিশ্বাস করেছিলাম, তুমি চুরি করনি। বাস্তবে কিন্তু চুরিই করেছিল। কিন্তু যেহেতু আল্লাহর নামে কসম করেছে, ব্যস, তিনি আল্লাহর নামের মর্যাদা রক্ষা করলেন।

আমরা সন্দেহবশত কাউকে সন্দেহ করে বসি। এরপর যদি কসম করেও বলে– না, আমি করিনি, তারপরও তার কথা বিশ্বাস করি না। আমার সন্দেহটাই আসল। আমার মনে যে কুধারণা সেটাই আসল। সে হাজারবার বলছে– আমি তা করিনি, তুমি যা মনে করছ তা না; তবুও তার কথা বিশ্বাস করি না। আমার কুধারণাটাই আসল। অথচ তিনি নিজ

---

২২৯. সহীহ বুখারী : ৩৪৪৪

চোখে দেখেছেন, তারপরও যখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি চুরি করিনি, তখন বললেন– আমি আমার দেখাটাকেও ভুল মনে করলাম।

ওইরকম সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাও আছে। কেউ কারো কিছু দেখলেন, আর সে বলল, না এটা এ কারণে নয়, তখন তিনি বললেন– ঠিক আছে আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম, আমার দেখাই আসলে ভুল ছিল, তুমি যা বলছ তাই সত্য। কিন্তু আমাদের অবস্থা হল এই– সে যতই ব্যাখ্যা করুক, আমি তার ব্যাখ্যা মানতে রাজি হই না। রাজি হই না এজন্য যে, আমাদের মনটা নষ্ট হয়ে গেছে। বলা হয়ে থাকে–

كُلُّ اِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْه

সব পাত্র থেকে সেটাই ঝড়ে, যেটা তার পাত্রে আছে।

যদি মধুর বোতল কাত করা হয়, তাহলে কী পড়বে? মধুই তো পড়বে! আর কেরোসিনের বোতল উল্টে গেলে কী পড়বে? কেরোসিন পড়বে! পাত্রে যা থাকে, তার ভেতর থেকে তাই পড়ে। কেউ যদি কারো সম্পর্কে কুধারণা করে, তাহলে তার নিজের বুঝতে হবে, আমার অবস্থা বড় খারাপ। অন্য সম্পর্কে আমার কুধারণা কেন আসল? আমি সুধারণা না করে কুধারণা কেন করলাম? তার মানে আমার পাত্রটাই খারাপ। আমার ভেতরের অবস্থাই খারাপ, তাই আমার ভেতর থেকে সুধারণা না এসে কুধারণা এসেছে। তখন ওই ব্যক্তির সাথে তুলনা করে মনে করতে হবে, তার চেয়ে আমি অনেক খারাপ। তার প্রতি আমি কুধারণা করলাম, মানে আমার পাত্র খারাপ। আমি শুধু শুধু তার প্রতি কুধারণা করছি। নিজেকে সংশোধন করা খুব বেশি জরুরি। যারা অন্যের প্রতি কুধারণা করে, তাদের নিজেদের সংশোধন করা খুব বেশি জরুরি। মনের মধ্যে যদি কুধারণা আসে, তাহলে বুঝতে হবে অবস্থা খারাপ। নিজের বিচার নিজে করতে হবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

বুদ্ধিমান সেই, যে নিজের হিসাব করে। নিজেকে বিচার করে। আর মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য আমল করে।[২৩০]

---

২৩০. জামে' তিরমিযী : ২৪৫৯

যে নিজে নিজের হিসাব করে, সেই বুদ্ধিমান। অন্যের একটা কাজ দেখামাত্রই তার বিষয়ে কুধারণা কেন আসল? আগে নিজে নিজের হিসাব করো। যার সম্পর্কে কুধারণা করছ তারটা পরে, আগে নিজের হিসাব করো। তোমার তো উচিত ছিল তার বিষয়ে সুব্যাখ্যা করা, তার প্রতি সুধারণা করা। কুধারণা কেন করলে? তার মানে তোমার দিলটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নিজে নিজের ইসলাহ করো, সংশোধন করো, যাতে অন্যের সম্পর্কে নিজের ভেতরে কুধারণা সৃষ্টি না হয়। এ জিনিস তোমাকে ডোবাবে। তোমার দুনিয়া-আখিরাত সব বরবাদ করবে। দুনিয়ায় শান্তি নষ্ট করবে। যদি কারো এমন হয় যে, সব ব্যাপারে কেবল তার কুধারণা হয়, তাহলে সে কার সাথে চলবে? না স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক ভালো থাকবে, না বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে, না ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে, না আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে আর না প্রতিবেশীর সঙ্গে। কারো সঙ্গেই সে চলতে পারবে না; বরং একা হয়ে যাবে, একঘরে হয়ে যাবে। এ তো বাস্তবতা।

আমরা অধিকাংশই এমন। আমাদের খুব কম লোকের সঙ্গেই ভালো সম্পর্ক আছে। কারো সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকলেও তা খুব তাড়াতাড়িই নষ্ট হয়ে যায়। দুদিন পরপরই সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। দূরের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো আছে, আপন জনের সাথে সম্পর্ক ভালো নেই। নাই এ কারণে যে, কথায় কথায় কুধারণা করি। এতে করে প্রথমে দুনিয়া গেল। দুনিয়ায় একটু আরামে থাকতাম, তাও আর হল না। কারো সঙ্গে সম্পর্ক আমার ভালো যায় না কুধারণার কারণে।

আর আখিরাত তো যাবেই। আখিরাত যাবে এই কারণে যে, আখিরাতে মুক্তি পাবে কেবল সেই লোক–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

যেদিন কোনও অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।[২৩১]

২৩১. সূরা শুআরা : ৮৮-৮৯

মুক্তি পাবে সে-ই, যে আল্লাহর সামনে হাজির হবে ভালো মন নিয়ে। ওইখানে ভালো মন নিয়ে যেতে হবে। নিখুঁত নির্দোষ মন নিয়ে যেতে হবে। মনের মধ্যে খুঁত নিয়ে গেলে ওইখানে আটকা পড়তে হবে। অন্যের প্রতি কুধারণা, এটা তো অনেক বড় খুঁত। তোমার মনে কেন কুধারণা আসে? মন কেন উদার নয়? মন কেন এত সংকীর্ণ?

## কুধারণার সংশোধন

যদি কারো মনে কুধারণা হয়, তাহলে তাকে ভাবতে হবে– আমি খুব সংকীর্ণমনা। আমাদের একটা খাসলাত আছে। কথায় কথায় অন্যকে ছোটলোক বলি। ও একটা ছোটলোক, ওর মন সংকীর্ণ, ওর মন বড় নয়, ও খুব সংকীর্ণমনা– অন্যকে এসব বলে বেড়াই। অন্যে কী সংকীর্ণমনা, তুমি নিজেই তো সংকীর্ণমনা! অন্যের বিষয়ে কুধারণা কেন তুমি কর? তোমার মন বড় নয়, উদার নয়। তোমার মন যদি উদার হত, বড় হত, তাহলে অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করতে না।

মন যদি ছোট হয়, তাহলে অল্পতেই নষ্ট হয়ে যায়। কুয়োর পানি অল্পতেই নষ্ট হয়ে যায়। কুয়োয় যদি একটা ব্যাঙ পঁচে যায়, ব্যাঙ তো পানির মধ্যেই থাকে, তো কুয়োর ব্যাঙ যদি কুয়োয় মরে আর পঁচে, তাহলে সবটা পানি নষ্ট হয়ে যায়। পানি অল্প, তাই নষ্ট হয়ে গেছে।

আর সাগরে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী আছে। স্থলে যা আছে, তার থেকে বহুগুণ বেশি আছে সাগরে এবং তাও বড় বড়। একটা হাতির থেকে অনেক গুণ বড় হল একটা তিমি মাছ। এ পর্যন্ত কত তিমি মাছ সাগরে পঁচে গলে মরে গেছে। আবার স্থলেও যা-কিছু মরে পঁচে, সব তো পানিতে চলে যায়। বন্যা হয়, ঝড়-বৃষ্টি হয়, আর সব ধুয়ে ছাফ করে ফেলে। সাগরে এ পর্যন্ত কত কোটি কোটি প্রাণী মরে পঁচে গলে গেছে, কিন্তু সাগরের পানি হাজারো বছর আগে যেমন ছিল তেমনই আছে, নষ্ট হয়নি। সাগরের পানি কোনও কিছুতে নষ্ট হয় না আর কুয়োর পানি অল্পতেই নষ্ট হয়ে যায়। এটা কেন? কেননা সাগর বিশাল। তাই যত ময়লা-আবর্জনা ওখানে পড়ুক, তার পানি নষ্ট হবে না। আর কুয়ো ছোট্ট, তাই সামান্য ময়লাতেই তার পানি নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক ওইরকম, আমি যদি বড় মনের অধিকারী হতে পারতাম, তাহলে

ছোট্টখাট্ট জিনিস দেখলেই আমার মনে কুধারণা হত না। কোনও কিছুতেই কুধারণা সৃষ্টি হবে না, যদি মন সাগরের মতো বিশাল হয়। আর মন যদি সংকীর্ণ হয়, ব্যস, যা দেখি তাতেই কুধারণা সৃষ্টি হবে। মন নষ্ট। একটুতেই নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই অন্যকে কীভাবে সংকীর্ণমনা বলি? আমি নিজেই তো সংকীর্ণমনা। তাহলে কীভাবে কথায় কথায় অন্যের প্রতি কুধারণা করি?

তো অন্যের প্রতি কুধারণা করা, এটা কত কিছুর আলামত হলো? এক তো হলো এটা মুনাফিকীর আলামত। কারণ কুধারণা করত মুনাফিকরা। এমনিভাবে এটা সংকীর্ণমনা হওয়ার আলামত। মন বড় হলে অন্যের প্রতি কুধারণা করত না। এমনিভাবে এটা এরও আলামত যে, তার দিলটাই নষ্ট। সে নষ্ট মনের অধিকারী। নষ্ট মন বলেই এ নষ্ট ধারণা তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে। তার মন যদি ভালো হত, সে যদি ভালো মনের মানুষ হত, তাহলে অন্যের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হত না। তাহলে কত কিছুরই না আলামত এ কুধারণা করাটা! আবার এতে দুনিয়া-আখিরাত সব বরবাদ হয়। তাহলে কেন শুধু শুধু আমরা অন্যের সম্পর্কে কুধারণা করব? আল্লাহ তাআলা তাই সাবধান করছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাকো। কোনও কোনও অনুমান গুনাহ।[২৩২]

আল্লাহ তাআলা কত আদর করে ডাকছেন, হে মুমিনগণ! বিশ্বাসীগণ! যারা আমাকে বিশ্বাস কর, তোমরা কুধারণা পরিহার করো। কারো সম্পর্কে কখনো কুধারণা করতে যেয়ো না। কারণ এগুলো গুনাহ। কুধারণা গুনাহের কাজ। গুনাহ হয় বলে এটা পরিহার করো। এরপরই আল্লাহ তাআলা বলছেন–

وَّلَا تَجَسَّسُوْا

তোমরা কারো গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না।[২৩৩]

---

২৩২. সূরা হুজুরাত : ১২

২৩৩. প্রাগুক্ত

কুধারণা যখন কারো মধ্যে এসে যায়, তখন সে যার সম্পর্কে কুধারণা করে, তার পেছনে লেগে পড়ে। এখন সবকিছুতেই খোঁজ নেয়। লোক লাগিয়ে দেয়– এই দেখো তো, এ দুজন বসে বসে কী আলাপ করে! খবর নাও তো! মনে করছে যে, তার বিরুদ্ধে হয়তো কিছু বলছে। অমুককে দেখলাম অমুকের সঙ্গে কানাকানি করে, একটু খবর নিয়ো তো, ব্যাপারটা কী? তার সঙ্গে কানাকানি করছে কেন? লোক লাগিয়ে রাখে।

وَلَا تَجَسَّسُوا

গোয়েন্দাগিরি করো না। দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। একে অন্যের পেছনে লেগে থেকো না। যখনই কুধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়, গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয় বা নিজেই গোয়েন্দাগিরি করে। এটাও হারাম। নাজায়েয। অন্য কী করছে না করছে, সেটা অনুসন্ধানে লেগে পড়া কবীরা গুনাহ। কবীরা গুনাহ করে তখনই, যখন কুধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়।

وَلَا تَجَسَّسُوا

একে অন্যের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করো না। তার গোপন খবর খুঁজে বেরিয়ো না। সে কী না কী করছে, তার অনুসন্ধান আর তত্ত্ব তালাশে যেয়ো না। আল্লাহ নিষেধ করেছেন। এটা করা গুনাহ। তাহলে এক কবীরা গুনাহ থেকে কত রকমের কবীরা গুনাহ হচ্ছে।

তাই আমাদেরকে আপন আপন অবস্থার সংশোধন করতে হবে। মনে করতে হবে– আমার মনে যে অন্যের বিষয়ে কুধারণা আসে সেটা এজন্য যে, আমার মনের ইসলাহ হয়নি। আমি একজন দোষী মানুষ, দোষী মনের অধিকারী। তাই এখন থেকেই কুধারণার ক্ষতি কি কি, এদিকে লক্ষ করে করে কুধারণা পরিহার করতে হবে। কুধারণার ক্ষতি দু'ধরনের। এক হলো দুনিয়ার ক্ষতি, আরেক হলো আখিরাতের ক্ষতি। আখিরাতের ক্ষতি হলো বড় ক্ষতি। আর দুনিয়ার ক্ষতিও তো কম না, যেহেতু এর কারণে ঘরের শান্তি নষ্ট হয়, মনের শান্তি নষ্ট হয়। আর নানারকম পাপের শিকার হতে হয়ই। তাই সব রকমের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই কুধারণা পরিহার করে চলতে হবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

# নব্য এক ফিতনার মুখোমুখি মুসলিম সমাজ

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু (না আসে, বরং) এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।[২৩৪]

মুহতারাম ভাই, বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আসলে বয়ান করার মতো মন-মানসিকতা এখনো তৈরি হয়নি। কয়দিন যাবতই মন খুব খারাপ। মনটা বিপর্যস্ত। তাই বয়ান করাটা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরও আজ যেহেতু সবাই এসে

২৩৪. সূরা আলে ইমরান : ১০২

গেছে, আগে নিষেধও করা হয়নি, তাই আল্লাহ তাআলা যা বলার তাওফীক দান করেন, বলব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যেন সময়টাকে কাজে লাগানোর তাওফীক দেন।

## হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর ঘটনা

যখন হাদীছ পড়ছিল, একটা কথা মনে পড়েছে। হযরত সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-এর জীবনী পড়া হয়েছে। খুব সংক্ষেপে বলা হয়েছে এখানে। তাঁর জীবন তো বর্ণাঢ্য জীবন। কর্মবহুল জীবন। ইসলামের শ্রেষ্ঠ দশজন ব্যক্তির একজন তিনি। তিনি ইসলামের এক বীর সেনানী এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধের সেনাপতিও। ওই যুগের দুই বৃহৎ শক্তির একটা ছিল সাসানী সম্রাজ্য। সে সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল বর্তমান ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার এক বিস্তৃত এলাকা। এ বিশাল এলাকা সাসানী সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এর সম্রাট ছিল 'কিসরা'। 'কিসরা' তার উপাধি। আরবীতে 'কিসরা' আর ফারসীতে 'খসরু'। নাম ছিল পারভেজ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে চিঠি লিখেছিলেন ইসলামের দাওয়াত দিয়ে। চিঠির শুরুতে লেখা ছিল,

من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে।[২৩৫]

চিঠির এ অংশটুকু দেখেই কিসরার গায়ে যেন আগুন লেগে গেল। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নাম আগে লিখেছেন আর তার নাম পরে লিখেছেন। সে এটাকে একটা স্পর্ধা মনে করেছিল। আমার নামের আগে নিজের নাম লেখে! স্পর্ধা তো কম নয়! এ বলেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

২৩৫. দালাইলুন নুবুওয়্যাহ : ৪/৩৮৮

সাল্লাম বললেন, সে আমার চিঠি ছিঁড়েছে, আল্লাহ তাআলা তার রাজত্বকেও ছিন্নভিন্ন করে ফেলবেন। তাই হয়েছে। নিজ পুত্রের হাতেই মারা গেছে। নিজ পুত্র শেরওয়াইহ এর হাতেই নিহত হয়েছে। সে অনেক ঘটনা।

নিহত হওয়ার পর তার বোন রানী হয়েছে। তারপর দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পরে ইয়াযদাগিরদ ক্ষমতা লাভ করেছে। ওই সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. হিজরী ১৩ সালে ইরানীদের বিরুদ্ধেও এক সেনাবাহিনী পাঠান এবং রোমানদের বিরুদ্ধেও এক সেনাবাহিনী পাঠান। রোমানদের বিরুদ্ধে যে সেনাবাহিনী পাঠান, তার সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযি.। আর এ ইরানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে সেনাপতি পাঠান, তার সেনাপতি ছিলেন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি.। প্রথমে যুদ্ধ দজলা নদীর পশ্চিম পারে হয়েছে। টাইগ্রিসের পশ্চিম পারে কাদেসিয়া নামের এক জায়গায়। এতে ইরানী বাহিনী পরাজিত হয়। পরাজিত হয়ে তারা নদীর পুব পারে চলে যায়। পুব পারেই ছিল তাদের রাজধানী মাদায়েন। তখন সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি. সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, এসো আমরা পুব পারে যেয়েই ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। এ যুদ্ধের কাহিনী এত লম্বা যে, বলতে কয়েকদিন দরকার।

## দজলা নদী পার হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা

আমি মূল কথাটা বলছি। ইরানীরা সন্দেহ করেছে যে, মুসলিম বাহিনী পুব পাড়ে এসে হামলা চালাতে পারে। এ কারণে তারা সেতু ভেঙ্গে দিল। সেতু ছাড়া কি নদী পার হওয়া যায়! সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি. বললেন, চলো, আমরা সেতু ছাড়াই এ নদী পার হব। প্রত্যেকে নদীতে নেমে পড়ো। যে যেভাবে ছিল সেভাবেই নেমে গেল। যিনি ঘোড়ার পিঠে ছিলেন তিনি ঘোড়া নদীর উপর দিয়ে চালিয়ে দিলেন। যিনি উটের পিঠে ছিলেন তিনি উট নদীর উপর দিয়ে চালিয়ে দিলেন। আর যিনি খালি পায়ে ছিলেন তিনি খালি পায়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইসলামী ইতিহাসের এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। এ সেনাবাহিনীর

প্রত্যেকেই একদম নিরাপদে এ নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহ।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, আমাদের কাছে মনে হয়েছিল, নদী শুকিয়ে গেছে, পানি নেই। অথচ তখন দজলা নদী দুনিয়ার সবচে' ভয়ংকর নদীগুলোর একটি। কবি ইকবালের একটা কবিতা আছে–

اے موج دجلا تو بھی پہچانتی ہے ہم کو

হে দজলা নদী! তুমি কি আমাদেরকে চেন না? একদিন তোমার এ ঢেউয়ের সঙ্গে আমরা কত খেলেছি। তোমার এ ঢেউ কেটে কেটে আমরা এ পারে চলে এসেছি। তো সবাই অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে নদীর এ পারে চলে এসেছেন। এমনকি কারো কিছু হারায়ওনি।

ওপারে যাওয়ার পরে এক সৈনিক দেখলেন, তার একটা বাটি ছিল সঙ্গে, সে বাটিটা নেই। তিনি বললেন, এ সৈন্যদের কারো কিছু হারায়নি, আমার একটা বাটি হারিয়ে যাবে? তাহলে তো আমি এ বাহিনীতে একজন নিন্দনীয় লোক হয়ে থাকব। এ বলতেই দেখা গেল, ঢেউয়ের তালে তালে ওই বাটিটা তীরের দিকে চলে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই বাটিটা তার কাছে চলে আসল।

ওই বাটি তুলে নিয়ে তিনি অন্যদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এরপরের কাহিনী অনেক লম্বা। যাহোক, এটা সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের একটা কারামত। নবীগণের থাকে মু'জিযা। আল্লাহ তাআলা নবীদের মাধ্যমে এমন এমন ঘটনা ঘটান, স্বাভাবিকভাবে যা সম্ভব না। ওইরকম যারা আল্লাহ তাআলার খাস বান্দা, নবী নন, তাদের দ্বারাও আল্লাহ তাআলা এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাসের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা।

ঠিক এরকমের আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটেছিল হযরত 'আলা আল-হাযরামী রাযি.-এর মাধ্যমে। তিনিও বাহরাইনে সাগরের মোহনা পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিলেন তার বাহিনী নিয়ে, কোনও ধরনের বাহন ছাড়াই। তাদের মনে হয়েছিল, তাদের জন্য সাগর শুকিয়ে গেছে। এমন ঘটনা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে ঘটেছে। মূসা আলাইহিস সালাম লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে

এপারে চলে আসলেন। অতীতকালের এক নবীর বিস্ময়কর ঘটনার মতো সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে এরকম বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে।

## কূফার শাসনকর্তার পদ থেকে যেভাবে বরখাস্ত হলেন

সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি. আল্লাহর খাস বান্দা ছিলেন। যে দুআই করতেন, কবুল হয়ে যেত। এজন্য তাকে বলা হয়ে থাকে– মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াহ। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যার দুআ কবুল হয়। হযরত উমর ফারূক রাযি. তাঁকে কূফার গভর্নর বানিয়েছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধ তো শুরু করে দিয়ে গিয়েছেন হযরত আবূ বকর রাযি.। এরপর তাঁর ওফাত হয়ে গেল। তারপর হিজরী ১৪ সনে খলিফা হলেন হযরত উমর ফারূক রাযি.। ওই যুদ্ধ বহাল থেকেছে। কয়েক বছর ধরে ওই যুদ্ধ চলেছে। এক পর্যায়ে পুরো ইরানী সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধীনে চলে এসেছে।

কূফা জয় হওয়ার পর হযরত উমর ফারূক রাযি. সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-কে কূফার গভর্নর করে পাঠালেন। কূফার লোক সবসময় একটু ত্যাড়া কিসিমের। এরা সহজে কাউকে মানতে চায় না। কেমন উচ্ছৃঙ্খল। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস তখন গভর্নর। কূফার লোকজন খুব বিশৃঙ্খলা করছে। তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তারা তাঁর নামে নানা রকমের অপবাদ দিতে শুরু করল, যাতে খলিফা উমর ফারূক রাযি. তাঁকে এখান থেকে বরখাস্ত করে দেন। এ উপলক্ষে কূফার কয়েকজন লোক মদীনায় চলে গেল। গিয়ে আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাযি.-কে তারা বলল, আপনি এমন একজন লোককে আমাদের গভর্নর বানিয়েছেন, যে লোক ন্যায়বিচার করে না আর যুদ্ধে অন্যদেরকে পাঠায়, নিজে যায় না। আবার গনীমতের মালও ঠিকভাবে বণ্টন করে না।

لا يَسِيرُ بالسَّرِيَّةِ، ولَا يَقْسِمُ بالسَّوِيَّةِ، ولَا يَعْدِلُ في القَضِيَّةِ

তিনি নিজে যুদ্ধে যান না, গনীমতের মাল সমানভাবে বণ্টন করেন না এবং বিচার-আচারে ইনসাফ করেন না।[২৩৬]

---

২৩৬. সহীহ বুখারী : ৭৫৫, মুসলিম : ৪৫৩

উমর ফারূক রাযি. সা'দ রাযি.-কে ডেকে পাঠালেন। চিঠি পাওয়ামাত্রই সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি. মদীনায় চলে গেলেন। তিনি গেলে উমর ফারূক রাযি. বললেন– সা'দ, তোমার বিরুদ্ধে এই এই অভিযোগ। এমন কি তারা তোমার নামায সম্পর্কেও অভিযোগ করেছে। তুমি কী বল? তিনি সবগুলো অভিযোগেরই জবাব দিলেন। সে জবাবে উমর ফারূক রাযি. সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কিন্তু তারপরও উমর ফারূক রাযি. ন্যায়বিচারক। আসামির কথা শুনেই তাকে খালাস দিলেন না।

তিনি তদন্তের জন্য কূফায় লোক পাঠিয়ে দিলেন। তদন্তকারী দল কূফার একেক মসজিদে যায় আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের গভর্নর কেমন মানুষ? প্রত্যেকেই তাঁর প্রশংসা করে। এক মসজিদে গেলে সেই মসজিদের এক লোক বলে উঠল, সা'দ ঠিকভাবে বিচার করে না, গনীমতের মাল ঠিকভাবে বণ্টন করে না, যুদ্ধেও পিছিয়ে থাকে। সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি. সেখানে হাজির। তাঁর সামনেই ওই ব্যক্তি এ কথাগুলো বলল। এ কথা বলতেই সা'দ রাযি. আল্লাহর কাছে দুআ করলেন–

أَما واللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هذا كَاذِبًا، قَامَ رِيَاءً وسُمْعَةً، فأَطِلْ عُمْرَهُ، وأَطِلْ فَقْرَهُ، وعَرِّضْهُ بالفِتَنِ

হে আল্লাহ! এই যে লোকটা আমার নামে এ কথাগুলো বলল, যদি সে এটা মানুষকে দেখানোর জন্য বলে থাকে যে, দেখো, কেমন বাহাদুর আমি! সা'দের মুখের উপর কথা বলে দিই, তবে হে আল্লাহ! তুমি তাকে দীর্ঘায়ু দিয়ে শাস্তি দাও। এমন লম্বা আয়ু দাও, যাতে সে বেঁচে থাকার প্রতি বিরক্ত হয়ে যায়। জীবনটাই যেন দুর্বিষহ হয়ে যায়। আর হে আল্লাহ! তাকে চরম দারিদ্র্য দাও এবং তুমি তাকে এক দৃষ্টান্তমূলক ফিতনার সম্মুখীন করো।[২৩৭]

তিনি এ কথা বললেন এবং তা বলা দরকারই ছিল। কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ দশজন সাহাবীর একজন। তাঁর নামে কেউ অপবাদ দিলে দুনিয়াতেই

---

২৩৭. প্রাগুক্ত

তার বিচার হওয়া দরকার ছিল। তা না হলে, সা'দ রাযি. যদি মানুষের মাঝে বিতর্কিত হয়ে থাকতেন, তাহলে সব সাহাবীর প্রতি মানুষের সন্দেহ হত যে, একজনের যখন এ দশা, বাকিরা যেন কেমন! তাই আল্লাহ ঠিকই শাস্তি দিলেন।

তিনটা অপবাদ দিয়েছে আর তিনি তিনটার জন্য তিনটা বদদুআ দিয়েছেন। তাই হল। ওই ব্যক্তির জন্য সা'দ রাযি. যে বদদুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা কবুল করলেন। ফলে তার বয়স এত বাড়ল যে, চোখের ভ্রু ঝুলে গেল। ঝুলতে ঝুলতে এত ঝুলল যে, তাকাতে হলে ভ্রু তুলে তাকাতে হয়। অনেক বয়স হয়ে গেলে ভ্রু ঝুলে পড়ে। তার এত ঝুলে পড়েছে যে– তাকাতে হলে এটা টেনে উপরে উঠাতে হয়, না হলে তাকাতে পারে না। এবং এমন ফকির হয়ে গেছে যে, মানুষের দুয়ারে দুয়ারে মসজিদে মসজিদে গিয়ে ভিক্ষা করে। আর এমন একটা ফিতনার সম্মুখীন হয়েছে, আল্লাহ আমাদের সবাইকে মাফ করুন, ওই বৃদ্ধ বয়সেও সে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করত। মেয়েদের পেছনে লেগে থাকত। এটা ছিল আল্লাহর আযাব, শাস্তি। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বলত–

أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ

আমার উপর সা'দের বদদুআ লেগে গেছে।

## হযরত উমর রাযি.-এর দূরদর্শিতা

যাহোক, উমর ফারূক রাযি. সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। তদন্তকারী দলও গিয়ে দেখল– সবাই তাঁর প্রশংসা করে। যাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সা'দ জান্নাতবাসী, তিনি বুঝি এ সমস্ত ফালতু কাজ করবেন! তো তাঁর দুআ কবুল হয়ে গেল। কিন্তু তারপরও শিক্ষণীয় বিষয় যেটা, সেটা হল এই– উমর ফারূক রাযি. কূফার গভর্নর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরও তাঁকে বরখাস্ত করেছেন। কারণ কিছু লোক যখন তাঁর বিরুদ্ধে কথা তুলেছে, একটা বিতর্ক তো তার বিষয়ে হয়ে গেছে। যার বিষয়ে সামান্যতম বিতর্ক আছে, তাকে আমীর পদে রাখা ঠিক না।

তাহলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা হবে না। গভর্নরকে আমীর বলা হয়। আরবী যারা জানে তাদের এটা জানা আছে। যার বিষয়ে কিছু বিতর্ক আছে, হোক না সে বিতর্ক ভিত্তিহীন, তারপরও তাকে যদি আমীর রাখা হয়, তাহলে অধীনদের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কানাঘুষা হবে। কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে, ফলে তার প্রতি পুরো অনুগত থাকবে না। তাই শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে তাকে আমীর পদে রাখা যায় না। সুতরাং তিনি তাকে বরখাস্ত করলেন। এই হলো উমর ফারূক রাযি.-এর শাসন। এটা একটা শিক্ষণীয় জিনিস না? অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, বরং প্রমাণিত হয়েছে– এ অভিযোগ ভিত্তিহীন, সম্পূর্ণ বানোয়াট, তারপরও তাকে গভর্নর পদে রাখেননি, বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

এরপর জীবনের সবশেষে যখন উমর ফারূক রাযি. শহীদ হন, মৃত্যুর কাছাকাছি যখন, যাই খান তাই পেট থেকে বের হয়ে যায়, ওই সময় পরবর্তী খলিফা কে হবেন এর জন্য তিনি এক শূরা তৈরি করলেন। ছয়জনের একটা শূরা তৈরি করলেন যে, এই শূরার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেবে। সে শূরার একজন সদস্য বানালেন কাকে? সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি.-কে। নিজের ছেলেকেও বানাননি। নিজ ছেলে আব্দুল্লাহ একজন বিশিষ্ট সাহাবী। অনেক বড় সাহাবী। সেরা সাহাবীদের একজন। তাকেও এ ছয়জনের মধ্যে রাখেননি। অনেকে বলেছিল, হয় আব্দুল্লাহকে খলিফা বানিয়ে দিন, অথবা এ ছয়জনের শূরার মধ্যে তাকে রাখুন। তিনি বললেন, অসম্ভব! তার বাবা এ মুসীবত ভোগ করেছে, এটা কি তার জন্য যথেষ্ট না? খলিফা হওয়ার যে মুসীবত এটা তার বাবা ভোগ করেছে, এটা কী তার যথেষ্ট হয়নি? সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আমাদের জন্য কত শিক্ষা! পদে পদে শিক্ষা পাওয়া যায়।

তো তিনি ওই ছয়জনের একজন হিসেবে সা'দ রাযি.-কে রাখলেন আর বললেন, শোনো, তোমরা এ ছয়জনের যে-কাউকে খলিফা বানাতে পার, আমার কোনও আপত্তি নেই। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ছয়জনের প্রতিই খুশি ছিলেন। এমনকি সা'দকেও বানাতে পার। তোমরা মনে রেখো, সা'দকে যে বরখাস্ত করেছিলাম, এটা এজন্য নয় যে, সে অপরাধী। সে অপরাধী বলে তাকে বরখাস্ত

করিনি। বরং এটা শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে করেছি। তার কোনও অপরাধ ছিল না, তা সত্ত্বেও গভর্নর পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছি।

আর আমাদের কী অবস্থা! আমরা দীনের কী অনুসরণ করি? অপরাধ প্রমাণিত হলেও আমরা জেদ ধরি– না, তাকেই রাখতে হবে, ক্ষমতায় তাকেই রাখতে হবে। এর নাম দীন না; এটা অহমিকা।

الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ النَّاسِ

অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা, অন্যকে তুচ্ছ করা।[২৩৮]

সত্য যখন প্রমাণ হয়ে যায়, তখন তা গ্রহণ না করা একটা ইহুদী খাসলত। ইহুদীরা ঈমান আনতে পারেনি। তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনত। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, নিজের ছেলে-মেয়েকে যেমন চেনে, ইহুদীরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওইরকম চেনে যে, তিনি সত্যি আল্লাহর নবী। কিন্তু খাসলতের মধ্যে জেদ। এ জেদের কারণে তাদের ঈমান নসীব হয় না। সত্য প্রমাণ হলে মুমিনের কাজ তা গ্রহণ করে নেওয়া।

## হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর নমনীয়তা

উমর ফারূক রাযি. একবার আপত্তি করলেন– কী ব্যাপার! মেয়েদের মাহ্‌র এত বেশি কেন? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত কম কম মাহ্‌র ধরতেন। তাঁর মেয়েদের মাহ্‌র ছিল চারশ দিরহাম। স্ত্রীদের মাহ্‌রও চারশ দিরহাম। যার পরিমাণ বর্তমানে লাখ দেড়েক টাকা হয়। বললেন– কী বিষয়! তোমরা তো আজকাল খুব বেশি বেশি মাহ্‌র ধরছ? এরপর যদি আমি দেখি কোনও মহিলার মাহ্‌র বেশি ধরা হচ্ছে, তাহলে ওই চারশ দিরহামের বেশি যা, সব আমি তাদের কাছ থেকে জব্দ করে বাইতুল মালে জমা করে দেব।

এ কথা বলতেই এক মহিলা আসলেন। বললেন, উমর! আমাদেরকে আপনার হুকুম মানতে হবে, না কুরআন আর হাদীছ মানতে হবে?

---

২৩৮. সহীহ মুসলিম : ২৭৫, ৪০৯২

আমরা কাকে মানব, কুরআন-হাদীছ, না আপনার হুকুম? তিনি বললেন, অবশ্যই কুরআন-হাদীছ। তাহলে আপনাকে এ অধিকার কে দিল যে, কুরআন-হাদীছের বিপরীতে আপনি আইন জারি করে দেবেন? উমর রাযি. বললেন, কেন, আমি কী করেছি? তিনি বললেন, আল্লাহ তো বলেছেন, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا – যদি তাদের একজনকে অগাধ মাহর দিয়ে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিয়ো না।[২৩৯]

রাশি রাশি স্বর্ণ দেওয়ার কথা অনুমোদন করেছে কুরআন। কোনও সীমা বলে দেয়নি যে, এ পরিমাণ দিতে হবে বা এর বেশি দেওয়া যাবে না। চাইলে রাশি রাশি স্বর্ণও দিতে পারে কেউ। অথচ আপনি বলছেন– চারশ দিরহাম রূপা, এর বেশি দেওয়া যাবে না! কে দিল আপনাকে অধিকার? উমর রাযি. বললেন, আল্লাহ! মদীনার একজন মহিলাও দেখি উমরের চেয়ে বেশি জানে। এরপর বললেন, আমি আগে যা হুকুম দিয়েছিলাম তা বাতিল ঘোষণা করা হল। প্রত্যেকের এখতিয়ার, তারা যা ইচ্ছা তাই মাহ্‌র নির্ধারণ করতে পারে।[২৪০]

এর নাম ইসলাম। হক এবং সত্য যখন সামনে এসে যাবে, তখন নিজের মতামত যাই হোক না কেন, তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। ছুঁড়ে ফেলতে হবে ডাস্টবিনে। কেননা কুরআন আর হাদীছের সামনে আমার মতামত ডাস্টবিনেই ফেলার যোগ্য।

ওই তো ছিল এক সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস, আর আহা! আজকেও আমরা এক সা'দকে নিয়ে আছি। কিন্তু এ সা'দ সারা পৃথিবীতে একটা ফিতনা সৃষ্টি করে দিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ ইলইয়াস রহ.-এর রক্ত তার শিরায় প্রবাহিত। কত উঁচু বংশের মানুষ। উঁচু বংশ হলেই তো হবে না; উঁচু বংশের গুণও থাকতে হবে। নূহ আলাইহিস সালামের ছেলে কেনান। সে তো নবীর সন্তান। কিন্তু হলে হবে কী! নবীর গুণ তার মধ্যে ছিল না। আমরা দুআ করি, ইলইয়াস রহ.-এর গুণটাও সা'দ সাহেবের মধ্যে এসে যাক।

---

২৩৯. সূরা নিসা : ২০

২৪০. ইবনে কাছীর, মুসনাদুল ফারূক : ২/৫৭৩

# নব্য ফিতনার কারিগর

আজ ক্ষমতার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী এ ফিতনা। আজ যদি তিনি একটা কথা বলে দেন, মাত্র একটা কথা যে, আমার আমীর হওয়ার কোনও দরকার নেই। মুরুব্বীরা আসুন, আপনারা মিলে পরামর্শ করুন, আপনারা সবাই মিলে যে ফায়সালা করবেন, আমি সেটা মেনে নেব। তাহলে তো মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের মধ্যে পানি পড়ে যায়। আগুন মুহূর্তের মধ্যেই নিভে যেতে পারে। কিন্তু তা না, জেদ ধরে বসে আছেন এবং এমন এমন কথা বলছেন, যেগুলো সম্পূর্ণ তার বাবা-দাদার আদর্শের পরিপন্থী। সারা জীবন আমরা শুনে এসেছি, তাবলীগের যে ছয় উসূল, সে ছয় উসূল আসল দীন নয়; বরং পুরোপুরি দীনের উপর যাতে চলা যায়, তার জন্য এটা এক অবলম্বন। যদি এ ছয় নম্বারের উপর কেউ চলে, তাহলে তার পক্ষে পুরোপুরি দীনের উপর চলা সহজ হবে। কথা তো এই-ই। কিন্তু উনি কী বলছেন? তার কথা হল এটাই দীন। তার সমস্ত বয়ানের রেকর্ড আছে। সবকিছু সংরক্ষিত আছে। আজ তিনি এক নব্য ফিতনার মহা কারিগর। অনুসারীদের নিয়ে চলছেন নতুন এক পথে, তার মহান পিতৃপুরুষদের চলা পথের বাইরে অন্য অচেনা এক পথে।

তার বাবা-দাদা শায়খের হাতে বায়আত হওয়াকে জরুরি মনে করতেন। তার বাবা-দাদা সবাই কোনও শায়খের খলিফা ছিলেন। নিজের ইসলাহের জন্য সবাই বড় বড় শায়খের কাছে গেছেন। খোদ ইলইয়াস রহ. হযরত গাঙ্গুহী রহ. এর খলিফা ছিলেন। ইলইয়াস রহ.-এর ভাই ইয়াহইয়া কান্ধলবী রহ.-ও গাঙ্গুহী রহ. এর খলিফা। আমাদের বাংলাদেশের বড় মুরুব্বী ছিলেন আব্দুল আজীজ রহ., আলী আকবর সাহেব রহ.। তারা ছিলেন হযরত শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া রহ. এর খলিফা। তারা নিজের ইসলাহের জন্য শায়খের কাছে যাওয়া জরুরি মনে করতেন। আর উনি বলেন, কী আশ্চর্য! তোমরা ইসলাহের জন্য মানুষের কাছে দৌড়াদৌড়ি কর! তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, ইসলাহী সম্পর্ক কার সাথে, তবে বলবে, দাওয়াত ও তাবলীগের সঙ্গে। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করলেই ইসলাহ হয়ে যাবে। এর

বাইরে আর কিছু দরকার নেই। এর বাইরে আর কিছু দরকার নেই, এটা উনি এতই বুঝে ফেলেছেন যে, তার বাবা-দাদারাও তা বুঝেনি? তার বাবা-দাদারা এতই অজ্ঞ ছিলেন? তার বাবা-দাদা তাবলীগ কেন করেছেন? ইলইয়াস রহ. বলেছেন, তাবলীগের মেহনত আমি এজন্য করেছি, যাতে 'আমলোক উলামামুখী হয়। আর আজকে উনি কী করছেন? 'আমলোকের মনে উলামায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।

কেমন বিদ্বেষ? ইসলামের ইতিহাসে এমন ঘটনা পাওয়া কঠিন। আলেম-উলামাকে আগেও মানুষে মেরেছে। কিন্তু কারা মেরেছে? মেরেছে বেদীন কিসিমের লোক। বৃটিশরা আলেমদেরকে ধরে ধরে ফাঁসি দিয়েছে। এর আগেও শাপলা চত্বরে যা হয়েছে, সেটাও রাজনীতি। রাজনৈতিক যারা ক্ষমতাসীন, তারা শাপলা চত্বরে আলেমদের উপর হামলা করেছে। কিন্তু মুসল্লী কিসিমের মানুষ? তারা কখনো আলেমদের উপর হামলা করেছে এমন আছে কোথাও? অথচ আজ দাওয়াত ও তাবলীগের নামে আলেমদের উপর হামলা! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

> ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا حقه
>
> যে ব্যক্তি বড়কে সম্মান করে না, ছোটকে স্নেহ করে না, আলেমদেরকে সম্মান করে না, তাজীম করে না, সে আমাদের উম্মতের অংশ নয়।[২৪১]

আলেমদেরকে মুহাব্বত করা ঈমানের অঙ্গ। এ হাদীছ তো সকলেই জানে এবং তাবলীগেও এ হাদীছের চর্চা করা হয়। ইকরামুল মুসলিমীনের আলোচনা যখন হয়, তখন তো এ কথা আসে। আলেমকে তাজীম করতে হবে। আলেমকে তাজীম না করলে তখন সে এ উম্মতের একজন থাকে না। যারা এ হাদীছের চর্চা করছে, আজকে তাদের কী দশা! মাসুম বাচ্চাদের পর্যন্ত মেরেছে। হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, পা ভেঙ্গে

---

২৪১. তবারানী, মাকারিমুল আখলাক : ১৪৭; মুসনাদুশ শাশী : ১২৭৩

দিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তালেবে ইলম, এমন ছাত্রের সংখ্যা শত শত। যে তালেবে ইলম সম্পর্কে হাদীছে আছে যে, তাদের পায়ের নিচে ফিরিশতা ডানা বিছিয়ে দেন।[২৪২] এ তো সহীহ হাদীছ। একজন তালিবুল ইলমের মর্যাদা এতটাই যে, ফিরিশতা পাখা বিছিয়ে দেয় তার পথে পথে। তাদের জন্য নদীর মাছ পর্যন্ত দুআ করে। অথচ আজ সেই তাদেরকেই ধরে ধরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, হাত ভেঙ্গে দেওয়া, পা ভেঙ্গে দেওয়া! শত শত তালেবে ইলমের আজ এ দুর্দশা! কেউ তো এতটাই মার খেয়েছে যে, এখন মুমূর্ষু অবস্থায় আছে।

একজন বলছে আরেকজনকে– আপনার ছেলেকে আলেম বানাবেন না, হাফেজ বানাবেন না, তাহলে গোমরাহ হয়ে যাবে। একটা নির্ভরযোগ্য সূত্রে শোনা। বলে, আপনার ছেলেকে হাফেজ বানাবেন না। হাফেজ না বানানো মানে কী? কুরআন মুখস্থ করাবেন না। কুরআন মুখস্থ করলে সে গোমরাহ হয়ে যাবে। এরচেয়ে বেঈমানী কথা আর হতে পারে? কুরআন মুখস্থ করা কত বড় ফযীলতের কাজ। আর সে আরেকজনকে উপদেশ দিচ্ছে, হাফেজ বানাবেন না। বানালে গোমরাহ হয়ে যাবে। হিফজ করার প্রতি কী বিদ্বেষ! অথচ হাফেজ হল আল্লাহর কর্মী। আল্লাহ হাফেজদেরকে দিয়ে, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে দিয়ে কুরআনের হেফাজত করাচ্ছেন। এরা তো আল্লাহর কর্মী। আর তার উপদেশ হল– আপনার ছেলেদেরকে আল্লাহর কর্মী বানাবেন না। কী ভয়ানক কথা!

## বাদশাহ আলমগীরের ঘটনা

এখানে একজন আছে। মাসআলার দরকার হলে আমার কাছে আসে। আবার পেছনে বলে– আলেম উলামারা তো আমাদের পকেটের মধ্যেই। আলেমদের এ কেমন সম্মান করা হল? একটা সময় ছিল, আলেমদেরকে মানুষ কী সম্মান করত!

বাদশাহ আলমগীর!

কুমারে তাঁহার পড়াইত এক মৌলভী দিল্লীর...

---

২৪২. সুনানে আবূ দাউদ : ৩৬৪১

এ কবিতা তো অনেকেই জানে। বাদশাহ আলমগীরকে বলা হয়ে থাকে শেষকালের খলিফায়ে রাশেদ। এত বড় আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তার ছেলে এক আলেমের কাছে পড়ত। একদিন ওই আলেম ওযু করছিলেন আর তার ছেলে পানি ঢেলে দিচ্ছে। অর্থাৎ যুবরাজ পানি ঢেলে দিচ্ছে আর উনি নিজে পা ধুয়ে নিচ্ছেন। এটা বাদশাহর চোখে পড়েছে। চোখে পড়লে তিনি সে আলেমকে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আমার ছেলেকে কি আদবকায়দা কিছু শিখিয়েছেন? তিনি বললেন, ব্যাপার কী? বাদশাহ বললেন, আমি তো দেখলাম আমার ছেলে বেয়াদবি করছে। আপনি ওযু করছেন আর সে পানি ঢেলে দিচ্ছে, পা ধুইয়ে দিচ্ছে না! তার তো কাজ ছিল পা ধুইয়ে দেওয়া, অথচ সে কেবল পানি ধুয়েই খালাস। তাহলে কী আদব সে শিখেছে? এককালে রাজা বাদশাহরা আলেমদেরকে এমন সম্মান শ্রদ্ধা করত।

## বাদশাহ মামুনুর রশীদের ঘটনা

বাদশাহ মামুনুর রশীদ। আব্বাসীয় খলিফাদের ভেতর সবচে' বিজ্ঞজন। তার মধ্যে কিছু ওলটপালটও ছিল। তারপরও তার দুই ছেলেকে ইমাম ফাররা, যিনি একজন বিখ্যাত ইমাম, এর কাছে পড়াতেন। এ দুই ছেলে তাদের হুজুরের খেদমত করার জন্য পাগল হয়ে থাকত। একদিন আমীরুল মুমিনীন মামুনুর রশীদ দূর থেকে লক্ষ করলেন যে, তাদের ওস্তাদ বের হবে, এ অবস্থায় তার পায়ে জুতা কে পরিয়ে দেবে এ নিয়ে তার দুই পুত্রের মধ্যে কাড়াকাড়ি। দুই পুত্রই চাচ্ছিল তার পায়ে জুতো পরিয়ে দেবে। দেখুন, রাজপুত্রের কারবার। তাও কত বড় রাজ্যের রাজপুত্র! আব্বাসীয় খেলাফত কত বড় ছিল? অত বড় রাজত্ব আজকাল পৃথিবীতে কার আছে? অত বড় রাজত্ব পৃথিবীতে কারো নেই এখন। আব্বাসীয় খেলাফত এত বড় ছিল। অত বড় রাজত্বের রাজা মামুনুর রশীদ। তার দুই ছেলে কাড়াকাড়ি করছে যে, হুজুরের পায়ে জুতো কে পরিয়ে দেবে! শেষপর্যন্ত দু'জনে মিলে সন্ধি করল। একটা কাজ হোক, তুমি একটা পরাও, আমি একটা পরাই। এরপর দুই ছেলে দুই পায়ে দুই জুতা পরিয়ে দিয়েছে।

এরপরের মজলিসে মামুনুর রশীদ জিজ্ঞেস করলেন ইমাম ফাররাকে– হযরত! এ কালের সবচে' মর্যাদাবান লোক কে? তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন ছাড়া আর কে হবেন? বললেন, না, এ যুগে সবচে' মর্যাদাবান লোক সেই, যার পায়ে জুতা পরিয়ে দেওয়ার জন্য খলিফার দুই ছেলে কাড়াকাড়ি করে। আগে তো এমনই ছিল। রাজা-বাদশাহরাও আলেম-উলামাদেরকে এমন শ্রদ্ধা করত। আলেম-উলামা যা বলত, তারা তাই শুনত।

## বাদশাহ শাহজাহানের ঘটনা

বাদশাহ আলমগীর আর তার বাবা শাহজাহান, এ দুইজনের মধ্যে একটু তিক্ততা ছিল। কারণ শাহজাহান তার পুত্র দারাসিকোর প্রতি দুর্বল ছিল। আর দারাসিকো ছিল যিনদীক। যিনদীক বলে ওই ব্যক্তিকে যে ইসলামের অপব্যাখ্যা দেয়। দারাসিকো সেটা ছিল। সে তার পরদাদা আকবর (আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর, তার ছেলে শাহজাহান আর তার বড় ছেলে দারাসিকো) দ্বারা ছিল প্রভাবিত। শাহজাহানের ইচ্ছা ছিল তার পরের বাদশাহ হবে দারাসিকো। অপরদিকে আওরঙ্গজেব আলমগীর মোল্লা জীওয়ান রহ.-এর ছাত্র এবং সেকালের আরো অনেক উলামায়ে কেরামের ছাত্র। তিনি তো একজন খালেস মুমিন। একবারে যাকে বলে গোঁড়া মুসলমান। তিনি এটাকে একটা বিপদ মনে করলেন। দারাসিকো যদি এ দেশের শাসক হয়, তাহলে এ দেশের ইসলাম, মুসলমান শেষ হয়ে যাবে। কাজেই তিনি এ ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। যুদ্ধে শেষপর্যন্ত তিনিই জয়ী হলেন। এরপর তিনি মোঘল বাদশাহ হলেন। পঞ্চাশ বছর শাসন করেছেন। তার বাবার সবসময়কার ইচ্ছা ছিল দারাসিকোকে বাদশাহ বানানো। অর্থাৎ বড় ছেলেকে। এ নিয়ে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে বাবার তিক্ততা ছিল। তাই আওরঙ্গজেব তাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। কারণ তিনি মুক্ত থাকলে, যেহেতু তিনি আগের বাদশাহ, জনগণ তার দলে ভিড়ে যাবে এবং শেষে তিনি দারাসিকোকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন, এজন্য তিনি বাবাকে দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। এ কারণে বাবার মনে কষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি দীনের স্বার্থে এটা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কথিত আছে– বাবা তার জীবনের শেষ দিকে ঘোষণা করলেন, যে যা চায়, আমার ক্ষমতায় যা আছে আমি তা দেব। আওরঙ্গজেব বাবার আরামের সব ব্যবস্থা করেছিলেন। যাহোক তিনি ঘোষণা করলেন– যে যা চায় আমি তাই দেব। এ ঘোষণা সারা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এ ঘোষণা মোল্লা জীওয়ানের কানে গেল। মোল্লা জীওয়ান অনুমতি নিয়ে বাদশাহ শাহজাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। দেখা করে বললেন– বাদশাহ! জাহাপনা! আপনি নাকি ঘোষণা করেছেন যে যা চায় আপনার ক্ষমতার মধ্যে যা আছে তা দেবেন?

বললেন– হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন।

তাহলে আমি আপনার কাছে যা চাই, আপনার ক্ষমতায় থাকলে তা দেবেন?

অবশ্যই দেব।

তিনি সম্রাট আলমগীরকে ডেকে নিয়ে গেলেন। ওস্তাদ বলেছেন, তিনিও পেছনে পেছনে ছুটেছেন। নিয়ে দুর্গের ভেতর ঢুকলেন এবং শাজাহানের সামনে হাজির হলেন। গিয়ে বললেন, আজকে আপনার কাছে একটা কামনা, আর তা হলো এই– আপনি আপনার এ পুত্রকে ক্ষমা করে দিন। শাজাহান জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। জীবনের শেষ অবস্থা। বললেন, হযরত! আপনি যখন বলেছেন, আমি আমার পুত্র আওরঙ্গজেবকে চিরদিনের জন্য ক্ষমা করে দিলাম। আমার মনে তার প্রতি আর কোনও রাগ ক্ষোভ নেই। এরপর তো বাবায়-ছেলেতে জড়াজড়ি আর কান্নাকাটি।

আলেমদের এমন মর্যাদা সবসময় ছিল। এখনও আছে। যারা আলেমদের মর্যাদা বোঝে, তাদের মধ্যে আছে। যারা সা'দপন্থী, সবাই যে ওইরকমের, তা আমি বলি না। নিশ্চয়ই নয়। অনেকে জানেই না, সা'দ সাহেবের কী ভুলত্রুটি। তারা মনে করছে, উনি নিযামুদ্দীনের আমীর, কাজেই তাকেই তো মানা উচিত। সহজ-সরলভাবেই চিন্তা করছে। কিন্তু যারা জানে, যাদেরকে বলা হয়, বারবার বোঝানো হয়, তারপরও যদি তারা এ ভুলের মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা তো মুশকিল।

যারা ওখানে আক্রমণ করেছে, তারা কী মন নিয়ে আক্রমণ করেছে আমি জানি না। তারা তো এটা জানে– যাদের উপর হামলা চালাচ্ছি, তারা মাদরাসার ছাত্র এবং এর মধ্যে অনেকেই আলেম। খুঁজে খুঁজে মেরেছে। যাকেই সামনে পেয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করেছে– তোমাদের হুজুর কে? যখনই দেখেছে কোনও হুজুর, আলেম, তাকে বেশি পিটিয়েছে। সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে সেই ফাতওয়া দেয়, তাই তাকেই বেশি মেরেছে। এরা কেমন? খুঁজে খুঁজে আলেমকে ছাত্রকে যারা মেরেছে, এদের কী অবস্থা! আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি তাদের জন্য। আমরা তাদেরকে বদদুআ দিই না; তাদের হিদায়াতের জন্য দুআ করি।

মিরপুর থেকে একজন ফোন করলেন, যিনি মিরপুরের একটা মাদরাসার পরিচালক, বললেন– এ এলাকার সবচে' বেশি উলামাবিরোধী যে, যে সা'দপন্থীদের নেতা, যে মানুষকে ডেকে ডেকে ওখানে নিয়ে গেছে, তার মেয়ে আমার মাদরাসায় পড়ে। এখন আমি কী করব? তার মেয়েকে রাখব না বের করে দেব? আমি বললাম, বাবার অপরাধের শাস্তি মেয়েকে দেওয়া যায় না। অপরাধ করেছে বাবা, মেয়ে তো অপরাধ করেনি। কাজেই বাবার অপরাধের শাস্তি মেয়েকে দেওয়া যায় না।

যাহোক, আমরা তাদের কারো অনিষ্ট চাই না। আমরা তাদের জন্য দুআ করি। তারা যে অপরাধ করেছে, এটা কঠিন অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন–

من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب

আমার ওলীর সঙ্গে যে শত্রুতা করে, তার সঙ্গে আমার যুদ্ধ।[২৪৩]

আলেমগণ নবীর ওয়ারিছ। নবীর ওয়ারিছ যদি আল্লাহর ওলী না হয়, তাহলে কে হবে? নবীর ওয়ারিছ যে, তার চেয়ে উপরের মর্যাদা আর কার হতে পারে? কাজেই এদের সঙ্গে যারা শত্রুতা করবে, আল্লাহ ক্ষমা না করলে এদের কপালে দুর্ভোগ আছে। আল্লাহ তাআলা জীবদ্দশাতেও শাস্তি দিতে পারেন এবং কবরেও দিতে পারেন। জীবদ্দশায় ওই বুড়োর

২৪৩. সহীহ বুখারী : ৬৫০২

মত অবস্থা হতে পারে। যে বুড়োর কথা বললাম যে, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাযি. এর সাথে শত্রুতা করার কী পরিণাম হয়েছিল। সুতরাং জীবদ্দশায় এ পরিণতি হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে, মরলে তাকে ধরা হবে। আমরা চাই– আল্লাহ তাদের নাই ধরুক। আমরা চাই তাদের ক্ষমার ব্যবস্থা যেন হয়ে যায়।

তাদের বোঝা উচিত যে, আমরা মহা অপরাধ করেছি। এবং যেন খুঁজে খুঁজে এ সমস্ত আলেমের কাছে যায় এবং ক্ষমা চেয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হক বোঝার এবং মানার তাওফীক দান করুন।

একটা জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সবসময় সা'দপন্থীদের সমর্থনে লেখে। ওখানেও এসেছে, এ দেশের দেওবন্দপন্থী আলেমগণ সা'দবিরোধীদের পক্ষে। তাহলে বোঝা গেল– দেওবন্দপন্থী উলামায়ে কেরাম সা'দ সাহেবকে সমর্থন করে না। আর যার চোখকান কিছু হলেও খোলা আছে, সে জানে, কেবল এদেশেই নয়; সারা পৃথিবীতে আজ সত্য এবং সত্যের প্রচারকারী হচ্ছেন উলামায়ে দেওবন্দই। সত্যের পতাকাবাহী তারা। দেওবন্দের আলেমগণ সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে আছেন। তা সত্ত্বেও কেউ যদি সা'দ সাহেবের পক্ষে থাকে, তার মানে সে আলেমদেরকে পরোয়া করে না। কেউ বলতে পারে যে, কোনও কোনও আলেম তো সা'দ সাহেবের পক্ষেও আছে। যদি কেউ থাকে, তাহলে সে দেওবন্দপন্থী নয়। দেওবন্দ পড়লেই দেওবন্দী হয়ে যায় না। বরং তাকে অবশ্যই দেওবন্দের আদর্শের উপর থাকতে হবে। দেওবন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সা'দ সাহেবের চিন্তা-ভাবনায় বিপথগামিতা আছে। তার আকীদা-বিশ্বাস আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী। কাজেই দেওবন্দে পড়ার পর, তাতে সে যত ভালোই পড়ুক না কেন, যদি সে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, তবে আর যাই হোক, সে দেওবন্দপন্থী আলেম নয়, তাতে সে যেই হোক না কেন। যখন দেওবন্দী আলেমগণ সা'দ সাহেবের পক্ষে নেই, তাই যে তার পক্ষাবলম্বন করে, সে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। আমি আশা করব, এখানে যারা আসেন তাদের মধ্যে

এমন কেউ যেন না থাকেন। আমি তার কল্যাণকামিতা থেকেই বলছি। কেননা–

الدِّينُ النَّصِيحَةُ

দীন কল্যাণকামিতার নাম।[২৪৪]

আমি তার কল্যাণকামিতায় বলছি– কিছুতেই যেন উলামায়ে কেরামের বিপক্ষে অবস্থান না নেয়। নিলে তার পরিণতি খুব ভালো হবে বলে আমি মনে করি না। আমাদের তো ঈমান নিয়ে মরতে হবে। মুসলিম অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। ঈমান ও ইসলাম ছাড়া মৃত্যু হলে কবরে ও হাশরে কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হবে। তাই আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ আদেশ করেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

> হে মুমিনগণ! অন্তরে আল্লাহকে সেইভাবে ভয় করো, যেভাবে তাকে ভয় করা উচিত। (সাবধান! অন্য কোনও অবস্থায় যেন) তোমাদের মৃত্যু (না আসে, বরং) এই অবস্থায়ই যেন আসে যে, তোমরা মুসলিম।[২৪৫]

ঈমান ও ইসলাম নিয়ে কবরে যাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা হল আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা এবং তাদের নিকট থেকে দীন শিখে, দীনের বুঝ নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

২৪৪. সহীহ মুসলিম : ২০৫

২৪৫. সূরা আলে ইমরান: ১০২



# মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্য

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، قال النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

আমি হাদীছের একটা অংশ পাঠ করেছি। এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শোনো! তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে– নিজ দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ।[২৪৬] একদিন আমাদের সবাইকে মরতে হবে। তারপর কিয়ামত হবে। হাশর হবে। সেখানে আল্লাহর দরবারে সবাইকেই হাজির হতে হবে। ওই সময় আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন– তোমার উপর যেই যেই দায়িত্ব ছিল সেগুলো কতটুকু পালন করেছ? কিছু দায়িত্ব তো আমরা সবাই জানি। নামায পড়া একটা দায়িত্ব। রোযা রাখা একটা দায়িত্ব। এমনিভাবে যার নেসাব পরিমাণ টাকা-পয়সা আছে তার যাকাত দেওয়া একটা দায়িত্ব। হজ্জে যাওয়ার

২৪৬. সহীহ বুখারী : ৮৯৩

সামর্থ্য থাকলে হজ্জে যাওয়াও একটা দায়িত্ব। এই প্রধান চারটা দায়িত্বের কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু এগুলোই শেষ না। এসব তো অবশ্যই দায়িত্ব। এ চারটা যে না করে, সে তো নিজেকে মুসলমান বলে দাবিই করতে পারে না। মুসলমান দাবি করা তার মুখে শোভা পায় না।

সে বলে– আমি একজন মুসলিম, অথচ সে নামায পড়ে না, তাহলে সে কেমন মুসলিম? যে রোযা রাখে না সে কেমন মুসলিম? যে ব্যক্তি দাবি করবে আমি মুসলিম, তাকে অবশ্যই নামায পড়তে হবে। আর পুরুষ হলে কেবল পড়লেই হবে না; মসজিদে জামাতের সঙ্গে পড়তে হবে। পুরুষের ফরয নামায যেমন মসজিদে পড়া জরুরি, তেমনি জামাতের সাথে পড়াও জরুরি। আর মহিলাদের জন্য উত্তম নিজ ঘরে নামায পড়া। নামায তাকেও পড়তে হবে। নামায থেকে রেহাই কারো নেই। মহিলাদের বিশেষ সময় আসে যখন তখন সে নামায পড়তে পারে না। কিন্তু ওই সময় ছাড়া যখন পাক-পবিত্র থাকে, তখন তাকে নামায অবশ্যই পড়তে হবে। আর তার জন্যে এটা ঘরে পড়া উত্তম।

## আপন জায়গা থেকে প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য

এর বাইরেও প্রত্যেকের উপরই আরো অনেক দায়িত্ব আছে। যেমন, কেউ যদি বাবা হয়ে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব তার সন্তানদেরকে দীনের উপর গড়ে তোলা। কেউ যদি বড় ভাই হয়ে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব তার ছোট ভাইকে দীনের পথে চালানোর চেষ্টা করা। ছোট ভাই হয়ে থাকলে তারও দায়িত্ব বড় ভাইয়ের পরামর্শমতো চলা। কারো প্রতিবেশী থাকলে তার দায়িত্ব প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা। কেউ যদি বস হয় তাহলে তার দায়িত্ব তার অধীনে যারা আছে তাদের প্রতি সদয় আচরণ করা ও সঠিকভাবে তাদের পরিচালনা করা। তার অধীনে যারা আছে তাদেরও দায়িত্ব বসের হুকুমমতো চলা, যদি সেই হুকুম শরীআত মোতাবেক হয়। এমনিভাবে সবারই আপন আপন জায়গায় অনেক দায়িত্ব আছে।

এমনকি পথ চলার সময়ও দায়িত্ব আছে। যদি কেউ রাস্তায় চলে বা হাঁটে আর এ অবস্থায় এমন কোনও জিনিস সেখানে দেখে, যে জিনিস

কারো জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, যেমন দেখল রাস্তায় একটা গর্ত, এখানে কেউ পড়ে যেতে পারে, তখন তার দায়িত্ব এই গর্তটা ভরে দেওয়া। দেখল একটা কাঁটা পড়ে আছে, এই কাঁটা কারো পায়ে গেঁথে যেতে পারে, তখন তার দায়িত্ব এই কাঁটা সরিয়ে ফেলা। একটা কলার ছিলকা পড়ে আছে, এতে কারো পা লাগলে আছড়ে রাস্তায় পড়ে যেতে পারে, তবে এই কলার ছিলকাটা সরিয়ে ফেলা দায়িত্ব।

এরকম প্রত্যেকের উপরই, যে যেই জায়গায় থাকে সেই জায়গাতেই তার অনেক দায়িত্ব আছে। ওই সমস্ত দায়িত্ব মুসলমান হিসেবে জেনে নেওয়া ও পালন করা অবশ্যকর্তব্য। আমি আজকে একটা বিশেষ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে মায়ের দায়িত্ব। একজন মা হিসেবে নিজ সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কী সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করতে চাই।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে নর ও নারী – এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর মা হাওয়া আলাইহাস সালামকে কে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাদের দু'জন থেকে মানুষের বংশবিস্তার ঘটিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

হে মানুষ! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে এবং (প্রথমে) তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তারপর তাদের মাধ্যমে বিস্তার ঘটিয়েছেন বহু নর ও নারীকে।[২৪৭]

তো এই যে কাউকে পুরুষ ও কাউকে নারী বানিয়েছেন, এটা অহেতুক নয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের বংশবিস্তার ঘটানো। কিন্তু মানুষ তো অন্যান্য জীবের মতো নয় যে, বংশবিস্তার করেন কাজ শেষ। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক উন্নতি ও

২৪৭. সূরা নিসা : ১

উৎকর্ষের জন্য তার অনেক কিছু করার আছে। আছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেসব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা না হলে মানুষ হিসেবে মানুষের বিশেষত্ব বাজায় থাকে না; বরং মানবসমাজ পশু-পাখির কাতারে চলে যায়। তা যাতে চলে না যায়, সে লক্ষ্যে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন এবং তা পালনের জন্য জোর তাগিদ করেছেন। কিছু দায়িত্ব আছে পুরুষের, কিছু দায়িত্ব আছে নারীর এবং কিছু দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে উভয়ের। নারীদের মধ্যেও আছে স্ত্রী হিসেবে কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব এবং মা হিসেবে কিছু স্বতন্ত্র দায়িত্ব। মা হিসেবে নারীর যে দায়িত্ব, তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়।

## মায়ের মর্যাদা

একজন মা দুনিয়ার সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাকে আল্লাহ তাআলা এত উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন যে, ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে– তার সন্তানের জান্নাত তার পায়ের নীচে। একবার এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যেতে এসেছি। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী? তিনি বললেন, তোমার কি বাড়িতে মা আছেন? বললেন, হ্যাঁ, আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তুমি বাড়িতে চলে যাও। তোমার মায়ের খেদমেত লেগে থাকো। কারণ তোমার জান্নাত তোমার মায়ের কাছে।[২৪৮] মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। ভেবে দেখুন, জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে! এর চেয়ে বড় মর্যাদা একজন মানুষের জন্য আর কী হতে পারে যে, তার পায়ের নীচে কারো জান্নাত?

মায়ের পায়ের নীচে জান্নাত থাকার অর্থ কী? এর সরল সোজা অর্থ তো সন্তান মায়ের সেবা-যত্নে লেগে থাকবে, তাকে খুশি করবে, খুশি রাখার চেষ্টা করবে, তাহলে সে জান্নাতে যেতে পারবে। জান্নাতে যাওয়া নির্ভর

---

২৪৮. মুসনাদে আহমাদ : ১৫৫৩৮

করে মা খুশি থাকার উপর। যার প্রতি তার মা খুশি নয়, সে জান্নাতে যেতে পারবে না। তাহলে একজন নারীকে কত মর্যাদা আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, তার সন্তানের জান্নাত তার পায়ের নীচে রাখা আছে। যার মা বেঁচে আছেন কিংবা যাদের মা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন, সবারই জরুরি সেই মাকে খুশি করে জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। জীবিত যারা আছে তাদের কাজ তো সহজ যে, মায়ের খেদমত করবে। হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকাবে। মাকে জড়িয়ে ধরবে। মায়ের চোখে-মুখে চুমু খাবে।

আজকাল আমাদের পুরুষরা মাকে চুমু দেয় না। ছেলেকে মেয়েকে চুমু দেয়, কিন্তু মাকে চুমু দেয় না। তো মাকে চুমু দিতে হবে। সন্তান যখন মাকে জড়িয়ে চুমু দেয়, তখন মায়ের মন খুশিতে ভরে যায়। মুখে দুআ করতে হয় না; বরং তখন তার অন্তরের ভেতরে ঝড় ছুটে যায়, স্নেহ মমতার ঝড়, এটাই সন্তানের জন্য বড় দুআ। সুতরাং যেভাবে সম্ভব মাকে খুশি করতে হবে। আর যদি মা মারা গিয়ে থাকেন, তাকে খুশি করার বিভিন্ন উপায় আছে। এক হচ্ছে, তার জন্য দুআ করা। দ্বিতীয়ত, তার জন্য ঈসালে ছাওয়াব করা। নেক কাজ করে এই নিয়ত করা, যেন এর ছাওয়াব তিনি পান। তার মায়ের সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত, যেমন– মায়ের বোন, মায়ের বান্ধবী এবং এমনিভাবে মায়ের সাথে আরো যাদের সম্পর্ক আছে, এদের সবার সঙ্গে সু-সম্পর্ক রাখা। অর্থাৎ জীবিত থাকলে যাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে মা খুশি হতেন, সেই সমস্ত লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা। ব্যস, এর দ্বারা মায়ের রূহ খুশি হয়ে যাবে। মা জীবিত থাকলে তখন আমি যাকে স্নেহ করলে, যাকে আদর করলে, যাকে দান করলে মা খুশি হতেন, মায়ের মৃত্যুর পরেও আমি সে সমস্ত লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। মায়ের কবরের কাছে যাব আর দুআ করব। ইনশাআল্লাহ, যদি মা দুনিয়াতে জীবিত থাকাকালে কোনও কারণে নারাজও থাকেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে সন্তুষ্ট করে দেবেন।

# মাতৃত্বের মর্যাদার দাবি

আমি মায়েদেরকে বলতে চাই, যেই সন্তানকে আপনার খেদমত ও আনুগত্য করার এমন জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যার জান্নাত আপনার পায়ের নীচে, আপনি কি কখনো চিন্তা করেছেন আপনার সেই সন্তান জান্নাতের পথে চলছে না জাহান্নামের পথে চলছে? আপনি আপনার সেই সন্তানকে জান্নাতের মানুষরূপে গড়ে তুলছেন নাকি জাহান্নামের মানুষরূপে?

সন্তানের শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র হল মায়ের কোল। সমস্ত মানুষ সর্বপ্রথম শিক্ষা পায় মায়ের কোল থেকে। আপনি কি কখনও চিন্তা করেছেন আপনার আদরের সন্তান আপনার কোল থেকে কী শিক্ষা পাচ্ছে? আপনাকে যখন মাতৃত্বের মহা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তখন আপনাকে ভাবতে হবে– আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেন যে, আমার সন্তানের জান্নাত আমার পায়ের নীচে। তো যে সন্তানের জান্নাত আমার পায়ের নীচে, আমি কি তাকে জান্নাতের উপযুক্তরূপে গড়ে তুলছি? আমি যেভাবে তাকে গড়ে তুলছি, তাতে সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে?

এতে তো কোনও সন্দেহ নেই যে, সব মা'ই তার সন্তানকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, সবচেয়ে বেশি আদর-যত্ন করে। মা তার সন্তানকে যে আদর-যত্ন করে, জগতে আর কেউ কাউকে এত আদর-যত্ন করতে পারে না, সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা মাকে সেই মন দিয়েই তৈরি করেছেন। ওই মন আর কারো নেই। ফলে মা তার সন্তানের জন্য যেই কষ্ট করে বা করতে পারে, এটা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। বাবারা যতই দেমাগ দেখাক, যতই হম্বিতম্বি করুক, যদি তার সন্তানকে ওই সন্তানের মা লালন-পালন না করত তাহলে বাবার পক্ষে তার যথার্থ পরিচর্যা সম্ভব হত না।

একথা তো নিঃসন্দেহে সত্য যে, মা তার সন্তানের জন্য যা করে এটা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। গর্ভে ধারণ কত কঠিন কাজ। এই একটাই তো যথেষ্ট। এরপর তার দুনিয়ায় আসা। কত সন্তান দুনিয়ায় আসে

আর সন্তানকে দিয়ে মা ইহলোক ছেড়ে চলে যান। সন্তানের জন্ম হয় আর মায়ের মৃত্যু হয়। এরপর আবার সেই সন্তানদের লালন-পালন। সেই সন্তান পেশাব করে দেয়, পায়খানা করে দেয়। মা তো পরিষ্কার করে তারপর বাবার কোলে দেয়। কেন? তোমার সন্তান তুমি কেন পরিষ্কার কর না? কেন তার পেশাব-পায়খানা পরিষ্কার কর না? মাকে কেন ডাক? কেননা তার ঘেন্না লাগে। কিন্তু মায়ের তো ঘেন্না লাগে না। তো আল্লাহ তাআলা মায়ের এরকম প্রাণ দিয়েছেন, মায়ের মনটা এরকমই তৈরি করেছেন যে, সে সন্তানের জন্য সবই করতে পারে। অন্য কারো পক্ষে তার মতো করা সম্ভব না।

কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, যেই সন্তানকে আপনি এত যত্নের সঙ্গে লালন-পালন করছেন, নিজের ঘুমটাকে যার জন্য হারাম করে দেন, নিজের আরামটাকে হারাম করে দেন, সেই সন্তান বেহেশতের উপযুক্ত হচ্ছে না দোযখের উপযুক্ত হচ্ছে, এই চিন্তা আপনি কতটুকু করেছেন? সেই চিন্তা করার প্রথম দায়িত্ব আপনার। কারণ প্রথম শিক্ষাটা সে আপনার কাছে থেকেই পায়।

## মায়ের কাছ থেকে সন্তান কী শিখছে

মা কেমন কথা বলে মা যখন কারো সাথে কথা বলে তখন সত্য কথা বলে নাকি মিথ্যা কথা বলে, সব তার সন্তান খেয়াল করে। কোন কথা সত্য আর কোন কথা মিথ্যা, এটা সবাই বোঝে। এটা বোঝে না এমন কোনও লোক জগতে নেই। এ কথাটা সত্য আর এই কথাটা মিথ্যা, এটা শিশুও বোঝে। যখন মা কারো সঙ্গে মিথ্যা বলে, তখন তার সন্তান শিখল যে, আমার মা যেটা হয়নি সেটা হয়েছে বলে প্রকাশ করে, তাহলে তো এটাও একটা জিনিস। এই মিথ্যা কথা বলার সবক সন্তান আপনার কাছ থেকে নিল। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, তাকে তো জাহান্নামে যেতে হবে। মুমিনের শান নয় মিথ্যা কথা বলা। একজন মুমিন, সে মুমিন আবার মিথ্যা কথাও বলবে, তা তো হতেই পারে না। মিথ্যা কথা বলা তো মুনাফিকের কাজ। মুনাফিকের কাজ তিনটা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

أَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

চারটি নিদর্শন কারোও মাঝে থাকলে সে খাঁটি মুনাফিক। যখন কথা বলে মিথ্যা কথা বলে। যখন ওয়াদা করে সেই ওয়াদা রক্ষা করে না, প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে ফেলে, আর কারোও সঙ্গে যখন কোন কিছু নিয়ে মনোমালিন্য হয়, ঝগড়া লেগে যায়, তখন সে গালাগাল করে।[২৪৯]

তাহলে গালাগালি করা, মিথ্যা কথা বলা, ওয়াদা খেলাফ করা, এসব মুনাফিকের কাজ। এখন আপনি আপনার সন্তানকে এসব শিক্ষা দিচ্ছেন কি না, চিন্তা করেছেন কি? শিশুর সামনে যদি কোনও মা মিথ্যা কথা বলে, তাহলে ওই মা তার সন্তানকে তো মুনাফিকি শেখাল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে এবং তুমি তাদের পক্ষে কোনও সাহায্যকারী পাবে না।[২৫০]

মুনাফিকরা জাহান্নামের তলদেশে থাকবে। তাহলে আমি আমার সন্তানকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানালাম। সুতরাং, সন্তানকে কেবল আদর করলেই হবে না, যত্ন করলেই হবে না, খুব সতর্ক থাকতে হবে যে, আমার সন্তান আমার থেকে কী শিখছে?

## সন্তানের সামনে অন্যের প্রতি আচরণে সতর্কতা

স্বামীর সঙ্গে যদি কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়ে যায়, তখন আমি আমার সন্তানের সামনে আমার স্বামীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করি? স্বামী যদি খারাপ ব্যবহার করে থাকে আল্লাহর কাছে সেজন্য তাকে

---

২৪৯. সহীহ বুখারী : ৩১৭৮

২৫০. সূরা নিসা : ১৪৫

জবাবদিহিতা করতে হবে। বাকি আমি কী ব্যবহার করছি সে জন্যও আমারও তো জবাবদিহি করতে হবে। আমি আমার সন্তানের সামনে যদি স্বামীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করি, তাহলে আমার সন্তান আমার কাছে দুর্ব্যবহার শিখল। আমার স্বামীকে যদি গালি দিই, তাহলে আমার সন্তান আমার কাছ থেকে গালি শিখল। যদি কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তানের সামনে গালি দেয়, স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার করে, তাহলে সে অত্যন্ত খারাপ কাজ করে। এতে গুনাহ তো হয়ই, সেই সাথে সন্তানকেও দুর্ব্যবহার করা শেখানো হল এবং অন্যকে অসম্মান করার শিক্ষা দেওয়া হল।

স্ত্রী এবং স্বামী দুজনকেই সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা একে অন্যের সঙ্গে আমার সন্তানের সামনে কেমন আচরণ করব। আমার সন্তান তো এটা শিখবে। যদি গালাগালি করি সেই গালাগালি শিখবে। আমি যদি আমার সন্তানের সামনে আমার শাশুড়ির সাথে দুর্ব্যবহার করি, তাহলে সন্তান তা শিখবে। এতে সন্তানের ক্ষতি দুই রকম। এক তো সে ওই দুর্ব্যবহার শিখল। সেইসঙ্গে সন্তান তার মা ও দাদি উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাও হারাবে। মনে মনে ভাববে, আমার মা কেমন! আমার দাদির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে। আবার সেই সঙ্গে এটাও মাথায় আসবে যে, আমার মা আমার দাদির সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছে, আসলে আমার দাদিই খারাপ। তো সে মা-দাদি দুজনের প্রতিই শ্রদ্ধা হারালো।

শৈশবেই সে মুরুব্বির প্রতি শ্রদ্ধা হারানো শিখল। মুরুব্বিকে অশ্রদ্ধা করা শিখল। এই শিক্ষাটা তো মা'ই দিল। মা যদি তার শাশুড়ির সাথে শিশুর সামনে দুর্ব্যবহার না করত, তাহলে সে মুরুব্বিকে অশ্রদ্ধা করা শিখত না।

এমনিভাবে এই ঘরে যত লোক আছে, স্বামীর ভাই, স্বামীর বোন, তাদের সঙ্গে আমি কেমন ব্যবহার করি, এসবও দেখে দেখে সন্তানেরা শেখে। তারা যদি খারাপ ব্যবহার করে থাকে, তারা সেজন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ তাআলার কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে। শাস্তি পেতে হবে। তাদের ব্যবহার তাদের, আমার ব্যবহার আমার।

আমার ব্যবহার ভালো করতে হবে দুই কারণে। প্রথমত আমি যদি সঠিক ব্যবহার করি, তাহলে আল্লাহর কাছে আমি সঠিক জবাব দিতে পারব। সেখানে বাঁচতে পারব এবং ছাওয়াব পাব। আর দ্বিতীয়ত আমার সন্তানও সুপথে চলবে। আমার সন্তান ভালো হবে। আর যদি খারাপ ব্যবহার করি, এই খারাপ ব্যবহারটা আমার সন্তান শিখবে। আর আল্লাহর কাছেও আমার জবাব দিতে হবে এবং আমার গুনাহ হবে। খারাপ ব্যবহার করলে দুই ক্ষতি আর ভালো ব্যবহার করলে দুই লাভ।

## মায়ের নিজের আদর্শ মুসলিম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

সন্তানকে জান্নাতের উপযুক্ত বানাতে হলে আগে তার মাকে আদর্শ মুসলমান হতে হবে। নিজে নামাযী হতে হবে। নিজে ভালো ব্যবহারকারী হতে হবে। নিজে পর্দায় থাকতে হবে। পর্দায় থাকা জরুরি। পর্দা নারীর সম্মান। বেপর্দা নারীর বেইজ্জত। আল্লাহ নারীর সম্মান রক্ষার জন্য পর্দার ব্যবস্থা দিয়েছেন। যে নারী পর্দা রক্ষা করে চলে না, সে সত্যিকারের সম্মান অর্জন করতে পারে না। সে শয়তানের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায়। দুষ্টু লোকের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায়। লোভী মানুষের লক্ষ্যবস্তু হয়ে যায়। তার ইজ্জত-সম্মান থাকে না। যে যত বেশি পর্দা রক্ষা করে চলবে, তার তত বেশি ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা হবে আর তার ভেতর দিয়ে তার সন্তান আদর্শ মানুষ হবে।

আমি আমাদের মা-বোনদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব তারা যেন আপন মর্যাদা বোঝে। আল্লাহ তাআলা তাকে যে মাতৃত্বের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন, এই মর্যাদা সবার উপরে। এ মর্যাদা রক্ষা হবে তখনি, যখন সে তার সন্তানকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তুলবে। আর তার সন্তান আদর্শ মানুষ হবে তখন, যখন সে নিজে আদর্শ মানুষ হবে। অর্থাৎ সে নিজে যেমন নামায পড়বে, পর্দায় থাকবে, ঠিক তেমনি সত্য কথা বলবে, মিথ্যা বলবে না, ওয়াদা রক্ষা করবে, ওয়াদা খেলাফ করবে না, সে কাউকে গালাগাল করবে না, মুখের হেফাজত করবে, কারো গীবত করবে না। মোটকথা প্রত্যেক মাকে তার সন্তানের সামনে নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে দাঁড় করাতে হবে।

সন্তান তার সার্বক্ষণিক সাহচর্য পেয়ে থাকে। সঙ্গ ও সাহচর্য ভালো হলে এমনিতেই তার ভালো প্রভাব পড়ে। আর সঙ্গ যদি মন্দ হয়, তবে অজানাতেই তার মন্দ প্রভাব পড়ে যায়। কাজেই সন্তানের জন্য নিজ সঙ্গকে ভালো সঙ্গ বানাতে হবে। তাতে সন্তানের উপর তার ভালো আছর পড়বে। এতে করে সন্তান আপনা থেকেই সুসন্তানরূপে গড়ে উঠবে। সেই সঙ্গে যদি মা তার উপর সতর্ক দৃষ্টিও রাখে এবং তাকে সুসন্তানরূপে গড়ে তোলার জন্য বাড়তি মেহনতও করে, তবে সহজেই তার সুফল পাওয়া যাবে।

মায়ের কর্তব্য সন্তানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যাতে কোনও মন্দ সঙ্গ তাকে পেয়ে না বসে। শৈশবে মন্দ সঙ্গ অতি বিপজ্জনক। সন্তানকে তো তা থেকে রক্ষার প্রথম দায়িত্ব মায়েরই।

সর্বোপরি মায়েদেরকে দীনের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। কেননা আদরের সন্তান তার কোল থেকেই তা শিখবে। তার নিজেরই যদি তা জানা না থাকে, তবে সন্তানকে কীভাবে শেখাবে? ইসলাম যে আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে, সুন্দর জীবন গড়ার জন্য তার কোনও বিকল্প নেই। নিজের কোল থেকেই সন্তানকে সেসব শিষ্টাচারের সাথে পরিচিত করতে হবে। তবেই আশা করা যায়, সে সন্তান আগামী দিনে একজন আদর্শ মানুষ, একজন সত্যিকার মুসলিম এবং একজন জান্নাতী মানুষরূপে গড়ে উঠবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন।

# ক্ষমাশীল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

মুহতারাম ভাই ও বন্ধুগণ ও আমার মা ও বোনেরা!

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি, গত মজলিসেও এই একই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে– কিয়ামত দিবসে কোনও ব্যক্তি টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, নিজ সন্তান-সন্ততি ও লোকবল দ্বারা নাজাত পাবে না। এসব দ্বারা নাজাত পেতে পারবে না। যদি জান্নাত পেতে হয় আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে হয়, তাহলে উপায় হলো মনকে শুদ্ধ করা। নিজের মনটাকে পরিষ্কার করা। আল্লাহ বলেন–

اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।[২৫১]

---

২৫১. সূরা শুআরা : ৮৯

যে ব্যক্তি শুদ্ধ মন নিয়ে, নিখুঁত মন নিয়ে, সাদা মন নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে, সেই নাজাত পাবে। সুতরাং নাজাত পাওয়ার জন্য আমাদের কর্তব্য মন পরিষ্কার করা ও পরিষ্কার রাখা।

মন পরিষ্কার করার মানে কী? এর মানে হচ্ছে– যত রকম মন্দ চরিত্র আছে সেসব থেকে মনকে সাফ করে ফেলা। এর আগে অহংকারের কথা বলা হয়েছে। হিংসার কথা বলা হয়েছে। এগুলো এমন রোগ ও এমন ময়লা, যা কারো অন্তরে থাকলে সে জান্নাতে যেতে পারে না। এমনিভাবে অন্তরকে সাফ করতে হবে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ থেকে। কোনও কারণে কারো প্রতি মন খারাপ হয়েছে। কেউ মনে কষ্ট দিয়েছে আর আমি সেই কষ্টটাকে মনের ভিতর পুষে রাখলাম। তাকে মাফ করা হল না। যদি অন্যের প্রতি এই দুঃখ-কষ্টের মন নিয়ে কবরে যাওয়া হয়, অন্যকে ক্ষমা করা না হয়, তাহলে নিজেরও ক্ষমা পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে হলে নিজেরও অন্যকে ক্ষমা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা সে কথাই এক আয়াতে এভাবে ইরশাদ করেছেন যে,

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তারা ক্ষমা করুক এবং দোষ-ত্রটি উপেক্ষা করুক, তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৫২]

## কষ্টের রকমফের

আমরা ক্ষমা করতে অভ্যস্ত নই। দুনিয়ায় একসঙ্গে জীবন-যাপন করলে অন্যের দ্বারা কোনও না কোনওভাবে আঘাত লেগেই যায়। কেউ কথা দিয়ে কষ্ট দেয়, কেউ মান-সম্মানের উপর আঘাত করে, কেউ টাকা-পয়সা নিয়ে যায়, জমি জবরদখল করে নেয়। নানান ভাবেই মনে কষ্ট দেয়। তো এই সমস্ত কষ্ট আমরা ক্ষমা না করে মনের ভেতরে রেখে দিই। আর এভাবে নিজে নিজে অন্তরের জ্বালা পোহাই। একবার স্ত্রী কষ্ট

২৫২. সূরা নূর : ২২

দেয় কিংবা স্বামী কষ্ট দেয়। কখনও ভাই বোনকে কষ্ট দেয়, আবার কখনও বোন ভাইকে কষ্ট দেয়। কখনও প্রতিবেশীর দ্বারা কষ্ট পাওয়া যায়। কখনও বাবা ছেলের দ্বারা কষ্ট পায়, আবার কখনও ছেলে বাবার দ্বারা কষ্ট পায়। এক সঙ্গী আরেক সঙ্গীর দ্বারা কষ্ট পায়। এক ব্যবসায়ী আরেক ব্যবসায়ী দ্বারা আঘাত পায়। নানাভাবে মানুষ একের দ্বারা অন্যে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। জগতে এমন কেউ নেই যে কোনও না কোনওভাবে আঘাত পায় না। জগৎটাই এমন যে, এখানে একসঙ্গে কাজ করতে গেলে একের দ্বারা আরেকজন আঘাত পাবেই।

ষোল আনা মিল একজনের সাথে আরেকজনের, তা কোনওদিন হবে না। এটা হতে পারে না। কারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা আলাদা। একেকজন একেক রকম চিন্তা করে। একেকজনের একেকরকম রুচি। তো দেখা যায়, একই কাজের সাথে দুইজন জড়িত, একজনের রুচি একটা, আরেকজনের আরেকটা। তো দুজনেরটাই সেখানে পূরণ করা সম্ভব হয় না। কেবল একজনেরটাই পূরণ হয়। আর তখনই আরেকজন কষ্ট পায়।

অনেক সময় মানুষ ইচ্ছাকৃত কষ্ট দেয়। সম্পত্তি ভাগাভাগিতে কষ্ট দেয়। বাবা মারা গেছে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন, এখানে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েদেরকে ঠকানো হয়। ভাইয়েরা বোনদের ঠকায় অধিকাংশ জায়গায়। বোন যা পাবে, ভাইয়েরা তা পুরোপুরি দেয় না। কোনও রকম একটু দিয়ে বুঝ দিয়ে দেয়। আর মানুষ তো বোকা নয়। যাকে ঠকানো হয় সে তা বুঝেই ফেলে যে, আমাকে ঠকানো হয়েছে। কাজেই বোনও বুঝে ফেলে যে, ভাইয়েরা তাকে ঠকিয়েছে। অধিকাংশ জায়গায় ভাইয়েরা বোনদের ঠকায়। অনেক সময় এই ঠকানোতে বাবা-মা শামিল থাকে। ভাইয়েরা ঠকায় বাবা-মায়ের সম্পত্তিতে। বাবা মা'ও চায় না যে, মেয়ে ছেলের মতো নিজ প্রাপ্য অংশ পাক। অনেক বাবা আছে, জীবদ্দশায় সম্পদ ছেলেদেরকে লিখে দেয়। ফলে মৃত্যুর পর মেয়ে আর কিছু পায় না। এরকম ঘটনা আমরা সবাই জানি। মেয়ের মনে এই জ্বালা যে, আমার বাবা তার জীবদ্দশায়ই আমাকে ঠকিয়েছে। এখন এই মেয়ে কী করবে?

সারা জীবন এই জ্বালা মনের ভেতর পোষণ করবে এবং এই জ্বালা নিয়েই সে কবরে যাবে? সাধারণত এটাই করা হয়। এই জ্বালা নিয়েই কবরে যাওয়া হয়।

বড় ভাই ছোট ভাইকে ঠকিয়েছে। অনেক বড় ভাই আছে এমন, যে ছোট ভাইকে ঠকায় কিংবা এর উল্টাও হতে পারে। যে ভাই বেশি চালাক, সে ছোট হোক আর বড় হোক, সে সহজ-সরল ভাইকে ঠকায়। এই ঠকানোর জ্বালা ওই ভাই মনের ভিতরে রেখে দেয়। আর এভাবে সারাজীবন কষ্ট ভোগ করে। ক্ষমা করতে না পারলে মনের জ্বালা মরণ পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাড়ে। মনে আর সুখ পাওয়া যায় না।

## ক্ষমা করার ভেতর মনের সুখ

দুনিয়ায় মনে সুখ পাওয়ার একটা বড় উপায় ক্ষমা করা। যে ব্যক্তি যত ক্ষমা করবে সে তত সুখ পাবে। আর যে ব্যক্তি ক্ষমা যত কম করবে, সে তত অশান্তিতে থাকবে। কত রকমের কষ্টই তো মনে লাগে– ভাইয়ের কষ্ট, বোনের কষ্ট, ছেলের, মেয়ের, স্বামীর, স্ত্রীর, প্রতিবেশীর, সাথী-সঙ্গীর, বস, কর্মকর্তা, কর্মচারী কিংবা সহকর্মীর। এই সবার দ্বারাই তো আঘাত পাওয়া হয়। এখন যদি ক্ষমা করা না হয়, কত রকমের জ্বালা মনের মধ্যেই থাকবে। এই জ্বালার কারণে রাতে ঘুম হবে না; ঘুম হারাম হয়ে যাবে। তাহলে সে সারাজীবন জ্বলতেই থাকবে। এক তো হল অন্যের দ্বারা ঠকার কষ্ট, তারপর আবার ক্ষমা না করে মনের ভেতর পুষতে থাকার বাড়তি কষ্ট। দুই রকমের যন্ত্রণায় আরাম হারাম হয়ে যাবে। এই যন্ত্রণা থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় ক্ষমা করে দেওয়া।

ক্ষমা করলে দুনিয়ায়ও সুখ, আখিরাতেও নাজাত। আমাদেরকে আমাদের দীন, মহান ইসলাম এই শিক্ষাই দিয়েছে– ক্ষমাশীল হও, ক্ষমা করো। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারাজীবনই তো ক্ষমা করেছেন। তাঁর ক্ষমার কত বড় বড় ঘটনা। সুবহানাল্লাহ!

এক মক্কা বিজয়ে যে ক্ষমা করেছেন, দুনিয়ার ইতিহাসে এর কোনও নজীর নেই। প্রিয় জন্মভূমি থেকে মক্কার লোকজন তাঁকে তাড়িয়ে

দিয়েছে। মায়ের ভিটায় থাকতে পারেননি। আর এই ভিটা তো যে-কোনও ভিটা না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভিটায় জন্মগ্রহণ করেছেন সেটা তো আপনার আমার জন্ম-ভিটার মতো নয়। কারণ এই জন্মস্থান কাবার প্রতিবেশীতে। ঘর থেকে বের হলেই চোখের সামনে কাবাঘর। সেই পবিত্র জায়গা থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরে মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার পরও সেখানেও সুখে থাকতে দেয়নি। একের পর এক যুদ্ধ। বদরের যুদ্ধ হয়েছে। উহুদের যুদ্ধ হয়েছে। উহুদের যুদ্ধে মক্কার লোকেরা তাঁকে রক্তাক্ত করেছে। তাঁর দাঁত শহীদ হয়ে গেছে। শিরোণাস্ত্র ভেঙ্গে মাথার ভেতর বসে গেছে। কত কষ্ট দিয়েছে তারা! মাঝখানে ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি চাইলেন একবার মক্কায় এসে কাবাঘরের তাওয়াফ করে যাবেন। সেটাও তারা দিল না। মক্কার কাছাকাছি এসে গেছেন। সেখান থেকেও তাঁকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। বাহ্য দৃষ্টিতে কত অপমানজনক চুক্তি হয়েছে। সব রকমের কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে কত কষ্ট দিয়েছে! তাঁর অনুসারীদের কষ্ট দিয়েছে, তাঁর সন্তানদেরকে কষ্ট দিয়েছে।

হযরত যায়নাব রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় মেয়ে। তিনি যখন মদীনায় যেতে চাইলেন, বাবা তো চলে গেছেন, তিনি আছেন, তখন প্রকাশ্যে তারা যেতে দিতে চাইল না। আবু জাহ্‌ল তাঁর উটের উপর আঘাত করল। তিনি উটের পিঠ থেকে পড়ে যান। গর্ভবতী ছিলেন। মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এমনভাবেই জখম হন যে, সে জখম থেকে তিনি আর সুস্থ হননি। মদীনা মুনাওয়ারায় যাওয়ার পর এ অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কত রকমের কষ্ট তারা দিয়েছে!

পরবর্তীতে ৮ম হিজরীতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররামায় আসেন এবং মক্কা জয় হয়ে যায়। এখন তো প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ। যারা যারা তাদেরকে কষ্ট দিয়েছিল তাদেরকে কচুকাটা করা হবে, এই তো সুযোগ। কারণ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি এসেছেন। আর ওরা সব এখন তো অপ্রস্তুত। এখন চাইলেই আবু সুফয়ান, আবু জাহ্‌লের ছেলে ইকরিমা, এরকম বড় বড় যারা ছিল, এদেরকে কচুকাটা করতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করেননি। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমার কাছে কী

ধরনের আচরণ আশা কর? তারা বলল, আপনি একজন মহান ভাই এবং মহান ভাইয়ের পুত্র। আমরা আপনার কাছে আজ মহত্ত্বই আশা করি। তিনি বললেন, তোমাদের কারো বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। যাও, তোমরা মুক্ত। এরকমের ক্ষমার ইতিহাস কে কোথায় দেখাতে পারবে?

## কা'বা শরীফের চাবি ও উছমান ইবন আবী তালহার ঘটনা

উসমান ইবন আবী তালহার ঘটনা কতই না বিস্ময়কর! মক্কাবিজয়ের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমানের কাছ থেকে চাবি আনালেন। কাবাঘর খুললেন এবং ভেতরে আরাম করে নামায পড়লেন। এরপর উসমানকে বললেন, উসমান! ওই কথা মনে আছে যে, আমি তোমার কাছে চাবি চেয়েছিলাম কাবা ঘরে ঢুকব বলে, কিন্তু তুমি চাবি দাওনি? আমি বলেছিলাম, উসমান! একদিন এমন আসবে, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে চাবি দেব। উসমান! সেই কথা মনে আছে? সেই দিন কি এসেছে? উসমান বলল, হ্যাঁ, সেই দিন এসে গেছে। আপনি যা বলেছিলেন তা সত্য। কাজেই আমি বিশ্বাস করি আপনি আল্লাহর রাসূল। এভাবে উসমান ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এবারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী আচরণ করলেন? বলেছিলেন, আমি যাকে ইচ্ছা তাকে চাবি দেব সেদিন। আজকে কী করলেন? আজ তিনি তার প্রতি যে আচরণ করলেন, তা সব ভাবনা-কল্পনার উর্ধ্বে। তিনি একদার অপমানকারী উসমানকে সম্মানিত করলেন। যে চাবিকে কেন্দ্র করে অপমান করেছিল, সেই চাবি তার হাতেই সমর্পণ করলেন এবং বললেন- এই চাবি তোমার কাছেই থাকুক। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার ছেলের কাছে থাকবে। তোমার ছেলের মৃত্যুর পর তোমার নাতির কাছে থাকবে। এভাবে একের পর এক তোমার বংশে থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের কাছেই এই চাবি থাকবে।[২৫৩]

---

২৫৩. তবাকাতে ইবনে সা'দ : ২/১০৪

কেমন ক্ষমা চিন্তা করুন! দুনিয়ার ইতিহাসে এমন কোনও দৃষ্টান্ত আছে? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এই ক্ষমা করেছেন আর মানুষকেও এই ক্ষমার শিক্ষা দিয়েছেন।

## আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি.-এর ঘটনা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এ উম্মতের সেরা ব্যক্তি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এই উম্মতে আবু বকরের সমান আর কেউ নেই। এই আবু বকর রাযি.-এর ক্ষমা দেখুন। কী অসম্ভব ক্ষমা তিনি করেছিলেন! তাঁর মেয়ে, আমাদের মা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.। কেউ যদি মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে কথা বলে, কোনও বাবা ক্ষমা করতে পারে? কোনও বাবা যদি শোনে, তার মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে অমুক কুৎসা রটিয়েছে, সেই বাবা কোনও দিন তাকে ক্ষমা করবে? আবার সেই বাবা যদি হন আবু বকর রাযি. আর সে মেয়ে যদি হন আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.? তাঁর মতো পবিত্র এই জগতে আর কে আছে? আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীর জন্য বাছাই করেছেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. কে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন–

وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ

পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের উপযুক্ত এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের উপযুক্ত।[২৫৪]

পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র নারী। জগতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো পবিত্র পুরুষ আর কে আছে? সুতরাং তাঁর জন্য তাঁর উপযুক্ত পবিত্র নারীই বাছাই করা হয়েছে।

আম্মাজান আয়েশা রাযি. এক যুদ্ধে তাঁর গলার হার হারিয়ে ফেলেন। বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে। সে হার খুঁজতে গিয়ে তিনি কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। মুনাফিকরা এ সুযোগে তাঁর চরিত্র নিয়ে কথা তোলে। তারা বদনাম ছড়িয়ে দিল তাঁর চরিত্র সম্পর্কে। মদীনা মুনাওয়ারা জান্নাতের পরিবেশ। জগতে যদি কেউ জান্নাতের পরিবেশ

---

২৫৪. সূরা নূর : ২৬

দেখে থাকে, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনার সেই পরিবেশ ছিল। এখানে বাস করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন আমাদের মায়েরা। এখানে বাস করেছেন তাঁর আদরের ফাতিমা রাযি.। ওখানে বাস করেছেন আবু বকর সিদ্দীক রাযি., উমর রাযি., উসমান গণী রাযি., আলী মুরতাযা রাযি.। এখানে বাস করেছেন শত শত হাজার হাজার পবিত্র চরিত্রের সাহাবীগণ এবং তাদের স্ত্রীগণ। কাজেই ওই রকম পরিবেশ জগতে আর কোথায় হতে পারে? এতো এক জান্নাত। মৃত্যুর পরে মানুষ জান্নাতে যাবে। আর দুনিয়াতেই এক জান্নাত মানুষ দেখেছে মদীনা মুনাওয়ারায় এক সময়।

ওইখানে যখন আমাদের আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. সম্পর্কে এ কথা মুনাফিকরা ছড়িয়ে দিল, তখন মদীনায় জাহান্নামের কষ্ট নেমে এল। কারো মুখে হাসি নেই। সবাই বিষন্ন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে হাসি নেই। কোনও সাহাবীর মুখে হাসি নেই। আর আম্মাজান নিজে তো কাঁদতে কাঁদতে শেষ। রাতের পর রাত চলে যায়, চোখে ঘুম নেই। চোখ থেকে পানি আর থামে না। ওই কষ্ট কে কাকে বুঝাবে! আম্মাজান তখন কী কষ্ট পেয়েছেন, তা কার পক্ষে বোঝা সম্ভব? তবে এ কষ্ট তাঁর পক্ষে অশেষ কল্যাণ বয়ে এনেছে। মুনাফিকদের মুখোশ খুলেছে। কুৎসা রটনাকারীদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলার কাছে আম্মাজানের মর্যাদা অনেক অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তিনি যে একজন নির্মল ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, সে সম্পর্কে কুরআনের সনদ এসে গেছে, কুরআনী সাক্ষ্য নাযিল হয়েছে, যা তাঁর সন্তানগণ প্রজন্মের পর প্রজন্ম পড়ে যাবে। তারা কিয়ামত পর্যন্ত তা পড়তে থাকবে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে।

প্রিয় বন্ধুগণ! এ সম্পর্কিত সূরা নূরের আয়াতসমূহ পড়ে দেখুন। আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন, একটি মহামুসীবতের ভেতর দিয়ে এ আয়াতসমূহ আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-কে দেওয়া আল্লাহ তাআলার কত বড় উপহার এবং এর মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি

আল্লাহর পথে চলার কত কত মূল্যবান হিদায়াত, কত সুস্পষ্ট নির্দেশনা।

যাহোক, যারা আমাদের এ আম্মাজান ও হযরত আবূ বকর রাযি.-এর আদরের মেয়ের সম্পর্কে কথা ছড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মিসতাহ। সম্পর্কে তাঁর ভাগনে হন। তিনি বললেন, সারা জীবন আমি মিসতাহর সাহায্য করেছি, তাকে নিজে পেলেছি পুষেছি, সেই মিসতাহ কিনা আমার মেয়ের সম্পর্কে অপপ্রচার করল! আমি মিসতাহকে আর কোনও দিন সাহায্য করব না। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়–

وَ لَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তোমাদের মধ্যে যারা সম্পদ ও সচ্ছলতার অধিকারী, তারা যেন এরূপ কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছু দেবে না।[২৫৫]

যারা স্বচ্ছল, যাদের টাকা-পয়সা আছে তারা যেন এ রকমের কসম না করে যে, কাউকে সাহায্য করবে না। এরপর আল্লাহ বলেন,

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا

এবং তারা ক্ষমা করুক ও অপরাধ উপেক্ষা করুক।

তারপর বলা হয়েছে–

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তোমরা কি কামনা কর না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?

আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন তা কি তোমরা চাও না? সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. চিৎকার করে বলে উঠেন, আল্লাহ! অবশ্যই আমি কামনা করি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এ কথা বলে তিনি ঘোষণা দিলেন, মিসতাহ যা করেছিল তা সব ক্ষমা করে দেওয়া হল এবং এখন

---

২৫৫. সূরা নূর : ২২

থেকে মিসতাহকে আমি যথারীতি আগে যেভাবে সাহায্য করতাম সেইভাবে সাহায্য করে যাব।[২৫৬] বাবা তার মেয়ের চরিত্র সম্পর্কে কলঙ্ক লেপনকারীকে ক্ষমা করে দিলেন। আমাদের মতো বাবা হলে তো গিয়ে খুনই করে ফেলত। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি হতাম, তাহলে তো তরবারি নিয়ে বের হতাম এরপর তার জান নিয়ে তবে বাসায় ফিরতাম। কিন্তু তিনি তা করলেন না; বরং ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমা করে দিলেন আম্মাজান নিজেও। তারা নিজেদের মন পরিষ্কার করে ফেললেন। ক্ষমার পানি ঢেলে কষ্টের দাগ ধুয়ে ফেললেন। এভাবেই আমাদেরকে আপন-আপন মন অন্যের দেওয়া কষ্ট থেকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। কেনই বা তা করব না, যখন আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়েছেন–

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?

## ঠকানোর রকমফের

আমি কত পাপ করি, আল্লাহর কত হুকুম আমি অমান্য করি! একজন আমার থেকে জমি বেশি নিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে। এতে আমার কতটুকু ক্ষতি হল? আমার ভাই যদি আমাকে জমি ঠিকভাবে না দেয়, আমার কতটুকু ক্ষতি হবে তাতে? দুনিয়ায় যারা ঠকেছে তারা সবাই কি মরে গেছে? যত বোনদেরকে তাদের ভাইয়েরা ঠকিয়েছে তারা কি অচল হয়ে গেছে? না, ঠকে যাওয়ার কারণে কারো দুনিয়া আটকে থাকে না। কিন্তু আমি যেই পাপ করেছি সেই পাপ যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন, তাহলে আমার কি দশা হবে? ঠিকভাবে নামায পড়া হয় না। কত সময় কত মিথ্যা কথা বলি। আমিই নিজেও তো মানুষকে কত ঠকাই। আমার ভাই আমাকে জমি ঠিকভাবে দেয়নি, সে না হয় ঠকালো, কিন্তু আমি কি মানুষকে ঠকাই না? ঠকাই, কিন্তু টের পাই না। ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গিয়ে মানুষকে ঠকায়। চাকরিজীবী চাকরি করতে গিয়ে মানুষকে ঠকায়। যেমন কাজ করার কথা ছিল সেভাবে করে না,

---

২৫৬. সহীহ বুখারী : ২৬৬১

সময়মতো ফাইল ছাড়ে না, এটাতো ঠকানোই হল! ছোট বড়কে ঠকায়, বড় ছোটকে ঠকায়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে বড় ছোটকে স্নেহ করবে আর ছোট বড়কে সম্মান করবে। তাহলে বড়র কাছে ছোট'র পাওনা আদর-স্নেহ। কিন্তু বড় কি ছোটকে সেই আদর-স্নেহ ঠিকভাবে দেয়? যদি না দেয় তাহলে তো ঠকানোই হলো! আর ছোট'র কাছে বড়'র পাওনা হচ্ছে সম্মান। ছোটরা কি বড়কে সেই সম্মান দেয়? যদি না দেয়, তাহলে সেও তো ঠকানোই বটে! ওই যে ভাই বোনকে ঠকাল, ওই ভাই যদি বড় হয়ে থাকে, তাহলে বোনের কর্তব্য বড় ভাইকে সম্মান করা। ঠকানোর কারণে বড় ভাই হওয়া তো বাদ যায়নি। ঠকানোর কারণে কি বড় ভাইয়ের বড়ত্ব লোপ পেয়ে গেছে? হাদীছে বলা হয়েছে–

الأَكْبَرُ مِنَ الإِخْوَةِ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ

বড় ভাই পিতৃতুল্য।[২৫৭]

বড় ভাই যখন পিতার মতো, তাহলে ছোট বোন কেন তাকে সম্মান করবে না? যদি সম্মান না করে, তাহলে তো তাকে ঠকাল। তার প্রাপ্য তাকে দিল না। বড় ভাই তাকে জমি না দিয়ে ঠকিয়েছে আর এ বোন তাকে সম্মান না দিয়ে ঠকিয়েছে। তাহলে এ দুজনই তো সমান হলো! মা যদি ঠিকভাবে সম্পদ না দিয়ে ঠকিয়ে থাকে আর এ কারণে মেয়ে মাকে সম্মান না করে, তাহলে মেয়েও তো মাকে ঠকাল।

আমাদের মধ্যে এমন লোক পাওয়া কঠিন হবে, যে অন্যকে ঠকায় না। তাহলে একজন আমাকে ঠকাল, তাকে মাফ করলাম না, এতে যে আমি তাকে ঠকিয়ে রেখেছি! সবচেয়ে বড় কথা, আমি যে কত পাপ করি! আল্লাহর কত হুকুম অমান্য করি! ঠিকভাবে নামায পড়া হয় না, হিসাব করে যাকাত দেওয়া হয় না, হজ্জ ফরয তারপরও হজ্জ করা হয় না, মুখের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয় না, চোখের ব্যবহার সঠিকভাবে করা হয় না, মোটকথা, রোজ কত রকম পাপ করে থাকি! আমি যেমন মানুষকে ক্ষমা করলাম না, ওই রকম আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে দশা কী হবে?

---

২৫৭. তবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর : ১৯/২০০, হাদীছ নং ৪৫০

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

তোমরা কি কামনা কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?

এ কথা বলে আল্লাহ কী বলতে চাচ্ছেন? এই যে আল্লাহ বললেন, তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, এ কথা বলে আল্লাহ আমাদের বোঝাচ্ছেন– যদি তা চাও অর্থাৎ আমার ক্ষমা চাও, তাহলে তোমরাও মানুষেকে বেশি বেশি ক্ষমা করো। যে ব্যক্তি মানুষকে যত বেশি ক্ষমা করবে, সে আল্লাহর কাছে তত বেশি ক্ষমা পাবে। এ হলো আখিরাতের লাভ।

দুনিয়ায় লাভ কী তা আগেই বলেছি। ক্ষমা করলে দুনিয়ায় শান্তি পাওয়া যায়। একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আপনাকে এ পর্যন্ত যত লোক ঠকিয়েছে সবাইকে ক্ষমা করে দিন। দেখবেন মনে কী শান্তি ছুঁয়ে যায়! আরামে ঘুম হবে, দিনটা শান্তির ভেতর কাটবে, মুখে হাসি থাকবে এবং স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে। ক্ষমা যে যত কম করে, তার তত স্বাস্থ্যহানি ঘটে। কারণ তখন ঠিকভাবে ঘুম হয় না। তাহলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কী করে? আর সারাদিন ধান্ধায় থাকে যে, সে আমাকে যখন ঠকিয়েছে তখন তার থেকে কখন প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এতে শান্তি কী করে পাবে?

## দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির মূলমন্ত্র

দুনিয়ার শান্তির মূলমন্ত্র দু'টি। দু'টি কাজ যে করবে, সে নিঃসন্দেহে দুনিয়ায় শান্তি পাবে। আর এ দু'টিই ইসলামের অনেক বড় শিক্ষা। এক হচ্ছে– ক্ষমাশীল হওয়া আর দ্বিতীয় হল– আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়েছেন আমি তাতে সন্তুষ্ট। আরেকজনকে আল্লাহ কী দিয়েছেন, ওর ধার আমি ধারি না, ওতে আমার কিছু আসে যায় না। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমি তাতে খুশি। এ দু'টিকে যে জীবনের মূলমন্ত্র বানাবে, কোনও অশান্তি তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মৃত্যু পর্যন্ত সে সুখে থাকবে। দুনিয়ার যত মানুষ অশান্তি ভোগ করছে, এর কারণ তারা

এ দু'টিকে জীবনের মূলমন্ত্র বানায়নি। শুধু অন্যের দিকে লক্ষ করে, কার কী আছে। আমার চেয়ে অন্যের গাড়ি দামী, আমার চেয়ে অমুকের চেহারা সুন্দর, আমার চেয়ে অমুকের স্বাস্থ্য ভালো, আমার চেয়ে অমুক ভালো বাজার করে, আমার চেয়ে অমুকের চাকরিটা বড়, আমার চেয়ে অমুক বেতন পায় বেশি– এই সমস্ত দেখতে থাকে আর ভেতরে ভেতরে হিংসায় জ্বলে। আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন আমি তাতে খুশি, এমন চিন্তা খুব কম মানুষই করে।

বলছিলাম এ কথা– ক্ষমা করে মন পরিষ্কার করে ফেলার দুনিয়াবী ফায়দা তো এই যে, দুনিয়ায় সুখ পাওয়া যাবে। আর সবেচে' বড় ফায়দা যেটা, যা আমাদের সকলের কাম্য, তা হচ্ছে পরকালীন ফায়দা। আমরা সবাই চাই আখিরাতের নাজাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভ। এটা আমরা সবাই চাই। নামায পড়ি, রোযা রাখি, উদ্দেশ্য তো এটাই যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে যাওয়া। জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়ে যাবে, যদি আমরা মানুষকে ক্ষমা করতে পারি। যত লোক আমাকে কষ্ট দিয়েছে, যতভাবে কষ্ট দিয়েছে বা ঠকিয়েছে, এ মুহূর্তে আমি সবাইকে ক্ষমা করে দিই এবং তাদের বিষয়ে মন পরিষ্কার করে ফেলি। আখিরাতে কোনও টাকা-পয়সা কাজে লাগবে না, কোনও জনবল কাজে লাগবে না। মুক্তি পাবে কেবল সেই, যে একদম পরিষ্কার মন নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে। সুতরাং মন পরিষ্কার করে ফেলুন। যে যত কষ্ট দিয়েছে সবাইকে ক্ষমা করে দিন। অন্যের দেওয়া কষ্টের কালিমা আমার অন্তরে রাখব না। মন সাদা করে ফেলব। তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা আমাদের জান্নাত দিয়েই দেবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

# আত্মমুগ্ধতা ও তার ক্ষতি

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

একটা আয়াত সামনে রেখে আমরা কয়েক সপ্তাহ আলোচনা করে আসছি। এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন– আখিরাতে মুক্তি পাবে কেবল সেই, যার অন্তর ভালো, যার অন্তর ত্রুটিমুক্ত এবং যার অন্তর রোগমুক্ত। আমাদের অন্তরে নানা রকমের রোগ আছে। এ সমস্ত রোগ যদি ভালো করতে না পারি, সালীম অন্তর নিয়ে যেতে না পারি, আমাদের অন্তর যদি হয় সাকীম– রুগ্ন ও অসুস্থ অন্তর, তাহলে নাজাত পাওয়া যাবে না।

বেশ কয়েকদিন অন্তরের রোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আজকে আলোচনা করব আরেকটি রোগ নিয়ে। এ রোগটির নাম আরবিতে বলে 'উজব' (عجب)। বাংলায় বলে আত্মমুগ্ধতা। নিজেকে ভালো মনে করা।

আমি খুব খুশি এ চিন্তা করে– আমি খুব ভালো মানুষ। এ রোগটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। আমার মধ্যেও আছে। আপনার মধ্যেও আছে। আমাদের সবার মধ্যেই আছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে বড় ভালো মানুষ মনে করি। এই যে বয়ান হচ্ছে, তাতে

যে কথাগুলো বলা হয়, এতে আমি বক্তা হিসেবে মনে করি– এসব ত্রুটি আমার মধ্যে নেই; সামনে যারা আছে, যারা শুনছে তাদের মাঝে আছে। আমি তো ভালো মানুষ। এমনিভাবে যে শোনে সেও মনে করে– এটা আমার মধ্যে নেই, ওর মধ্যে আছে। প্রত্যেক আমি তো একজন ভালো লোক। যখনই কোনও দোষের আলোচনা করা হয়, তখনই প্রথম নজরটা আসে এদিকে যে, এ রোগটা আমার মধ্যে নেই, অমুকের মধ্যে আছে। তার মানে আমি খুব ভালো মানুষ। নিজেকে বড় সাধু মনে হয়। প্রত্যেকেই যদি চিন্তা করে, নিজের দিকে তাকায়, তাহলে এ রোগটা সে নিজের মধ্যে দেখতে পাবে। যখনই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে, তখনই সবাই বলে মানুষের অবস্থা বড় খারাপ। আল্লাহ মানুষকে হিদায়াত দিন। দুআ করা তো ভালো। কিন্তু এর ভেতর একটা দোষ আছে, একটা রোগ আছে। আর তা হল– সে মনে করে, এ রোগটা মানুষের মধ্যে আছে, আমার মধ্যে নেই। তাই মানুষের জন্য দুআ করে। দুআ করা দরকার ছিল– আল্লাহ, আমাদের সবাইকে হিদায়াত দাও। প্রথমেই নিজের জন্য দুআ, এরপর সবার জন্য। কিন্তু এটা বলি না। বলি কী? আল্লাহ মানুষকে হিদায়াত দাও। তার মানে আমি তো যথেষ্ট ভালো আছি। আমার হিদায়াতের দরকার নেই, দরকার অন্যদের। আসলে উজব ও আত্মমুগ্ধতা এক মারাত্মক রোগ। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে এক ধ্বংসাত্মক রোগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক। ওই লোভ-লালসা যার আনুগত্য করা হয়, ওই খেয়াল-খুশি যার পেছনে চলা হয় আর ব্যক্তির নিজের প্রতি মুগ্ধতা।[২৫৮]

হযরত উমর রাযি. বলেন– আমি তোমাদের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় যে জিনিসের করি তা হচ্ছে নিজ মতের উপর মুগ্ধতা।[২৫৯] তো এই

---

২৫৮. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা : ৭৩১

২৫৯. ইবনু আবদিল বার্‌র, জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী : ৯৬০

'উজব' তথা নিজের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি, এটা আমাদের সবার মধ্যে আছে। এ রোগ যতক্ষণ ভেতরে থাকবে, ততক্ষণ সংশোধন হওয়া যাবে না, ততক্ষণ উন্নতির পথে আগানো যাবে না। মানুষ ডাক্তারের কাছে যায় কখন? যখন মনে করে আমি রোগী। যে মনে করে আমার তো কোনও রোগ নেই, সে তো ডাক্তারের কাছে যাবে না। তেমনি যদি কেউ মনে করে আমার ভেতর দোষ আছে, তাহলেই সে ভালো হওয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি মনে করে আমার ভেতর কোনও দোষ নেই, তখন ভালো হওয়ার চেষ্টাও করবে না। ভালো হওয়ার চেষ্টা যদি না থাকে, তাহলে মানুষ সামনে অগ্রসর হতে পারে না।

এ চেহারা– চোখ, নাক, কান, মুখ দিয়ে কেউ মানুষ হয় না। চোখ, কান, নাক, মুখ তো পশুরও আছে। ওদের আছে এক রকম, আমাদের আরেক রকম। কিন্তু আছে তো। মানুষ এ দিয়ে হওয়া যায়। মানুষ 'মানুষ' হয় গুণের দ্বারা। আল্লাহ তাআলা মানুষের ভেতরে ভালো হওয়ার যোগ্যতা দিয়ে রেখেছেন। ভালো গুণের বিকাশ ঘটানোর যোগ্যতা রেখেছেন। নিজের সত্যবাদী হওয়ার যোগ্যতা আছে। অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার যোগ্যতা আছে। আমানতদার হওয়ার যোগ্যতা আছে। এ যোগ্যতাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এর বিকাশ ঘটাতে হবে। অন্যথায় যোগ্যতাটা ভেতরেই থেকে যাবে। গুণের বিকাশ হবে না। আর এমনটাই যদি হয়, তাহলে তো আমার আর পশুর মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকল না। আমি প্রকৃত মানুষ হতে পারলাম না। তো মানুষ হতে হলে ওই গুণের বিকাশ ঘটাতে হবে। আর ওই গুণের বিকাশ তো তখনই ঘটাতে পারব, যখন আমি মনে করব– এ গুণের বিকাশ আমার দ্বারা হয়নি। আমি এখনও সত্যিকারের সত্যবাদী হতে পারিনি। আমি এখনও আমানতদার হতে পারিনি। আমি এখনও অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারিনি। আমি এখনও উদার হতে পারিনি। আমি ক্ষমাশীল হতে পারিনি। আমি বিনয়ী হতে পারিনি। এ সমস্ত যখন মনে করব, তখনই এ গুণগুলো অর্জন করতে পারব। সেইসঙ্গে চেষ্টাও অব্যহত থাকতে হবে। ফলে এগিয়েও যেতে পারব। কেননা যে যত চেষ্টা করবে সে তত এগিয়ে যাবে এবং এই

গুণের বিকাশ ঘটাতে ঘটাতে এক সময় সে এমন উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে যে, ফিরিশতাও তাকে দেখে ঈর্ষাবোধ করবে। সুবহানাল্লাহ! এ কি মানুষ! এত ভালো মানুষ! ফিরিশতাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে! আর তা যদি না হই, নিজের গুণের বিকাশ যদি ঘটাতে না পারি, তাহলে পিছিয়ে পড়ব। পিছিয়ে পড়তে পড়তে একটা সময় এমন হবে যে, আমার মতো নিকৃষ্ট জগতে আর কোনও পশু থাকবে না। সমস্ত পশুর চেয়েও আমি অধম হয়ে যাব। শয়তানও আমাকে দেখে বলবে– এ কেমন মানুষরে! এ তো আমার চেয়েও খারাপ! এজন্য নিজের ভেতর থেকে প্রথমে এ দোষটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমি ভালো, ভালো মানুষ, আগে এ ধারণা অন্তর থেকে দূর করতে হবে।

আমরা নিজেদের ভালো মানুষ মনে করি কেন? করি এজন্য যে, ভালো মানুষদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা হয় বড় কম। এজন্য ভালো গুণগুলো চোখে পড়ে না। ভালো গুণগুলো চোখে না পড়ার কারণে ভাবি, আর দশজনের চেয়ে আমি অনেক ভালো। এই ভালো হওয়ার ধারণাটা ভেতরে বাসা বাঁধে। যদি ভালো মানুষদের সাথে মিশতাম তখন দেখা যেত আমার মাঝে কত দোষ, কত ত্রুটি আছে। নিজের নামাযকে যদি ভালো নামাযীর সাথে মিলাতাম তাহলে দেখতে পেতাম, সুবহানাল্লাহ! তার কী নামায আর আমার কী নামায! নিজ আমানতদারিকে যদি আরেকজনের আমানতদারির সাথে মিশাতাম তাহলে বুঝতাম, তার আমানতদারি কী আর আমি কোথায় আছি! নিজ ওয়াদা রক্ষাকে আরেকজনের ওয়াদা রক্ষার সাথে যদি মিশাতাম, তাহলে বুঝতাম আমি কোন জায়গায় আছি। আসলে আমাদের অবস্থা বড় খারাপ। ভালো গুণ, ভালো খাসলত আমাদের মধ্যে বড় কম। কিন্তু সেদিকে নজর নেই। আর নজর না থাকার কারণে ভাবছি আমি বড় ভালো। এই ভালোত্বের ধারণাটাই আমার সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে। বিচার করে দেখুন নিজের মাঝে। একেটা গুণ ধরুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কী গুণ ছিল? তিনি কোন সদগুণ অর্জনের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন? সেই গুণগুলোকে নিজের মধ্যেও দেখুন। তাহলে ধরা পড়ে যাবে যে, আসলে আমি কেমন।

তখন আর আরেকজনকে মন্দ বলার অবকাশই থাকবে না। আরেকজনের মধ্যে ওই দোষ আছে, সেই দোষ আছে, তা দেখার আর সুযোগই হবে না। নিজের হিসাব করুন।

ওয়াদা রক্ষার কথাই বলি। আমরা কতটুকু ওয়াদা রক্ষা করি আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন ওয়াদা রক্ষাকারী ছিলেন? একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে একজনের বেচাকেনা হলো। একজন তাঁর কাছ থেকে একটা জিনিস কিনল। সবটা টাকা তার কাছে নেই। বলল, বাকি টাকা আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি, আপনি এখানে দাঁড়ান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– ঠিক আছে, আমি দাঁড়ালাম, তুমি নিয়ে এসো। ওই লোকটা চলে যাওয়ার পর ভুলে গেল। অন্য কোনও কাজে লেগে গেল। এদিকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন তো বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন আর করছেন। একদিন গেল। দুদিন গেল। তিনদিনের মাথায় সে লোক আসল আর বলল, আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তিনদিন এখানে অপেক্ষা করছেন, এখান থেকে সরলেন না। কেন সরলেন না, বলুন তো? তিনি যে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন তা তো টাকার জন্য নয়। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন এই মনে করে যে, লোকটা এসে যদি আমাকে না পায় তাহলে পেরেশান হবে। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে, আমি এখানে থাকব। এই হলো ওয়াদা। এই ওয়াদা রক্ষার জন্য তিনদিন এক জায়গায় অবস্থান করলেন।[২৬০] আমরা ওয়াদা কতটুকু রক্ষা করি? কারো কাছ থেকে ধার নিয়েছি, এই ধারটা কতটুকু সময়মতো দেওয়ার চেষ্টা করি? কোনও বাড়িতে ভাড়া থাকি, তো সে বাড়ির ভাড়া কি সময়মতো দেওয়ার চেষ্টা করি? কথা তো ছিল অমুক তারিখে দেব। কিন্তু নিয়মিত সে তারিখে দিই কি না? এমনিভাবে আমার ঘরে কিছু লোক কাজ করে। তাদের মাসে মাসে বেতন দেওয়ার কথা এবং কখন দেব সেটাও তার সাথে ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু আমি নিয়মিত তা সে তারিখে দিই কি না? দেখা যাবে তার সাথে

---

২৬০. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৯৯৬

ওয়াদাখেলাফি করি। একটা ওয়াদা তো আছে বিনা কথায়। ওই ওয়াদাটা তো আপনাআপনিই হয়ে যায়। দুজনের মধ্যে যখন কোনও বিষয়ে লেনদেন হয়, তখন বিনা কথাতেই একটা ওয়াদা হয়ে যায়। আর তা হল যে, সে যা পাবে আমি তা তাকে দেব, আমি যা পাব সে তা আমাকে দেবে। এই ওয়াদা আপনাতেই হয়ে যায়। কিন্তু আমি তার পাওনা ঠিক কতটুকু দিই? কথার কথা আমি চাকরি করি। সেটা কোনও বাড়িতে হোক বা অফিসে। সেখানে চাকরির বিনিময়ে একটা বেতন ধার্য করা আছে। এই যে ধার্য হলো এর দ্বারা একটা ওয়াদা হলো যে– আমি কাজ ঠিক ঠিক করব আর সে বেতন ঠিকমতো দেবে। এখন আমি কাজ যদি ঠিক ঠিকভাবে না করি তাহলে ওয়াদাখেলাফি হয়ে গেল। আর সেও যদি বেতন ঠিকমতো না দেয়, এটাও ওয়াদাখেলাফি হল। এই ওয়াদাখেলাফি আমরা তো সচরাচরই করি।

বলছিলাম এটাই যে, একেকটা গুণ বিচার করে দেখি এটা আমার মাঝে কতটুকু আছে। কতটুকু থাকা দরকার ছিল আর আছে কতটুকু? এই যে পরীক্ষা করে– পেশাব, রক্ত, ডায়বেটিস কিংবা প্রেসার। এগুলোতে দেখানো হয় বেশি আছে না কম, নাকি নরমাল। পরীক্ষায় দেখানো হয় যে, এর সাধারণ মাত্রাটা কী আর তারটা বেশি আছে নাকি কম। কম থাকা বিপদের আর বেশি থাকাও বিপদের। আমরা আমাদের মাঝে পরীক্ষা করে দেখি কোন জিনিস আমার মাঝে কতটুকু থাকার দরকার ছিল সেই মাপে আছে কি না। দেখা যাবে মাপমতো নেই; সবটাই কম আছে। বেশি থাকার তো প্রশ্নই আসে না। আছে কম। সত্যবাদিতা আমার মাঝে যে পরিমাণে থাকার কথা ছিল সে পরিমাণে আছে কি না? নেই। মিথ্যা কথা বলি অযথা। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলি। আরেকজনকে হাসানোর জন্য একটা মিথ্যা গল্প বানিয়ে নিই। ঘটে নাই এমন ঘটনা বানিয়ে নিই। এটা তো মিথ্যা হল। তাহলে সত্যবাদিতা আমার মাঝে কতটুকু আছে?

সহমর্মিতা। অন্যের কষ্টে কষ্ট পাওয়া। অন্যের দুঃখে দুঃখবোধ করা এটা আমার মাঝে কতটুকু আছে? দেখা যাবে খুব কমই আছে। রাস্তাঘাটে যখন হাঁটি তখন দেখি একটা বাচ্চা কাঁদছে। ওই বাচ্চাটা

যদি আমার হত, তাহলে কী করতাম? এ বাচ্চাকে দেখে আমি তা করি কি না? করি না। রাস্তায় যদি দেখতাম আমার বাচ্চা কাঁদছে বা আমার নাতি, তাহলে আমি কী করতাম? এ বাচ্চাকে দেখে আমি তা করি কি না? যদি না করি, তাহলে বুঝতে হবে আমার মাঝে সহমর্মিতা যথেষ্ট পর্যায়ে নেই; কম আছে।

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে।[২৬১]

আমার বাচ্চাটাকে রাস্তায় কাঁদতে দেখলে যা করি, অন্যের বাচ্চাকে রাস্তায় কাঁদতে দেখলে তা যদি না করি, তাহলে বুঝতে হবে আমি যথেষ্ট পরিমাণে মুমিন হতে পারিনি। আমার মধ্যে ঈমানের ঘাটতি আছে। আমরা দেখেও না দেখার ভাণ করি। আরেকজনের বাচ্চা কাঁদে তাতে আমার কী আসে যায়? ফিরেও তাকাই না। তাহলে আমি কেমন মুমিন হলাম? ঈমানের ঘাটতি আছে আমার অন্তরে। এ অবস্থায় নিজেকে ভালো মনে করার সুযোগ কই? কিন্তু আমরা তো নিজেকে ভালো মনে করছি। হ্যাঁ, জমানা কত খারাপ হয়ে গেছে, আমরা সব সময় তা বলি। মানুষ কত খারাপ হয়ে গেছে, এ কথা সব সময় বলি। কেন বলি? বলি এজন্য যে, নিজেকে বড় ভালো মনে হয়। যদি নিজের দোষটা নজরে থাকত তাহলে কখনোই একথা বলতাম না। এজন্যই এক হাদীছে এসেছে–

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

যে বলে সব মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে, সে সবচেয়ে বেশি নষ্ট।[২৬২]

কেননা সে মনে করে– আমি বড় ভালো মানুষ। আমরা নিজেকে বড় ভালো মনে করি। নামায পড়ি আর মনে করি, আমি তো নামায পড়ি, আমি বড় ভালো। নামায পড়লেই ভালো হয়ে যায় না। হাঁ, নামায তো

---

২৬১. সহীহ বুখারী : ১৩

২৬২. সহীহ মুসলিম : ৬৮৫০

পড়তে হবে নিঃসন্দেহে। নামায পড়া তো এক নম্বরের কাজ। নামায না পড়লে তো নিজেকে মুসলিম ভাবার কোনও সুযোগই থাকে না। যদি কেউ বলে আমি একজন মুসলিম আবার সে নামায পড়ে না, তাহলে সে তো একজন ধোঁকাবাজ, একজন প্রতারক। কারণ মুসলিম হওয়ার জন্য প্রাথমিক গুণই হল নামায পড়া। যদি কেউ নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেয় আর হজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলে হজ্জও করে, তার মানে সে মুসলিমের কাতারে নিজের নাম লেখাল। সে একজন সাধারণ মুসলিম হলো। এই যে বিভিন্ন দলের সদস্য হয়, এর একটা হল সাধারণ সদস্য। এরপর তার আস্তে আস্তে প্রমোশন হয়। বিভিন্ন পদ পায়। তো মুসলমান দলের সাধারণ সদস্য হওয়ার জন্য নামায পড়া, রোযা রাখা এগুলো শর্ত। এগুলো যে করে সে সাধারণ একজন মুসলমান হল। এটা না করলে তার ওই পরিচয় দেওয়ার অধিকারই থাকে না যে, আমি একজন মুসলমান। এগুলো করে যখন সে মুসলমানের দলে নাম লেখাল, এখন তার কর্তব্য সামনে বাড়া। নামাযের ভেতরেও, বাহিরেও। আমার নামায সাহাবায়ে কেরামের নামাযের মতো হল কি না, খুশু-খুযুর সাথে নামায পড়া হল কি না! প্রত্যেক নামাযকে মনে করবে জীবনের শেষ নামায। এই বুঝি আমার জীবনের শেষ নামায এরপর আমার জীবনে আর নামায পড়ার সুযোগ নাও আসতে পারে। যেন আমার পেছনে আজরাইল আলাইহিস সালাম এসে দাঁড়িয়ে আছে, নামায শেষ করব আর অমনি আমার জান কবওই করবে। যদি জানতাম আমার পেছনে একজন আছে বন্দুক নিয়ে, আমার নামায শেষ হবে আর অমনি সে গুলি করবে, তাহলে আমি এ নামায কীভাবে পড়তাম? ঠিক ওইভাবে নামায পড়তে হবে। জীবনের শেষ নামায মনে করতে হবে প্রত্যেক নামাযকে। আমরা তো সেটা করি না। নামাযের ভেতরেও থাকে নানান ধান্দা। কোনওমতে সালাম ফিরিয়েই দৌড়। দৌড় দেয় এজন্য যে, নামাযের ভেতরেই তার পেরেশানী– ওই যে একটা কাজ রয়ে গেছে, কখন সালাম ফিরাব আর কখন যাব। আরে ভাই! সালাম ফিরানোর পরইতো সুযোগ। এখন তাওবা কবুলের সময়, গুনাহ মাফের সময়। নামায শেষ করে আল্লাহর

কাছে গুনাহের ক্ষমা চাও। বলো, استغفر الله – আয় আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো। এখন তো দুআ কবুলের সুযোগ। এ সুযোগকে সে গ্রহণ করে না। সে ধান্দায় আছে সালাম ফিরিয়েই দৌড় দেবে। তাহলে এ কেমন নামায পড়ছি আমরা! নামাযের মধ্যেও ফাঁকিবাজি। এ নামাযকে আরো উন্নত করতে হবে। কেরাত সহীহ করতে হবে। সুন্নত জানতে হবে। নামাযের আদব জানতে হবে। আর সে মোতাবেক নামায পড়তে হবে। আর আখলাক-চরিত্র! এ সম্পর্কেই আমাদের মূল আলোচনা। এ নামায-রোযা সম্পর্কে আমরা বেশি আলোচনা করছি না। করছি না এজন্য যে, এটা যে করে না সে আবার কী মুসলমান? সে তো ফাঁকিবাজ। এটা নিয়ে কী আলোচনা করব? এটা তো থাকবেই আমাদের মাঝে। আমরা আলোচনা করি আখলাক-চরিত্র সম্পর্কে। নামাযও পড়ি আবার ফাঁকিও দেই, এটা যাতে না হয়। নামাযও পড়ি আবার নিজেকে বড় ভালো মানুষ মনে করি, এটাও যাতে না হয়। কারণ নিজেকে ভালো মানুষ মনে করাটা একটা মহারোগ। যে লোক নিজেকে ভালো আর অন্যকে খারাপ ভাবে, তার দুর্গতির শেষ নেই। শেখ সাদী রহ. বুস্তায় একটা ঘটনা লিখেছেন। শেখ সাদী রহ.-এর দুটি প্রসিদ্ধ কিতাব আছে। একটা 'গুলিস্তাঁ' আরেকটা হল 'বুস্তা।' এ দুটি কিতাবই অসাধারণ। এর ভেতর একটা ঘটনা তিনি লিখেছেন। একবার এক দরবেশ দেখল হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এক ফাসেকের সাথে কথা বলছেন। ওই লোকটা ছিল ফাসেক। চুরি-যেনাসহ সব খারাপ কাজ করত। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। দূর থেকে পাহাড়ের উপর নিজ উপাসনালয়ে বসে দরবেশ তা দেখছে আর মনে মনে ভাবছে– রে পাপিষ্ঠ! তুই কত পাপ করিস আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীর সাথে কথা বলছিস! এ নবীর সাথে কথা বলার অধিকার তোকে কে দিল? তোর মতো পাপী কীভাবে নবীর সাথে কথা বলে? এরকম নানান কিছু সে মনে মনে ভাবছে। সবশেষে বলে উঠল– হে আল্লাহ! আখিরাতে আমাকে ওর সঙ্গে রেখো না। আল্লাহ তাআলা ওহী পাঠালেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এর কাছে। বললেন– ঈসা! তুমি ওই দরবেশকে গিয়ে জানিয়ে দাও।

আল্লাহ তোমার দুআ কবুল করেছেন। আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ওই ব্যক্তির সঙ্গে রাখবেন না। কারণ আল্লাহ তাকে তাওবা করার তাওফীক দেবেন। সে তাওবা করে ঈসার সঙ্গে চলে যাবে। আর তুমি নিজেকে বড় ভালো ভাবছো। এই ভালো জানাই তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

নিজেকে ভালো ভাবার পরিণতি বড় খারাপ; বরং বলা যায় সমস্ত রোগের মূল এটা। এটাই ভেতরে অহংকার সৃষ্টি করে। এটাই ভেতরে হিংসা সৃষ্টি করে। অনেকে বলে তো– ও রোযা রাখে না, নামায পড়ে না, ওর কেন এত টাকা- পয়সা? আর আমি রোযা রাখি, নামায পড়ি, আমার কেন এত কষ্ট? রোযা রাখে, নামায পড়ে, যেন কত সাধু। যেন তার কোনও কষ্ট হওয়া উচিত নয়। তাই ওর প্রতি হিংসা, ওর কেন এত টাকা-পয়সা! তখন সে পেছনে পেছনে ওর বদনাম করে। দেখো! ও সারা বছর নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, অথচ কী ভালো হালে আছে! আর আমি নামায পড়ি, রোযা রাখি, আমার এ অবস্থা। তখন গীবত শুরু করে। এর মূল কারণ হলো– নিজেকে ভালো মনে করা। উজব– আত্মমুগ্ধতা। নিজেকে নিজে বড় ভালো মানুষ মনে করা– এটা হল আসল রোগ। এটা থেকে সকল রোগ সৃষ্টি হয়। নিজের ভেতর থেকে এটা দূর করতে হবে। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর নাম শুনেছেন? বিশেষভাবে এই তিন দেশ– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মানুষ তাঁর কাছে ঋণী। বরং পৃথিবীর বহু মুসলমান তাঁর কাছে ঋণী। কারণ তাঁর 'বেহেশতী যেওর' পড়ে পড়ে মানুষ মাসআলা শিখেছে। তাঁর 'হায়াতুল মুসলিমীন' পড়ে পড়ে মানুষ দীন শিখেছে। তাঁর 'মাওয়ায়েজ' পড়ে পড়ে মানুষ আখলাক শিখেছে। তাঁর খলিফাদের কাছে গিয়ে গিয়ে মানুষ দীন শিখেছে। তাঁর খলিফাদের কাছে গিয়ে মানুষ 'মানুষ' হয়েছে। আশরাফ আলী থানভী রহ. শত শত কিতাব লিখেছেন। কত রকমের নেকী তাঁর পাল্লায় আছে! এই যে আমরা এখানে বয়ান করছি, তার নেকীও তিনি পাচ্ছেন। কেন পাচ্ছেন? কারণ তার লেখা পড়ে পড়েই তো আমরা এগুলো শিখেছি। কাজেই এর ছাওয়াব তিনি পাচ্ছেন। টঙ্গী ইজতিমা কত বড় হয়? কত দীনি কথা হয়? এখানে যত কথা হয় সব ছাওয়াব আশরাফ আলী থানভী রহ.

পান। কেন পান? পান এজন্য যে, তাবলীগের যত বড় বড় মানুষ, তারা মানুষ হয়েছেন আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর কাছে। কাজেই এ আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর আমলনামায় যে কত নেকী! আশরাফ আলী থানভী রহ. কী বলেন, সেটা বড় শিক্ষার জিনিস। তিনি বলেন– আমি বর্তমান অবস্থা হিসেবে দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে আমার চেয়ে উত্তম মনে করি। সমস্ত মুসলমানের মধ্যে কত ফাসেক আছে, কত বেনামাযী আছে, কত চোর আছে এবং কত রকম মানুষ আছে, এদের সবাইকেই তিনি নিজের চেয়ে উত্তম মনে করেন। কারণ এমন হতেই পারে যে, তাদের একজনের এমন একটা আমল আছে, যা সে করেছে, তা আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দ হয়েছে। অনেক সময় মানুষের তুচ্ছ তুচ্ছ আমলও আল্লাহর পছন্দ হয়ে যায়।

বিশর হাফী রহ. একজন বড় মাপের বুযুর্গ। তিনি একদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। প্রথম দিকে খারাপ মানুষ ছিলেন। তো তিনি হাঁটছেন, এমন সময় একটা কাগজ পেলেন। তুলে দেখেন ওই কাগজে আল্লাহর নাম লেখা। আল্লাহর নাম লেখা কাগজ মাটিতে পড়ে আছে, তাতে কত মানুষের পা পড়ছে, হাঁটার সময় জুতা দিয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে, এই ভেবে তিনি শিউরে উঠলেন। তাই যত্নের সাথে কাগজটা নিলেন এবং তা মুছে পরিষ্কার করলেন। তারপর তাতে আতর মাখালেন। আতর মাখিয়ে তা এক জায়গায় সংরক্ষণ করলেন। আল্লাহ তাআলার এটা খুব পছন্দ হল। আল্লাহ তাআলা বুযুর্গানে দীনদের কাশফের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, বিশর আমার নামকে সুরভিত করেছে। আতরমাখিয়ে আমার নামকে সুরভিত করেছে। আমি তার নামের সুরভি সারা জগতে ছড়িয়ে দেব।[২৬৩] আজ বিশর হাফীকে কে না চেনে!

আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. কত বড় ফকীহ, মুহাদ্দিছ, আলেম, তিনি পর্যন্ত বিশর হাফী রহ.-এর কাছে দুআ চাইতেন। এমন কি তার পরিবারের মহিলাদেরকেও তিনি সম্মান-শ্রদ্ধা করতেন।

তো আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন– কার কোন আমল আল্লাহর কাছে পছন্দ হয়ে যায়, তা তো আমি জানি না। এমন হতে পারে যে,

---

২৬৩. ইবনে কুদামা, আততাওয়াবীন, পৃ. ১২৮

আমার কোনও এক আমল আল্লাহর কাছে এত অপছন্দ হয়ে গেছে, যে কারণে তিনি আমার উপর নারাজ হয়ে গেছেন। তাই আমি আমার বর্তমান অবস্থায় দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে আমার চেয়ে সেরা মনে করি। আর ভবিষ্যত-সম্ভাবনা হিসেবে দুনিয়ার সমস্ত কাফেরকে আমি আমার চেয়ে ভালো মনে করি। কারণ এমন হতেই পারে যে, কোনও কাফেরকে আল্লাহ তাআলা যে-কোনও সময় তাওবার তাওফীক দেবেন। আর খাঁটি মনে তাওবা করলে অতীতের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপর এটা হতেই পারে যে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করার পর সে ইবাদত-বন্দেগী করে অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছে যাবে, ফলে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যাবে। কাজেই ভবিষ্যত সম্ভাবনা হিসেবে আমি দুনিয়ার সমস্ত কাফেরকেও আমার চেয়ে সেরা মনে করি। এ কথাটা কার? আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর। তার মূল শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ইনতিকালের পর তিনি যান রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.-এর কাছে। এই রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলতেন– আমি তো একটা কুকুরকেও আমার চেয়ে উত্তম মনে করি। রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর পীর, শায়খ। তিনি বলেন এই কথা। এই যদি তাদের অবস্থা হয়, তাহলে আপনি আমি কে যে, নিজেকে এত ভালো মনে করি? এ ভালো মনে করাই আপনার-আমার সর্বনাশ করেছে। এরই জন্য সামনে বাড়তে পারছি না। যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়ে আছি; বরং দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছি। দিন দিনই গুনাহ বাড়ছে। গুনাহের বোঝা বাড়ছে। গুনাহের বোঝা বাড়াই তো পেছনে পড়া। এই পেছনে পড়া থেকে যদি বাঁচতে হয়, নিজেকে যদি সত্যিকার মানুষ করতে হয় তাহলে এ ভাবটা অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে যে, আমি একজন ভালো মানুষ, সাধু মানুষ। মনে করতে হবে– আমার মতো গুনাহগার জগতে আর কেউ নেই। আমার মতো পাপী জগতে আর কেউ নেই। যারা যত ভালো ছিলেন, তারা নিজেদের তত পাপী মনে করতেন।

ভাবুন দেখি, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. কেমন মানুষ ছিলেন? নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ। বেঈমান শিয়ারা যাঁকে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে। এদেরকে তো মানুষ মুসলমান মনে করে। যে ব্যক্তি আবূ বকর সিদ্দীক রাযি.-কে ঘৃণা করবে, সে আবার মুসলমান হতে পারে? যে ব্যক্তি আমাদের মা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-কে খারাপ মনে করে, সে কি মুসলমান হতে পারে? কারণ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.-এর চরিত্রের পক্ষে সার্টিফিকেট দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে। কাজেই তাঁকে যে খারাপ মনে করে, সে আল্লাহকেই অবিশ্বাস করে, কুরআনকে অবিশ্বাস করে। সে কি মুসলমান হতে পারে? যদি কেউ মনে করে কুরআন কারীমের মধ্যে পরিবর্তন হয়ে গেছে, সে কি মুসলমান? শিয়ারা তাই মনে করে। শিয়াদের মত খবিস জাতি এ জগতে আর নাই। এরা ইহুদীদের চেয়েও খারাপ। শিয়ারা এত খারাপ যে, এরা তাদের গাধার নাম রাখে– উমর, আবূ বকর। কোনও ইহুদী কিন্তু তা করে না। একবার শায়খ মির্জা মাযহার জানে জানা রহ.-এর আমলে একটা গাধা লাথি মেরে তার মালিককে মেরে ফেলেছে। তার দুইটা গাধা ছিল। একটা গাধার নাম রেখেছে আবূ বকর, আরেকটার নাম রেখেছে উমর। না'উযু বিল্লাহি মিন যালিক। এ ঘটনা শোনানো হল মির্জা মাযহার জানে জানা রহ.-কে যে, অমুককে তার গাধা লাথি দিয়ে মেরে ফেলেছে। তিনি বললেন– খবর নিয়ে দেখো, যে গাধার নাম রেখেছে 'উমর', সেটাই লাথি মেরেছে। তাই হয়েছে। পরে খবর নিয়ে দেখা গেল ওই গাধাটাই তাকে লাথি মেরে খতম করেছে, যার নাম রেখেছে 'উমর'। যাই হোক, বলতে চাচ্ছি ওরা কত জঘন্য যে, ওদের পশুর নাম রাখে 'আবূ বকর', 'উমর'।

বলছিলাম– নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ আবূ বকর। এ আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. নিজেকে কী মনে করতেন? তিনি একটা পাখির দিকে তাকিয়ে বলতেন– পাখি রে! তুই মুক্ত স্বাধীন। তোর কত সৌভাগ্য যে মরণের পর তোর কোনও হিসাব নেই। ব্যস, তুই মাটি হয়ে যাবি, তাতেই শেষ। কিন্তু আমাকে তো হিসাব দিতে হবে। হায় আমি যদি তোর মত হতাম![২৬৪]

---

২৬৪. তারীখে দিমাশক : ৩০/৩৩১

হযরত আবুদ্দারদা রাযি. বলেন, আমি যদি মানুষ না হয়ে গাছ হতাম! আমার ফলমূল-পত্রপল্লব খেয়ে যদি আমাকে নিঃশেষ করে ফেলা হতো![২৬৫]

হযরত উমর ফারূক রাযি.। তিনিও এমন করতেন। খড়কুটো হাতে নিয়ে বলতেন– হায় যদি আমি খড়কুটো হতাম! আমি যদি কিছুই না হতাম! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন! একেবারেই যদি আমি বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম![২৬৬]

মরলে আমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সেখানে তো হিসাব নেওয়া হবে। আমি যা করেছি সব সেখানে হাজির হয়ে যাবে। ভালো করলে তাও দেখা যাবে আর মন্দ করলে তাও দেখা যাবে। সূরা যিলযালের শেষে আছে–

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ

> সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। কারণ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হবে। সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে সে তা দেখতে পাবে। এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করে থাকলে তাও দেখতে পাবে।[২৬৭]

সব সেদিন হাজির হয়ে যাবে। যতই সাধুগিরি করি না কেন, চোখের সামনে সব কৃতকর্ম হাজির করা হবে। ছবিরূপে দেখিয়ে দেওয়া হবে। সব দেখানো হবে। এখন যেমন সিসি ক্যামেরায় সব সংরক্ষিত হয়, তেমন। তুমি অমুককে এভাবে ব্যঙ্গ করেছিলে, তা দেখানো হবে। আমরা তো নানাভাবে মানুষকে ব্যঙ্গ করি। যেমন– কেউ খাঁটো, আমি

---

২৬৫. প্রাগুক্ত

২৬৬. ইবনুল মুবারক রহ., কিতাবুয যুহদ : ১/৭৯

২৬৭. সূরা যিলযাল : ৬-৮

ইশারা দিয়ে দেখাই। এটা যে কিছু করলাম, তা মনে করি না। অথচ এটা কত খারাপ।

আমাদের মা আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ধীরে ধীরে শিখেছেন। শেখার আগে একবার এমন হল যে, তিনি বলতে গিয়ে বললেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়্যা তো এই এতটুকু! হাত দিয়ে ইশারা করে খাঁটো বোঝালেন। আমাদের আরেক মা সাফিয়্যা রাযি.। তিনি খাঁটো ছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– আয়েশা! তুমি এমন কথাই বললে যে, এটা যদি সাগরের পানির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সাগরের পানিকে নষ্ট করে ফেলার জন্য এটাই যথেষ্ট।[২৬৮]

অথচ আমরা তো একে কিছু মনেই করি না। ছবি দেখিয়ে দেওয়া হবে, কে কী কাজ করেছে দুনিয়ায়। আমরা তো নিজেকে বড় সাধু মনে করি। ভালো মনে করি। কোনও দোষের কথা আলোচনা হলেই মনে করি– এটা অমুকের মধ্যে আছে, আমার মধ্যে নেই। নজরটা চলে যায় অন্যের দিকে। এ করলে কোনওদিন আমরা ভালো হতে পারব না। এখন থেকেই তাওবা করতে হবে। আল্লাহ! অতীতে নিজেকে বড় ভালো মনে করেছি। কিন্তু আমার অনেক অপরাধ ছিল। আমি তাওবা করলাম। তুমি আমাকে এই অনুভূতি দাও, যাতে নিজের দোষ নিজে দেখতে পারি। নিজেকে যাতে কিছুতেই ভালো মনে না হয়। নিজের দোষের দিকে যেন নজর দিতে পারি এবং তার ইসলাহ যেন করতে পারি, সেই তাওফীক তুমি আমাদেরকে দাও। আল্লাহ জাল্লা শানুহু কবুল করে নিন। আমীন।



২৬৮. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৮৭৫; জামে' তিরমিযী : ২৫০২

# মিথ্যা বলা আর নয়

نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى:

وَ لَا تُخۡزِنِیۡ یَوۡمَ یُبۡعَثُوۡنَ 0 یَوۡمَ لَا یَنۡفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوۡنَ 0 اِلَّا مَنۡ اَتَی اللّٰهَ بِقَلۡبٍ سَلِیۡمٍ

এবং আমাকে সেইদিন লাঞ্ছিত করবেন না, যেদিন মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। যে দিন কোনও অর্থ-সম্পদ কাজে আসবে না এবং সন্তান-সন্ততিও না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে সুস্থ মন নিয়ে (সে মুক্তি পাবে)।[২৬৯]

মুহতারাম ভাই-বন্ধুগণ ও আমার মা-বোনেরা!

কুরআন মাজীদের এই আয়াতকে রেখে আমরা গত দুই সপ্তাহ আলোচনা করেছি। আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, আখিরাতে টাকা-পয়সা, ছেলেমেয়ে ও লোকবল দিয়ে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

---

২৬৯. সূরা শুআরা : ৮৭-৮৯

অর্থবল ও লোকবল দিয়ে কাজ হবে না। মুক্তি পাওয়ার উপায় কলবে-সালীমের অধিকারী হওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে নিখুঁত মন নিয়ে, সুস্থ ভালো মন নিয়ে, সেই মুক্তি পাবে। ভালো মনের মানুষ হতে হবে। এছাড়া আর কোনও কিছুতেই মুক্তি পাওয়া যাবে না। মনটা যদি ঠিক না থাকে, মনের ইসলাহ যদি না হয়, তাহলে তো যে নামায পড়া হবে, সে নামায দাঁড়িপাল্লায় কোনও ওজন রাখবে না। একজন নামায পড়ছে এই ভাবনার সঙ্গে– মানুষ আমাকে নামাযী বলবে। একজন হজ্জ করছে এই চিন্তার সঙ্গে– আমি হাজী সাহেব হয়ে যাব। লোকে আমাকে হাজী সাহেব বলবে। আমার সুনাম হবে। একজন যাকাত দিচ্ছে এই চিন্তা করে– চারদিকে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। ইলেকশনে আমি বেশি ভোট পাব। তাহলে এই যে ইবাদত-বন্দেগীগুলো সে করছে, তা সবই হচ্ছে রিয়ার সঙ্গে, লোক দেখানো মানসিকতার সঙ্গে। তা কলবে সালীমের সঙ্গে হল না, সুস্থ মনের সঙ্গে হল না। ফলে এ নামায, যাকাত, হজ্জ – এগুলো কোনও কাজে আসবে না।

## হাশরের ময়দানে তিনজনকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা ডাকবেন এক শহীদকে। ডেকে বলবেন– তোমাকে আমি এতকিছু দিয়েছিলাম, তুমি আমার জন্য কী করেছ? সে বলবে– আল্লাহ! তোমার জন্য আমি আমার প্রাণটা দিয়ে দিয়েছি। তোমার পথে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন– শহীদ তো হয়েছে এজন্য যে, লোকে তোমাকে বীর বলবে। তা তোমাকে লোকে বীর বলেছে। যে উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছিলে তা পেয়ে গেছ। আমার কাছে তোমার কিছু পাওয়ার নেই। আল্লাহ তাআলা ডাকবেন এক ধনীকে। ডেকে বলবেন– তোমাকে আমি অনেক ধন-সম্পদ দিয়েছিলাম। আমার জন্য তা দিয়ে কী করেছ? সে বলবে– আল্লাহ! তোমার রাস্তায় আমি তা খরচ করেছি। দীনের বিভিন্ন খাতে অকাতরে দান করেছি। আল্লাহ বলবেন– তুমি তা করেছিলে এজন্য যে, লোকে তোমাকে দানবীর বলবে। দুনিয়ায় তা বলা হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করেছিলে তা পেয়ে গেছ। আমার কাছে তোমার কোনও প্রাপ্য

নেই। আল্লাহ তাআলা এরপর আলেম, কারী সাহেবকে ডাকবেন আর বলবেন– তোমাকে আমি ইলম দিয়েছিলাম। কুরআনের কারী বানিয়েছিলাম। আলেম বানিয়েছিলাম। তুমি তা দ্বারা কী করেছ? সে বলবে– আমি মানুষকে ইলম শিখিয়েছি। তোমার ইলম প্রচার করেছি। আল্লাহ বলবেন– তুমি তা করেছিলে এজন্য যে, লোকে তোমাকে বড় আলেম বলবে। অনেক বড় কারী সাহেব বলবে। তা তো বলা হয়েছে। এখন আমার কাছে তুমি কিছুই পাবে না। ফিরিশতাদেরকে হুকুম দেওয়া হবে– এদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।[২৭০]

শহীদ হয়ে গেল, তাও জাহান্নামে যাবে। সে আল্লাহর রাস্তায় কত টাকা খরচ করেছে, তারপরও জাহান্নামে যাবে। সে ইলমের প্রচার করেছে, তারপরও জাহান্নামে যাবে। কেন যাবে? যাবে এজন্য যে, এ কাজগুলো ইখলাসের সঙ্গে ছিল না, আল্লাহর জন্য ছিল না, বরং ছিল দুনিয়ার জন্য। ওই হাদীছ আমরা সবাই জানি–

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات

সমস্ত আমলের সম্পর্ক নিয়তের সাথে।[২৭১]

## ইখলাসের জরুরত

নিয়ত যদি ভালো হয়, তখন ওই আমল গ্রহণযোগ্য। নিয়ত ভালো হওয়া মানে আমল আল্লাহর জন্য হওয়া। আল্লাহর জন্য যদি না হয়, তবে দেখতে যতই ভালো হোক, খুব সুন্দর কেরাতের সঙ্গে, দীর্ঘ রুকু-সিজদার সঙ্গে নামায পড়া হল, কিন্তু তা আল্লাহর জন্য নয়; বরং এজন্য যে, লোকে নামাযী বলবে আর ইলেকশনে মানুষ ভোট দেবে, কোনও লাভ হবে না। এ নামায তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এ নামায দিয়ে সে মুক্তি পাবে না। সুতরাং কলবের ইসলাহ খুব জরুরি। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

---

২৭০. সহীহ মুসলিম : ১৯০৫

২৭১. সহীহ বুখারী : ১

أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– শোনো! শরীরের ভেতরে একটা মাংসপিণ্ড আছে। ওইটা যদি ঠিক থাকে তাহলে সারা শরীর ঠিক। আর ওইটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, সারা শরীর নষ্ট। এটা হল কলব– অন্তর।[২৭২]

এটা ঠিক থাকলে সারা শরীর ঠিক। তার মানে প্রত্যেক অঙ্গ দিয়ে যে কাজ করবে, সে কাজ সঠিক কাজ হবে। আর এটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। ভালো কাজ হবে না।

এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

আল্লাহ তোমাদের চেহারা-সুরত ও শরীরের প্রতি লক্ষ করেন না, তিনি লক্ষ করেন তোমাদের কলব ও আমলের প্রতি।[২৭৩]

কাজেই কলবের ইসলাহ খুব জরুরি জিনিস।

## মিথ্যা বলা পরিহার করার জরুরত

কলবের ইসলাহ বলতে অন্তরের ভেতরে যে রোগগুলো আছে সেগুলো দূর করা। আজকের মজলিসে যে হাদীছ পড়া হয়েছে, তাতে অন্তরের কঠিন একটা রোগের কথা আছে। মিথ্যাচার করা। এটাও মানুষের মনের রোগ। অনেকেই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলে। মিথা কথা বলা স্বভাব হয়ে গেছে। অথচ মিথ্যা কথা বলা মুমিনের শান নয়। প্রথম হাদীছে আছে–

---

২৭২. সহীহ বুখারী : ৫২

২৭৩. সহীহ মুসলিম : ৬৭০৭

يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا إِلاَّ الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ

মুমিনের চরিত্রে সব দোষ থাকতে পারে, কিন্তু খেয়ানত ও মিথ্যা বলার খাসলত থাকতে পারে না।[২৭৪]

কারণ মিথ্যা কথা বলা ঈমানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন জিনিস। ঈমান এবং মিথ্যাচার একটা আরেকটার বিপরীত। একজন মুমিনও হবে আবার তার ভেতর মিথ্যাচারও থাকবে, এটা হতে পারে না। কিন্তু আজকাল আমরা কথায় কথায় মিথ্যা বলি। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলি। যদি অন্তরে এই দোষটাই থেকে যায়, মিথ্যা বলার অভ্যাস যদি থেকে যায়, তাহলে কেমন মুমিন হলাম! এ খাসলত তো জাহান্নামে নিয়ে যাবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ

মিথ্যাচার মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যায়। আর পাপাচার মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।[২৭৫]

অপর এক হাদীছে আছে– একজন মুমিন বখিল হতে পারে, কিন্তু মিথ্যুক হতে পারে না। মুমিন আবার মিথ্যুক এ অসম্ভব।

কিন্তু এখন কিছুই অসম্ভব নয়। নিজেদের মুমিন বলে দাবি করি অথচ মিথ্যা কথাও বলি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. বলতেন–

إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ الْإِيمَانَ

সাবধান! তোমরা মিথ্যা বলবে না। কেননা মিথ্যা বলা ঈমানের পরিপন্থী।[২৭৬]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের আলামত বলেছেন। প্রকৃত মুনাফিক তো সেই, যার অন্তরে ঈমান নেই। মূলত সে কাফেরই, কিন্তু প্রকাশ্যে সে নিজেকে মুমিনরূপে পরিচয়

---

২৭৪. মুসনাদে আহমাদ : ২২৫২৩

২৭৫. সহীহ বুখারী : ৬০৯৪

২৭৬. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা : ৪৪৬৭

দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলাকে মুনাফিকের আলামত বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের আলামত তিনটি। কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে আর আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।[২৭৭]

## নিজের পাপ চোখে না পড়ার কারণ

আমরা ব্যাপকভাবে মিথ্যা কথা বলি। আমরা কেমন মুমিন! অনেকের মনে হয়– কই আমি তো কখনও মিথ্যা বলি না। নিজেকে খুব সত্যবাদী মনে হয়। এটা মনে হয় এজন্য যে, নিজেকে যাচাই করা হয় না। কিংবা বলা যায়– মনের ইসলাহ নেই। কলবের ইসলাহ নেই বলে দোষগুলো চোখে পড়ে না। নিজে পাপী হলে তখন নিজের ভেতরে পাপ খুব কম নজরে পড়ে। আর যারা পাপী নয় তাদের নজরে পাপ খুব বেশি ধরা পড়ে। নিজেকে খুব সাধু মনে হয়, যখন খুব বেশি পাপ করা হয়। পাপ করতে করতে মনের উপর কালিমা পড়ে গেছে। হাদীছ দ্বারা জানা যায়– গুনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে যায়। যখন পাপ করতে করতে সারাটা অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন আর নতুন পাপের দাগ চোখে পড়ে না। যারা পাপ কম করে তাদেরই নিজেকে বেশি পাপী মনে হয় কারণ অন্তর গুনাহের কালো দাগে ঢাকা পড়েনি। অন্তর সাদা। আর অন্তর সাদা হওয়ার কারনে যখনই কোনও কালো দাগ পড়ে, তা দেখা যায়। ব্যস, তখন খুব ভয় পেয়ে যায়। তখন নিজেকে খুব পাপী মনে হয়। ফলে তাওবা-ইসতিগফার করে।

হাদীছে আছে– পাপ করলেই অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে। এভাবে পড়তে পড়তে একসময় পুরো অন্তর কালো হয়ে যায়।[২৭৮] এরপর পাপ

---

২৭৭. সহীহ বুখারী : ৩৩

২৭৮. মুনযিরী, আততারগীব ওয়াততারহীব : ২৫০৬

করলে ওটা আর নজরে পড়ে না। এটা এভাবে বুঝতে পারি, যদি কাপড় পরিষ্কার থাকে, যেমন সাদা কাপড়, একটা কালো দাগ পড়লেই নজরে আসে। আর যদি কাপড়ই কালো হয়, তাহলে দাগ পড়লে তা চোখে পড়ে না।

এখন আমরা এর উদাহরণ দিই অন্যকে দিয়ে। অন্যের সাদা শরীর, তাতে ময়লা পড়েছে, তা আমার নজরে আসে। আসলে তো এটা নিজের অবস্থা। নিজের অন্তর যদি সাদা থাকে আর তখন কোনও পাপ করে, সঙ্গে সঙ্গে তা নজরে আসবে। আর নিজের অন্তর যদি পাপ করতে করতে কালো হয়ে যায়, তখন পাপ করলে আর নজরে আসে না। তখন নিজেকে খুব সাধু মনে হয়। আমাদের অবস্থা এমনই। নিজেকে খুব সাধু মনে হয়। এটা অতিরিক্ত পাপের ফল। ওই যে বললাম, নিজের সম্পর্কে মনে হয়– আমি তো মিথ্যা কথা বলি না। কিন্তু যখন আমার সামনে অন্য কেউ মিথ্যা কথা বলে, তখন খুব ক্ষেপে যাই। মিথ্যা কথা বললে যে! আমি মিথ্যা সইতে পারি না। আমি সব সইতে পারি, মিথ্যা সইতে পারি না। তার মানে আমি বড় সাধু। অথচ আমি হাজারটা মিথ্যা বলি। কিন্তু মিথ্যা বলা সত্ত্বেও আমার নজরে তা পড়ে না। এটা অনেক বড় পাপী হওয়ার লক্ষণ।

## এক মায়ের ঘটনা

এখন কেউ বলতে পারে– আপনি প্রমাণ দেখান তো যে, আমি মিথ্যাবাদী! প্রমাণ করা খুব সহজ। প্রত্যেকেই নিজেরটা নিজে প্রমাণ করতে পারব। যেমন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলাকে দেখলেন তার ছেলেকে ডাকছে আর নিজের হাত বন্ধ করে দেখাচ্ছে যে, আসলে এটা দেব। বাচ্চারা যখন একটু দৌড়ানো শেখে, তখন অনেক সময় বিভিন্ন কারণে দৌড় দিয়ে মায়ের নাগালের বাইরে চলে যায়। এখন মা তাকে ধরবে কী করে! মা তো আর তার পেছনে দৌড়াতে পারে না। তখন নানা বাহানা করে তাকে কাছে ডাকে। ওই মা'ও তাই করছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তুমি যে তাকে বললে আসলে এটা দেব, আসলেই

কি কিছু দিতে, না কেবলই ফাঁকি দিয়ে তাকে কাছে ডাকা, ফাঁকি দিয়ে তাকে কাছে আনা? ওই মহিলা বলল, হ্যাঁ, আমার হাতের ভেতর একটা খেজুর ছিল। সে কাছে আসলে এই খেজুরটা দিতাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন– তাহলে তো ঠিক আছে। আর তা না হলে এটা মিথ্যা হত।[২৭৯]

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলতেন– মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য বিষয় ছিল মিথ্যা বলা।[২৮০] অথচ আমরা তাঁর উম্মত হয়ে হামেশা মিথ্যা কথা বলি। আমাদের মায়েদের অনেকেই শিশুদের সাথে এ জাতীয় মিথ্যা কথা বলে থাকে। এই মজা খাওয়াবো, মজা দেব। পরে দেখা গেল কিছুই খাওয়ালো না; ফাঁকি দিল। এ তো মিথ্যা কথাই হল। যে মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, সেই মা তার সন্তানকে এভাবে মিথ্যা বলা শেখালো। কতই না আফসোসের কথা।

## শোনা কথা বলে বেড়ানো

আমরা মিথ্যা বলি নানাভাবে। শোনা কথা বলে বেড়ানোও মিথ্যা বলাই। এক হাদীছে আছে–

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

একজন লোকের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, শোনা কথাই সে বলে বেড়ায়।[২৮১]

একটা কথা শুনলাম, আর এ নিয়েই হৈচৈ। আমি যাচাই করলাম না– এ কথাটা সত্য না মিথ্যা। কথাটা সঠিক না ভুল, আমি যাচাই না করেন গাইতে থাকলাম। এভাবে শোনা কথা যাচাই করা ছাড়া বলে বেড়ালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীছ মোতাবেক

---

২৭৯. সুনানে আবূ দাউদ : ৪৯৯১

২৮০. জামে' তিরমিযী : ১৯৭৩

২৮১. সহীহ মুসলিম : ৭

সে একজন মিথ্যাবাদী। এবার নিজেকে যাচাই করুন– শোনা কথা শোনার পরে যাচাই করি কি না, না শুনেই বিশ্বাস করি আর বলে বেড়াই। এ জাতীয় মিথ্যা কথা আমরা আলেম-বেআলেম, তাবলীগি-বেতাবলীগি, মুসল্লী-অমুসল্লী, হাজী সাহেব-অহাজী সাহেব সবাই বলি। একটা কথা একজনের কাছে শুনেই তা বলে বেড়াই। নিজে যাচাই করি না যে, কথা সঠিক কি না।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

হে মুমিনগণ! কোনও ফাসেক যদি তোমাদের কাছে কোনও সংবাদ নিয়ে আসে, তবে ভালোভাবে যাচাই করে দেখবে, যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনও সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে না বস। ফলে নিজেদের কৃতকর্মের কারণে তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।[২৮২]

এখানে ফাসেক বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? ফাসেক বলতে তাকেই বোঝায়, যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে। তো যে প্রকাশ্যে মিথ্যা বলে, সে কী? আমার মাথায় টুপি আছে, মুখে দাড়ি আছে, লম্বা জামা আছে, এমন কি পাগড়িও হয়তো আছে, কিন্তু আমি প্রকাশ্যে একটা মিথ্যা কথা বললাম। তাহলে আমি কী হয়ে গেলাম? ফাসেক হয়ে গেলাম। কাজেই একটা কথা শুনেই যাচাই করলাম না; আমি প্রচার শুরু করলাম, আমি ফাসেক হয়ে গেলাম এবং আমি মিথ্যুক। এই মিথ্যা কথা তো আপনি-আমি সবাই বলছি।

## মুরুব্বীর কাছে শুনলেই বলা যাবে না

এমন কথা আসে যে, মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি। মুরুব্বীদের কাছে শুনলেই হবে না। মুরুব্বী ভুলও বলতে পারে। অনেক বড় এক

২৮২. সূরা হুজুরাত : ৬

মুরুব্বীর কথা আছে। তার বয়ানের মধ্যে আছে যে, মুমিনের কলব আল্লাহর আরশ। এই যে কথা বলেছেন, তিনি অনেক বড় মুরুব্বী। তিনি যত বড় মুরুব্বীই হোন না কেন, কথাটা ভুল। এটা হাদীছ নয়; গলত কথা। এমনিভাবে–

اوَّل مَا خَلَقَ اللهُ نورِی

আল্লাহ আমার নূর সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছেন।

এটাও একজন বড় মানুষের বয়ানের মধ্যে আছে। আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন, এটাকে হাদীছ বলা তো গলত। এরকম কোনও হাদীছ নেই। এটা বানোয়াট হাদীছ। বানোয়াট হাদীছ বলা মহাপাপ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

لاَ تَكْذِبُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ

আমার নামে মিথ্যা বলো না (অর্থাৎ মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করো না)। কেননা যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে জাহান্নামে যাবে।[২৮৩]

একটা কথা–

জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুটো যদি জোটে অর্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী!

রাস্তায় রাস্তায় লেখা আছে বিভিন্ন জায়গায় এবং হাদীছ হিসেবে এটাকে বয়ান করা হয়। এটা গলত কথা। হাদীছ নয়। অনেকেই বলে–

اطْلُبِ العِلمَ وَلَو بالصِّين

ইলম সন্ধানে চীন হলেও যাও।

হাদীছ হিসেবে এটা বলা হয়ে থাকে। এটা হাদীছ নয়। এখন এ জাতীয় কথা যদি আমি কোনও মুরুব্বীকে বলতে শুনি আর তা বয়ান

---

২৮৩. সহীহ বুখারী : ১০৬

করা শুরু করে দিই, তাহলে كَفَى بِالمَرءِ كذبًا ان يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِع –এর মধ্যে পড়ে গেলাম। আমি মিথ্যুক হয়ে গেলাম। শুধু মুরুব্বীর কাছে শুনলেই হবে না; যাচাই করতে হবে যে, কথাটা কতটুকু সঠিক।

## দাওয়াতের যিম্মাদারী সব উম্মতেরই ছিল

বলা হয়ে থাকে– এ উম্মত দাঈ উম্মত। এ উম্মতের জন্যই দাওয়াতের দায়িত্ব। এর আগের উম্মতের দাওয়াতের দায়িত্ব ছিল না। একদম গলত কথা। কুরআন ও হাদীছবিরোধী কথা। সমস্ত মানুষেরই দাওয়াতের দায়িত্ব ছিল। সমস্ত মানুষ আল্লাহর খলীফা। আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলীফা এবং তাঁর বংশধর সবাই আল্লাহর খলীফা। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব সমস্ত মানুষের। আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সমস্ত মানুষের। এর আগের অনেক উম্মতের এমন হয়েছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন এজন্য যে, যখন পাপ করেছে মানুষ, কেউ বাধা দেয়নি। ফলে ওই ভালো মানুষসহ সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

একবার এক জাতির কাছে ফিরিশতা আসল ধ্বংস করার জন্য। আল্লাহ হুকুম দিলেন– সবাইকে ধ্বংস করে দাও। ফিরিশতা বলল,

يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ

ইয়া আল্লাহ! ওদের মধ্যে এমন একজন আছে যে জীবনেও পাপ করেনি।

আল্লাহ বললেন–

اقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ

তাকেসহ সবাইকে ধ্বংস করো। কারণ নিজে পাপ না করলে হবে কী! কখনো আমার জন্য তার চেহারা রক্তিম হয়নি।[২৮৪]

---

২৮৪. বায়হাকী, আসসুনানুল কুবরা : ৭১৮৯

অন্যায় দেখেছে আর দেখে সে চুপ রয়েছে। অন্যায় দেখা সত্ত্বেও সে চুপ করে আছে, সে তাতে বাধা দেয়নি, কাজেই তাকেসহ ধ্বংস করে দাও। আল্লাহ তাআলা অতীতের এরূপ লোকদেরকে তিরস্কার করে বলেন–

كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

তারা যেসব অসৎ কাজ করত, তাতে একে অন্যকে নিষেধ করত না। বস্তুত তাদের কর্মপন্থা ছিল অতি মন্দ।[২৮৫]

আগের উম্মতের সম্পর্কে বলা হয়েছে– অন্যায় করেছে, তারপরও একে অন্যকে নিষেধ করেনি, তাই এদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং একথা বলা যে, এ উম্মতই দাঈ আর অন্য উম্মতের উপর দাওয়াতের দায়িত্ব ছিল না– তা একেবারে কুরআন ও হাদীছবিরোধী কথা। কোনও এক মুরুব্বী কখনো ভুলবশত বলে ফেলেছে আর এটা শুনে অন্যরা বয়ান শুরু করেছে। ব্যস, চালু হয়ে গেল। প্রথমে যিনি বলেছেন, তিনি অসতর্কতাবশতা বলে ফেলেছেন আর যারা শুনেছে তারা যাচাই ছাড়াই বয়ান করা শুরু করেছে। তারা সবাই كَفَى بِالمَرءِ كذبًا ان يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ এর আওতায়। শোনা কথা বয়ান শুরু করল যাচাই ছাড়া, কাজেই তারা মিথ্যুক। কোনও দীনি কথায় মিথ্যা বলা দুনিয়াবী বিষয়ে মিথ্যা বলা থেকে অনেক গুরুতর। অন্যের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা যে, অমুকে এ কাজটা করেছে, আসলে করেনি, তো তার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা হল। এটা মহাপাপ। কিন্তু যদি দীন সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা হয়, কোনও হাদীছ বানিয়ে বলা হয়, তাহলে তো এটা অনেক গুরুতর ও কঠিন পাপ।

কাজেই এ কথা বলা– আমি মিথ্যা বলি না, এটা অতি সরল ভাবনা। মিথ্যা বলার স্বভাব আমাদের বেশিরভাগ লোকেরই আছে। একটা কথা শুনেই যাচাই-বাছাই না করেন বলা শুরু করে দিই। অথচ যে হাদীছ পড়া হল সে হাদীছে বলা হয়েছে– মুমিনের সাথে মিথ্যা যায় না। একজন লোক মুমিনও হবে আবার সে মিথ্যুকও হবে, এ হতে পারে না।

---

২৮৫. সূরা মায়িদা : ৭৯

কিন্তু আমরা ব্যাপকভাবেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কথায় কথায় মিথ্যা বলতেই থাকি।

## মিথ্যা বলার নির্লজ্জতা

আজকাল এ বিষয়ে মানুষের নির্লজ্জতা এত বেড়ে গেছে যে, আরেকজনের সামনে অনায়াসে মিথ্যা বলা হয়। বাবা সন্তানের সামনে মিথ্যা বলে। সন্তান দেখছে তার বাবা মিথ্যা বলছে। এই সন্তান কী শিখবে তার কাছ থেকে? কেউ ডাকতে গেল, আর বলে– বলে দাও, বাবা ঘরে নেই। ছেলে-মেয়ে দেখছে যে, বাবা ঘরে থাকার পরও বলছে ঘরে নেই। ইদানিং এই যে মোবাইল ফোন বের হয়েছে, এর দ্বারা মানুষের মিথ্যাচার আরো ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গাড়ি-ঘোড়ায়, পথে-ঘাটে মানুষজনের সামনে মোবাইল ফোনে কথা বলে আর বেধড়ক মিথ্যা বলে দেয়। ফোন আসল তো বলছে– ভাই আর বলবেন না! কী জ্যাম! এই যে গুলিস্তানের মোড়েই বসে আছি। অথচ সে মহাখালি। এর মানে দাঁড়াল– সে কেবল মিথ্যাই বলছে না, তার লজ্জা বলতেও কিছু নেই। লজ্জা শেষ হয়ে গেছে। আর লজ্জা যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে আর থাকল কী! লজ্জা শেষ হয়ে গেলে আর কিছুই থাকে না। কারণ লজ্জা ঈমানের এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা যে, এটা না থাকলে আর কিছুই থাকে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

> তুমি যদি লজ্জাই না কর, তাহলে যা মনে চায় তাই করতে পার।[২৮৬]

লজ্জা না থাকার কারণেই উপস্থিত সকল মানুষের সামনে সে মিথ্যা কথা বলেছে এবং ধরা পড়ে যাচ্ছে। যাদের সামনে বলছে তারাও বুঝতে পারছে– এ লোকটা মিথ্যা বলছে।

---

২৮৬. সহীহ বুখারী : ৩৪৮৪, ৬১২০

## জাহিলী যুগেও মিথ্যার প্রতি ঘৃণা

মিথ্যা কথা বলাটা এত খারাপ যে, সেই জাহিলী যুগের লোকেও মিথ্যা কথা বলতে চাইত না। আর এখন আমরা মুমিন হয়ে মিথ্যা কথা বলছি। আবু সুফয়ানের ঘটনা প্রসিদ্ধ। পরে তো তিনি রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন। এক সময় তিনি বেঈমান ছিলেন। ওই সময় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ঘটনা তো অনেক লম্বা। পুরো ঘটনা বলা সম্ভব না। তো সম্রাট হিরাক্লিয়াস যাকে আরবীতে বলে হিরাকল আর ইংরেজিতে হিরাক্লিয়াস, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছিল। তো আবু সুফয়ান বলেন, অনেক সময় তার প্রশ্নের উত্তরে আমার মন চেয়েছে মিথ্যা কথা বলে দিই। কিন্তু আমি ভাবলাম আমি যদি মিথ্যা বলি, আমার সঙ্গের লোকজন যারা আছে তারা দেশে গিয়ে বলবে– আমাদের নেতা মিথ্যা বলে। আমার দেশের লোক আমাকে মিথ্যুক হিসেবে জানবে। এই লজ্জায় আমি মিথ্যা বললাম না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে আমি সত্য বলেছি।[২৮৭]

দেখুন, তখন আবু সুফয়ান একজন কাফের। এবং কেমন কাফের? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করছে তাদের নেতা। কাফেরদের প্রধান নেতা। কথা বলছে রোম সম্রাটের সামনে। সেই রোম সম্রাটও ইসলামের দুশমন। ইসলামের সেই দুশমনের সামনে সে মিথ্যা কথা বলছে না এই লজ্জায়– লোকে জানবে আমাদের নেতা মিথ্যুক।

## মিথ্যাচারের বহুবিধ ক্ষতি

অথচ আমরা মিথ্যা কথা বলার সময় চিন্তা করি না। আহা! আমার ছেলে-মেয়ে দেখছে আমি মিথ্যুক। আমার ছেলে-মেয়ে জানছে আমি মিথ্যা বলছি। আমার এলাকার লোকজন দেখছে। আমার সঙ্গের

---

২৮৭. সহীহ বুখারী : ৭

লোকজন দেখছে। আমার পাশে যারা বসা আছে তারা দেখছে আমি মিথ্যা বলছি। আমার লজ্জা-শরম এভাবেই শেষ হয়ে গেছে! এ লজ্জা-শরম শেষ হয়ে যাওয়াটাও কলবের রোগ। ওই রোগেরও ইসলাহ দরকার। অন্তর থেকে নির্লজ্জতার রোগটা বের করা দরকার। কারণ এই রোগ যদি দূর না হয়, তাহলে কোনও পাপ করতেই দ্বিধাবোধ হবে না। যে-কোনও পাপ অবলীলায় করা হবে। যেমন আমরা অবলীলায় মিথ্যা বলছি। যারা বারবার মিথ্যা বলে, তাদের লজ্জা-শরম এমনিই শেষ হয়ে যায়। ফলে তাদের আর মিথ্যা বলতে বাধে না। মানুষও জেনে যায় লোকটা একটা মিথ্যাবাদী। তখন আর কেউ তাকে বিশ্বাস করে না। মানুষের চোখে তার কোনও মর্যাদা থাকে না। তার কথার কোনও মূল্য থাকে না। সমাজের দৃষ্টিতে সে একজন নিকৃষ্ট লোকে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার কাছে তার তো কোনও ইজ্জত থাকেই না। আসমানের জগতে সে মিথ্যুকরূপে চিহ্নিত হয়। এক হাদীছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

> লোকে অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে একজন মহামিথ্যুক হিসেবে তার নাম লেখা হয়ে যায়।[২৮৮]

মিথ্যা বললে চেহারা মলিন হয়ে যায়। ইমাম ইবনুল কয়্যিম রহ. বলেন, মিথ্যার বড় কঠিন প্রভাব। চেহারা কালো করে দেয়, যা সত্যবাদীর চোখে ঠিক ধরা পড়ে।[২৮৯]

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ؕ
اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

---

২৮৮. সহীহ বুখারী : ৬০৯৪

২৮৯. ইলামুল মুওয়াক্কিঈন : ১/১১৪

> কিয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল, তাদের চেহারা কালো হয়ে গেছে। এরূপ অহংকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়?[২৯০]

যাহোক, বলা হয়েছে– মুমিনের চরিত্রে মিথ্যা থাকতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই তবে মিথ্যা ছাড়তে হবে। আর জান্নাতে যেতে তো হবেই। জান্নাতে যেতে হলে সুস্থ ও নিখুঁত মনের অধিকারী হতে হবে। আমরা সবাই জাহান্নাম থেকে নাজাত চাই। আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে চাইলে মন পরিশুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহ বলছেন–

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

বাঁচতে পারবে কেবল সেই, যে সুস্থ মনের অধিকারী।[২৯১] তাই দুনিয়া থেকে সুস্থ অন্তর নিয়ে যেতে হবে। রোগহীন অন্তর নিয়ে কবরে যেতে হবে। আর রোগহীন অন্তর নিয়ে যেতে চাইলে অন্তরের যে সমস্ত রোগ আছে, এক একটা করে সবগুলো নির্মূল করতে হবে। তাই আজ থেকে আমরা শপথ করি– জীবনে আর কোনও দিন মিথ্যা বলব না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।



২৯০. সূরা যুমার : ৬০

২৯১. সূরা শুআরা : ৮৯

হৃদয় থেকে উৎসারিত কথা হৃদয়ে প্রভাব ফেলে। দরদী কণ্ঠ শ্রোতার মন কেড়ে নেয়। বক্তৃতা এক দুর্দান্ত শক্তি। শ্রোতা বিভ্রান্তও যেমন সহজে হয়, তেমনি সত্যগ্রহণে ঝাঁপিয়েও পড়ে অতি দ্রুত। মনযোগী শ্রোতা বক্তার নিকট আমানত। তাকে সত্য শোনানো, সত্যগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা বক্তার দায়িত্ব। শ্রোতাভেদে কথা বলা, প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত কথা পেশ করা, যে কোনও ধরনের অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা পরিহার করে সত্য কথা সঠিক ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা একজন দায়িত্বশীল অভিভাবকসম বক্তার বৈশিষ্ট্য। হযরত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম দামাত বারাকাতুহুম এদেশের অগুনতি শ্রোতার জন্য তেমনই একজন। মূলত তাঁর বয়ানের ক্ষেত্র মসজিদ-মাদ্রাসা ও দীনী-ইসলাহী মজলিসসমূহ। তিনি কথা বলেন জীবনগঠনমূলক। শ্রোতা লাভ করে আত্মোন্নয়নের পাথেয়, সীরাতে মুস্তাকীমে চলার অনুপ্রেরণা। এ বই ইসলাহী মজলিসে প্রদত্ত হযরতের বাছাইকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বয়ানের সংকলন। সংকলনটি তৈরির পর তিনি এতে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পরিমার্জন করে দিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে– ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে শান্তি ফেরানোর উপায়, সংকট থেকে উত্তরণ, আত্মার পরিচর্যা ও মুক্তির পথনির্দেশনা।

আলোকধারা
অন্ধ ও বিভ্রান্তার অঙ্গীকার

দোকান নং ০৪, কওমী মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
যোগাযোগ : ০১৬৮৯-৮৭৬১৪৮, ০১৬০৩-৫১৯০১